প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৭

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায় । ভারবি । ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩ । অক্ষর-বিন্যাস : ভারবি । ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩। মুদ্রক : বি. পি. স্টুডিয়ো। ৩৫বি নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট। কলকাতা-১৩।

উৎসর্গ

সোনাই, অর্জুন ও গাবলু-কে

# ভূমিকা

পণ্ডিতদের অনুমান, মানবসভ্যতার ইতিহাস আড়াই লক্ষ বছরের অধিক নয়। এরই এক নগণ্য ভগ্নাংশের কাহিনী লিখিত-ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে—যার বয়স আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর। এই চার-পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস ধরা আছে পাথর ও প্যাপিরাসের গায়ে। পুবাতত্ত্ব বা প্রত্নবিজ্ঞান এই স্বল্পকালের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। প্রত্নতত্ত্বের ইংরেজি নাম 'আরকেওলজি'—দুটি গ্রিক শব্দ, আরকেয়স্ (প্রাচীন) ও লোগস্ (আলোচনা করা) থেকে উদ্ভূত। মানবসমাজের অতীত অনুসন্ধান যে-শাস্ত্রের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় এবং যে-শাস্ত্র বিশেষ-বিশেষ যুগে মানুষের জীবনধারা কেমন ছিল জানতে সাহায্য করে, তাকেই প্রত্নতত্ত্ব বলা হয়। শুধু লিখিত-উপাদানের উপর নির্ভব কবে প্রাচীন কাল সম্পর্কে আমাদেব যে-ধারণা জন্মায়, তা যথেষ্ট নয় বলে, খননকার্যের দ্বারা আমরা সেই কালের আরও পূর্ণাঙ্গ চিত্র রচনা কবার চেষ্টা করি।

আজ থেকে অর্ধ-শতাব্দীরও আগে প্রত্নবিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'পাষাণের কথা' বইটি লিখেছিলেন। লেখক নিজেই বলছেন, 'পাষাণের কথা, প্রাচীন পাষাণের কথা হইলেও ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে লিখিত আখ্যায়িকা। ইহা বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস নহে।' বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস না-হলেও এই বই বাংলা-সাহিত্যেব অমূল্য সম্পদ। ভার-হুত শিলার আত্মকাহিনী লিখতে গিয়ে লেখক যে-কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন তা অলীক বা উদ্‌ভ্রান্ত নয়—বরং একান্তভাবেই ইতিহাস নির্ভর। এই গ্রন্থের ভূমিকায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হালকা চালে কয়েকটি গভীর কথা শুনিয়েছেন—'পুরাণকথা কে বলে, বলিবার লোক নাই। বুড়া মানুষ না হয় একশত দেড়শত বছরের কথা বলিবে, ইহার অধিক হইলে বলিবার মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। লেখায়-পড়ায় রাখিয়া গেলে সে-কথা অনেকদিন থাকে সত্য, কিন্তু যে জিনিসে লেখা হয় সে তো আর বেশীদিন টিকে না। কাগজ আট কি নয় বছর টিকে, প্যাপিরাস না হয় দুই হাজার বছর টিকিল। ইহার অধিক দিনের কথা শুনিতে হইলে কাহার নিকট শুনিব, পাথর ভিন্ন অন্য উপায় নাই।...পুরাণ-কথা শুনিতে গেলে পাষাণকে কথা কহাতে হয়, নহিলে পুরাণ-কথা শুনিবার উপায় নাই।'

প্রত্নতাত্ত্বিক যে-উপায়ে পাথরকে কথা বলান এবং প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করেন, সে-বিবরণ যে-কোন রহস্যময় গোয়েন্দা-কাহিনীর চেয়ে চমকপ্রদ। তফাৎ এই যে, পুলিশ বা গোয়েন্দা অপরাধীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে যে সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় করেন তার

অধিকাংশই জলজ্যান্ত মানুষ। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের পণ্ডিত-গবেষক হাজার-হাজার বছরের প্রাচীন যে শিলালিপি বা পুঁথিপত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে অনুসন্ধান চালান, তারা কেউ কথা বলে না। সেই জড়পদার্থগুলিকে নানাদিক থেকে পরীক্ষা করে প্রশ্ন করে, তিনি ঠিক উত্তরটি জেনে নেন এবং এমন-একটি সূত্রের সন্ধান পান যেটি অজ্ঞাতলিপির রহস্য-সমাধানের প্রধান চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়ায়।

ইংরেজিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে সহজপাঠ্য পুস্তকের অভাব নেই। সেরাম, ডুপলহফার, উলি বা কটরেল-এর বইগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল : মাতৃভাষাতে কি এ-ধরনের বই লেখা একান্তই অসম্ভব? গল্পাকারে সহজ সাবলীল ভাষায় লিখতে পারলে হয়তো পাঠকের অভাব হবে না—বিশেষ করে, সেইসব কিশোর-কিশোরী যারা স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করে সবে কলেজে ঢুকেছে, তাদের কৌতূহল মিটবে। এই আশা নিয়েই আমি লিখতে শুরু করি। আমার রচনাগুলি ষাট ও সত্তরের দশকে কোন-কোন সময়ে আনন্দবাজার রবিবাসরীয় এবং 'দেশ'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ব আমার অধীত বিষয় নয়—আমি বিশেষজ্ঞও নই। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে পুরাতত্ত্ব বিষয়ে আমি যে সাধারণ জ্ঞান লাভ করেছি, তারই উপর ভিত্তি করে আমার এই কাহিনী রচিত। এই বর্ণনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রত্নগবেষণার ক্ষেত্রে কয়েকজন মনীষীর স্বপ্ন ও সাধনা কিভাবে প্রত্নবিদ্যার রূপান্তর ঘটিয়েছে, সেই কথাই আমি বিস্তারিত বলেছি। অবশ্য কাহিনী বা আখ্যায়িকার উপর জোর দিতে গিয়ে সত্য যাতে বিকৃত না হয় সেদিকেও নজর রেখেছি। কৌতূহলী পাঠকের কথা মনে রেখে এই বিষয়ের একটি পুস্তক-তালিকা বই-এর শেষে সংযোজিত হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে একত্রে গেঁথে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার বাসনা থাকলেও অভাব ছিল আমার উদ্যমের। বন্ধুবর ড° নীলমণি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুহাস মজুমদার এবং ছাত্র ও সহকর্মী অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন আমি যাতে সেই প্রবন্ধগুলি ছাপাতে যত্নশীল হই। বেশ ক'বছর বাদে কীটদষ্ট পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করে প্রকাশ করার ভার নেন আমার কন্যা সুমতি। বন্ধুবর শ্রী গোপীমোহন সিংহরায় স্বেচ্ছায় গ্রন্থটি ছাপতে উৎসাহী হন। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড° দিলীপকুমার বিশ্বাস একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে আমার এই অকিঞ্চিৎকর লেখাগুলিকে মর্যাদা দিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমার ঋণ অপরিসীম। এই গ্রন্থ প্রকাশনের সর্ববিধ পরিকল্পনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব পালন করেছেন আমার পরম স্নেহের পাত্র শ্রীমান গোরা সিংহরায়—তাঁর নিরাময় দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

সুবোধকুমার মজুমদার

# মুখবন্ধ

'প্রত্ন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'প্রাচীন'; এই বাচ্যার্থে 'প্রত্নতত্ত্ব' বলতে বোঝায় 'প্রাচীন বিদ্যা'। কিন্তু এই সাধারণ সংজ্ঞা ছাড়াও ঐতিহাসিকের কাছে এ শব্দের এক বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। সে দৃষ্টিতে প্রাচীন যুগের ভগ্নাবশেষ, মুদ্রা, লিপি, সেই লিপিতে উৎকীর্ণ অভিলেখ, জীবনযাত্রার অন্যান্য নানা উপকরণ প্রভৃতির আবিষ্কার ও অনুশীলনমূলক বিদ্যাকে বোঝাতেই শব্দটি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। সর্বশ্রেণীর প্রাচীন বিদ্যাকে 'প্রত্নতত্ত্ব' বলতে ঐতিহাসিক সম্মত হবেন না। প্রাচীন সভ্যতার যে সব নিদর্শন প্রত্নবিদ্যার উপকরণ, সচরাচর তা থাকে গভীর ভূগর্ভে নিহিত—, অবশ্য ক্বচিৎ-কখনও মাটির উপর ছড়ানো প্রত্নবস্তুর সন্ধানও যে না মেলে তা নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাটি খুঁড়বার বিদ্যাটিও প্রত্নতত্ত্ব-অনুশীলনের এক আবশ্যিক অঙ্গ। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুনিয়ন্ত্রিত উৎখনন-পদ্ধতির সাহায্যে আবিষ্কৃত রাজপ্রাসাদ, সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি, সমাধি, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, গৃহস্থালীর সাজসরঞ্জাম—বিশেষতঃ মৃৎপাত্র, অলঙ্কারাদি ও অন্যান্য শিল্পবস্তু (যেমন সাধারণ ভাস্কর্য, দেবমূর্তি ইত্যাদি), লাঞ্ছনমুদ্রা (seal), অভিলেখাবলী (inscriptions) প্রভৃতির সাহায্যে প্রাচীন মানবসভ্যতার পূর্ণপরিচয় উদ্‌ঘাটিত করাই প্রত্নবিদ্যার উদ্দেশ্য।

প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের এই পাতালপ্রবেশের হেতু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁদের উৎখননের অভিজ্ঞতা থেকে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন বেশ ভাল ভাবেই। আসলে ঘরবাড়ি নগর গ্রাম ইত্যাদি মানুষের আবাস ও কর্মের কেন্দ্রস্থলগুলি নিজের থেকে ভূগর্ভে সমাহিত হয় না ; কালক্রমে যে ভূস্তরের ওপর সেগুলির অবস্থান তাই ক্রমশঃ উঁচু হয়ে সেগুলিকে গর্ভস্থ করে ফেলে। বর্তমানের ঐশ্বর্যময় লন্ডন নগরের পত্তন হয়েছিল ব্রিটেনের রোমান অধিকারকালে—তখন তার নাম ছিল লন্ডিনিয়ুম। রোমান যুগের এই প্রাচীন লন্ডিনিয়ুমের (খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী) ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর লন্ডন শহরের পঁচিশ ফুট নীচে। প্রাচীন কালের কোনো কোনো লোকবসতিস্থলে জলনিকাশী নালার ব্যবহার জানা থাকলেও নিত্য জমে ওঠা জঞ্জাল সাফ করবার বিশেষ ব্যবস্থা থাকত না ; সুতরাং যাবতীয় আবর্জনা নগরের পথগুলিতেই জমা হয়ে উঠত দিনের পর দিন। এর ফলে রাস্তাগুলি ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠত—দু'পাশের বাড়িগুলি নেমে যেত নীচে। সে ক্ষেত্রে বাড়ি ঢুকতে হলে মানুষকেও নামতে হত নীচে। এই নীচে অবস্থিত বাড়িগুলি যখন ভেঙে যেত এবং সেগুলির পুনর্নির্মাণ

প্রয়োজন হত, তখন নূতন বাড়ির একতলা সেই আগের থেকে উঁচু হয়ে থাকা পথগুলির সঙ্গে সমান উচ্চতায় গাঁথা হত। পুরানো ধ্বংসপ্রাপ্ত বর্জিত বাড়ির ভিত্তি ও অপরাপর ভগ্নাবশেষ চলে যেত নবনির্মিত বাড়িগুলির তলায়। এই প্রক্রিয়া পুনরাবর্তিত হয়ে চলত যুগ যুগ ধরে সভ্যতার আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এরই ফলে কোনো একটি প্রাচীন সভ্যতা কালানুক্রমিক স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে ভূগর্ভে নিহিত হয়েছে—নিম্নতম এবং গভীরতম স্তরটি এর প্রাচীনতম অভিব্যক্তি এবং ক্রমে ক্রমে স্তবগুলি যতই ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বর্তমান ভূস্তরের সমীপবর্তী হয়েছে সেগুলি কালের বিচারে একে অপরের পরবর্তী বিবেচিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার অন্যতম প্রধান নগরী মহেঞ্জোদড়ো এই ভাবে ভূগর্ভস্থ সাতটি স্তরে বিন্যস্ত বলে পণ্ডিতমণ্ডলী সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি এইভাবে ভূপ্রোথিত হওয়ার ফলেই সেগুলির আবিষ্কার, কালবিচার ও মূল্যায়নেব জন্য বৈজ্ঞানিক উৎখননবিদ্যার উদ্‌ভব। কোনো প্রাচীন কীর্তি ভূগর্ভে সমাহিত হয়ে যাওয়ার অর্থ মোটেই এমন নয় যে তা একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে তো কোথায় খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে তার কোনো হদিশই প্রত্নতত্ত্ববিদরা পেতেন না। সাধারণতঃ পাতালস্থ আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চিহ্ন কীর্তি মাটির উপর তার সমাহিত অবস্থিতির কোনো নিদর্শন রেখে যায়। অনেক সময় তা রূপ নেয় কোনো একটি বিরাট ঢিপি বা mound-এর—মধ্যপ্রাচ্যে যাকে বলা হয় tell। আবার কখনো এই নিদর্শন ছড়িয়ে থাকে মাটির উপর অস্পষ্ট নকশার আকারে—সহজে নজরে আসে না—একটি বিশেষ কোণ থেকে বা খানিকটা উঁচু থেকে দেখলে তবেই দৃষ্টিগোচর হয়। এইভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা এ যাবৎ তাঁদের উৎখনন-ক্ষেত্রগুলির (excavation sites) অধিকাংশের সন্ধান পেয়েছেন।

প্রাচীন কীর্তির প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। এব একটি কারণ মানুষের মনে নিহিত গুপ্তধন-আবিষ্কারের লোভ। সাধারণের বিশ্বাস : পুরাতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সেকালের রাজারাজড়া-প্রভৃতি অগাধ বিত্তের মালিকবা তাদের ধনৈশ্বর্য লুকিয়ে রেখে গেছেন। এই সংস্কার যে একেবারে মিথ্যা তাও নয়। এই লোভে দৃশ্যগোচব পুরাকীর্তিগুলি অতিপ্রাচীন কাল থেকেই দস্যুতস্কর বা গুপ্তধন-অন্বেষকদের লুণ্ঠন ও উপদ্রবের শিকার হয়ে এসেছে। মিশরের সুপ্রসিদ্ধ পিরামিডগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সম্রাটদের জমিয়ে রাখা ধনরত্নের লোভে এগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগে বার বার কবরচোরদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে। এরা শুধু লুণ্ঠন কবেই ক্ষান্ত হয় নি, এলোমেলো বেপরোয়া খোঁড়াখুঁড়ি আর ভাঙচুরের দ্বারা পুরানো প্রত্নক্ষেত্র ও প্রত্নবস্তুগুলিকে বিপর্যস্ত করে পরবর্তী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথে প্রচুর বাধারও সৃষ্টি করেছে। এর সঙ্গে বিশেষতঃ একালে যুক্ত হয়েছে অপহৃত ও লুণ্ঠিত মহার্ঘ্য প্রত্নবস্তু, বিশেষতঃ শিল্পনিদর্শনগুলির বিশ্বব্যাপী চোরাচালান ও চোরা-ব্যবসায়। এই জাতীয় বহু বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব কিভাবে প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী নিরন্তর সাধনার ফলে নিজেকে এক পূর্ণ বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে সে কাহিনী উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর। সব বৈজ্ঞানিক বিদ্যার মতই আধুনিক প্রত্নবিদ্যার বিকাশের

একটি ক্রম-অভিব্যক্তি আছে। উদ্যম, প্রাথমিক ভ্রান্ত পদক্ষেপ ও আত্মসংশোধনের মাধ্যমেই প্রতিনিয়ত তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় নবজাগরণের কাল থেকেই প্রত্নবস্তু ও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সংগ্রহের ঝোঁক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই ক্রমবর্ধমান আগ্রহ প্রধানতঃ সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এগুলি যে মানবসভ্যতার অমূল্য সম্পদ ও সযত্ন সংরক্ষণের যোগ্য এই মূল্যবোধ ও চেতনাও ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার, অধ্যয়ন ও মানবসভ্যতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদ্‌ঘাটনের ইতিহাস-অনুশীলনে প্রত্নবিদ্যার সম্প্রয়োগ শুরু হয় নি। এর সূচনা প্রকৃতপক্ষে হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। শ্লীমান তাঁর উৎখননের ফলে শুধু প্রাচীন ট্রয়নগরীর ধ্বংসাবশেষই আবিষ্কার করলেন না, হোমারীয় এবং ক্লাসিকাল সভ্যতার প্রেক্ষাপট রূপে Mycenaean সভ্যতার রূপরেখাও জগতের সামনে তুলে ধরলেন। ক্রমশ উৎখনন-পদ্ধতি আরও অগ্রসব হল এবং আদিযুগের ভুলভ্রান্তি ক্রমশ বর্জন করে শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্‌ভাবন ও প্রযোগের ফলে অধিকতর সাফল্য ও গৌরব অর্জন করল। এই জয়যাত্রার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে মাসপেরো ব্রুক্স, লেয়ার্ড, বোট্টা, ফ্লিন্ডার্স পেট্রি, পিট রিভার্স, উলি, ইভান্স, রীজনের প্রভৃতির নাম। বর্তমানে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননবিদ্যা পূর্ণ পবিণতি লাভ করবার পথে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিজ্ঞানের শাখাসমূহের সহায়তা প্রযোজনমত গ্রহণ করে নিজের পুষ্টিসাধন করেছে। এব লক্ষ্য প্রত্নসম্পদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবিষ্কার, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, সামগ্রিক দৃষ্টিতে অধ্যয়ন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে মানবসভ্যতার যথাসাধ্য সুসামঞ্জস ও সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করা। প্রারম্ভিক পর্বের বিচ্ছিন্ন নিদর্শন সংগ্রহের সঙ্গে এর উদ্দেশ্যগত ও প্রকরণগত প্রভেদ প্রায় দুই বিপরীত মেরুব। পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতকের শৌখিন সংগ্রহকার ও বর্তমানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ দুই সম্পূর্ণ পৃথক মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি, কোনোখানেও তাদের মিল নেই।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননবিদ্যা প্রত্নতত্ত্বের ব্যবহারিক দিক; এর সাহায্যে আহরিত প্রত্নবস্তু-সমূহের অনুশীলন ও মূল্যবিচার প্রকৃতপক্ষে এর বিশুদ্ধ তত্ত্বগত দিক। এটি ক্ষেত্রানুসন্ধানের পরের ধাপ। এই পরবর্তী ভূমিতেও পূর্ণ সার্থকতা লাভের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকের কয়েকটি সহায়ক বিদ্যার উপর নির্ভরশীল হতে হয়—যথা লিপিবিদ্যা (Palaeography), লেখবিদ্যা (Epigraphy), মুদ্রাবিজ্ঞান (Numismatics), নৃতত্ত্বের দুই শাখা—কাযবিজ্ঞান (Physical Anthropology) ও সংস্কৃতি -বিজ্ঞান (Cultural Anthropology), আবশ্যকমত ভূতত্ত্ব (Geology) ও জীবাশ্মবিজ্ঞান (Palentology), তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) প্রভৃতি। উৎখননের ফলে বহু ক্ষেত্রেই প্রচুর পরিমাণে অভিলেখ ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে—লিপিবিদ্যা, লেখবিদ্যা ও মুদ্রাবিজ্ঞানে সু-অধীতী পণ্ডিতগণ সেগুলির পাঠোদ্ধার ও মূল্যবিচার করে তৎস্থ ইতিহাসের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেছেন—প্রত্নতত্ত্বের রাজ্যে এ অতি সাধারণ দৃশ্য। বিশেষ করে যে সব দেশে প্রাচীন কালের ধারাবাহিক

লিখিত বিবরণ সংরক্ষিত হয় নি সেখানে প্রত্নসাক্ষ্যের গুরুত্ব অসীম। এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারত। লিখিত ইতিহাসের অভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাস অনেকখানিই প্রত্নসাক্ষ্যনির্ভর। এমনকি প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক থুকিদিদেসের লিখিত সমকালীন বিবরণকে বুঝতেও যে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রীক অভিলেখ-মালা কতখানি অতিরিক্ত সাহায্য করে তা অতি বিশদভাবেই বুঝিয়েছেন বেঞ্জামিন জাওয়েট তাঁর থুকিদিদেসের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় (Jowett, Thucydides, Eng. Translation, Vol. I, Second Ed., 'On Inscriptions of the age of Thucydides', pp. ix-cii)।

ইজিপ্ট, সুমের আক্কাদ, বাবিলন, আসীরিয়া প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে আবিষ্কৃত অভিলেখ-সম্পদ আবার এতই প্রচুর যে তার সাহায্যে এ-সব সভ্যতার ধারাবাহিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করবার কাজে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছেন ঐতিহাসিকরা সাহিত্যগত তেমন কোনো উপাদান না পাওয়া সত্ত্বেও। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতকের গ্রীক আধিপত্যের ইতিহাস তো প্রায় আগাগোড়াই মুদ্রাসাক্ষ্যনির্ভর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রত্নবিদ্যাজাত উপাদান-সমূহের উপযুক্ত ব্যবহার যে সভ্যতার সর্বতোমুখী ইতিহাস রচনার কাজে আবশ্যিক এবং একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কথা না মেনে উপায় নেই। ব্যবহারিক উৎখনন-বিদ্যারূপে এবং আবিষ্কৃত বস্তুবিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্নতত্ত্ব বর্তমানে ইতিহাসশাস্ত্রের সহায়করূপে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের প্রকৃতি ও এর ব্যাখ্যা-প্রণালী নিয়ে নিজেদের মধ্যে যতই না কেন বিতর্কে লিপ্ত হোন, সাধারণ মানুষের কাছে সে-সবের বাইরে ইতিহাসের একটি বাড়তি অমোঘ আকর্ষণ আছে। সে হল নিছক তার কাহিনীর আকর্ষণ। মানুষ চিরকাল গল্প শুনতে ভালবাসে—কাহিনীর রস চিরকাল তাকে মুগ্ধ করে। আর ইতিহাসের মত গল্পের এমন অফুরন্ত জোগান দিতে পারে আর কোন বিদ্যা? এ কাহিনীমালার বিস্তার পৃথিবীতে মানবসভ্যতা-পত্তনের আরম্ভকাল থেকে আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন এবং সম্পূর্ণ দেশকাল-নিরপেক্ষ। এর অন্তরে মানুষ খুঁজে পায় যুগে যুগে তার নিজেরই সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, ঘাত-প্রতিঘাত, প্রাপ্তি-বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি। এই কাহিনী শ্রবণের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ সর্বত্র নিজেকে আবিষ্কার করে। প্রত্নতত্ত্ব আর ইতিহাস, পরস্পর নিবিড়-সম্পর্কিত এই উভয় বিদ্যাই এই পরিচয়টি বহু বিচিত্রভাবে তার সামনে উদ্‌ঘাটিত করে বলেই সে এগুলির প্রতি একটা সহজাত গভীর কৌতূহল ও আকর্ষণ চিরদিন অনুভব করে এসেছে। ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় এই কৌতূহল ও কাহিনীপিপাসা নিবারণের জন্য সহজপাঠ্য গ্রন্থরাজির অভাব নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও তৎসম্পর্কিত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের কাহিনী এতই বিচিত্র ও বহুমুখী এবং স্থানে-স্থানে এমনই নাটকীয় যে তা কল্পিত দুঃসাহসিক অ্যাড্‌ভেঞ্চার-কাহিনীকেও হার মানায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-সম্পর্কে সহজবোধ্য অথচ নির্ভরযোগ্য বিবরণ এখন পর্যন্ত বড় বেশি লেখা হয় নি। প্রতিভাশালী বাঙালি ঐতিহাসিক বা প্রত্নবিদের অভাব পূর্বপ্রজন্মেও ছিল না, বর্তমানেও নেই। কিন্তু এঁরা কলম ধরেন সাধারণতঃ ইংরেজিতে। এবং ক্বচিৎ

বাংলাতে লিখলেও সাধারণতঃ ভারী ওজনের গবেষণামূলক নিবন্ধরচনার উপরই এঁদের ঝোঁক। সাধারণ কাহিনীপিপাসু পাঠকের কথা রচনাকালে এঁদের বড় মনে রাখতে দেখি না। আমাদের বাল্যকালে যাঁরা প্রকৃত ইতিহাসকে গল্পাকারে গ্রথিত করে আমাদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন এমন দু'জন পণ্ডিত ও সুলেখকের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে—'ইতিহাসের গল্প' প্রণেতা স্বল্পায়ু ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় ও 'রণডঙ্কা', 'রাজা বাদশা' ও 'শিবাজী মহারাজ'-এর লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। একালের প্রবীণ ঐতিহাসিক স্বর্গত কলিকারঞ্জন কানুনগো মহাশয়ের লেখনীর জাদুও ভুলবার নয়—মাতৃভাষায় ইতিহাস রচনার মধ্যে পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি কাহিনীর রসটিও যিনি উপযুক্তভাবে সঞ্চার করতে পারতেন। তাঁর 'রাজস্থান-কাহিনী' ও 'শাহ্‌জাদা দারা শুকোহ্‌' গ্রন্থ দুখানি এর উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু এ পথে এঁদের অনুগামী কাউকে চোখের সামনে দেখতে পাই না। এই পরিস্থিতিতে আমার দীর্ঘদিনের পরমপ্রীতিভাজন বন্ধু ও প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপক সুবোধকুমার মজুমদার-রচিত 'প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কাহিনী', গ্রন্থখানিকে বাংলা সাহিত্যের আসরে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। সুবোধকুমার ইতিহাসে সুপণ্ডিত, দীর্ঘদিন পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেছেন এবং ইতিহাস বিষয়ে বিদগ্ধ প্রাবন্ধিকরূপে বাঙালি পাঠকসমাজে সুপরিচিত। এই গ্রন্থে সাধারণ পাঠকের কথা মনে রেখে এবং তাঁদের কাহিনী-পিপাসাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তিনি ঊনত্রিশটি অধ্যায়ে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ও সে-সবের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের বিবরণ শুনিয়েছেন সরল ও অতিসুখপাঠ্য বাংলা ভাষায়। লেখক একান্ত তথ্যনিষ্ঠ, কিন্তু তাঁর রচনাগুণে পরিবেশিত তথ্য কোথাও ভারস্বরূপ হয়ে রচনার গতি মন্দীভূত করে নি—নির্ঝরিণীর মত স্বচ্ছন্দে তা প্রবাহিত হয়ে চলেছে প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠকের ঔৎসুক্য শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে রেখে। এক কথায় তিনি বিদগ্ধ জিজ্ঞাসু বাঙালি পাঠকের জন্য এক চিত্ততৃপ্তিকর মহাভোজের আসর সাজিয়েছেন। বাগ্‌বিস্তার না করে আমি পাঠকসমাজকে এই আসরে পাত পেতে অবিলম্বে বসে পড়বার অনুরোধ জানাচ্ছি। আগাগোড়া উপভোগ তো করবেনই—গুরুভোজনের অন্তে শেষ পাতে রসাল চাটনিস্বরূপ Myers-এর Human Personality and its Survival of Bodily Death-গ্রন্থ থেকে আহরিত 'প্রত্নতত্ত্বে অতিপ্রাকৃত' শীর্ষক শেষ অধ্যায়টি তাঁদের পরিপাকে বিশেষ সহায়তা করবে।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

# সূচিপত্র

# রসেটা স্টোন ও শাঁপলিয়ঁ

প্রাচীন মিশর দেশ সম্বন্ধে ইউরোপের পণ্ডিতদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সভ্যতার অরুণোদয় এই দেশেই হয়েছিল। তাঁদের অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁদের লেখা নানা প্রবন্ধে, যেখানে তাঁরা মিশর দেশ সম্পর্কে তাঁদের গভীর বিস্ময় প্রকাশ করে গেছেন। সর্বপ্রথম মনে আসে, ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস-এর নাম, যিনি খ্রিস্টজন্মের প্রায় পাঁচশত বছর আগে তাঁর "হিস্টরিয়া" গ্রন্থে মিশরের রহস্যঘন কাহিনী লিপিবদ্ধ করে যান। গিজার বিখ্যাত পিরামিডটি তাঁকে কি পরিমাণ মোহিত করেছিল, তা তাঁর উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা পড়লে সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর বর্ণনা এত জীবন্ত যে, মনে হয় পিরামিডের অধ্যায়টি লেখার সময় ঐতিহাসিক যেন এই অপূর্ব সৌধটি তাঁর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু পিরামিড তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, মিশরের অপর আর একটি বিষয়—মিশবের চিত্রলেখ বা হায়রোগ্লিফিক্স্ তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। খ্রিস্টের আবির্ভাবের পর একাধিক পণ্ডিত মিশর দেশ সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেন। হায়বোগ্লিফিক লিপি সম্বন্ধে এঁরা প্রায় সকলেই ধারণা করে নিয়েছিলেন যে, এই লিপি নিছক চিত্রসমষ্টি মাত্র—দৃশ্যমান জগতের কোন না কোন পরিচিত প্রতীক বা প্রতিচ্ছবি মারফৎ মনের অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদের চিত্রময় অভিব্যক্তি এই লিখন-পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে যে ধ্বনিমাধুর্যপূর্ণ কোন বর্ণমালা আত্মগোপন করে থাকতে পারে, একথা আদৌ তাঁদের মনে উদিত হয়নি।

ইউরোপের মধ্যযুগে মিশর দেশ সম্পর্কে পণ্ডিতব্যক্তিদের মধ্যে একধরনের ঔদাসীন্য চোখে পড়ে। এর একটি কারণ উপকরণের অভাব। প্রাচীন মিশরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অসংখ্য উপকরণ রক্ষিত ছিল আলেকজান্দ্রিয়া শহরের বিখ্যাত গ্রন্থাগারটিতে। সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে সেনাপতি ওমরের আদেশে গ্রন্থাগারটি ভস্মীভূত হয় এবং সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয় প্রাচীন ইতিহাসের নানা দুর্মূল্য নিদর্শন। এই দুর্ঘটনার ফলে প্রাচীন মিশরীয় শাস্ত্রাদি পাঠ করে ঐ দেশটিকে ভাল করে জানার আর দ্বিতীয় কোন উপায় থাকল না। এখানে বলে রাখা ভাল যে, ওমর-কর্তৃক গ্রন্থাগারটি ধ্বংস হবার ব্যাপারটি বিতর্কিত। এমন কিছু ঐতিহাসিক আছেন, যাঁরা ঘটনাটির সত্যাসত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের খ্রিস্টান সাধু-সন্তরাই জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে প্রায়ই তাঁরা এসে উপস্থিত হতেন পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলিতে, যার মধ্যে মিশর ছিল অন্যতম। মিশরের পৌরাণিক নিদর্শনগুলি তাঁদের



শাপলিয়ঁর প্রতিকৃতি

দৃষ্টিগোচর হলেও সেগুলি সম্পর্কে তাঁদের কৌতূহল ছিল সামান্যই। তাঁরা ছিলেন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান—যে বস্তুর মধ্যে খ্রিস্টের মহিমা প্রস্ফুটিত নয়, বা যার সাহায্যে বাইবেলের কোন নতুন ব্যাখ্যায় উপনীত হওয়া যায় না—সেই সব অসার বস্তুতে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়নি। মধ্যযুগের এই অমানিশা দূর হল পঞ্চদশ শতকে রেনেসাঁসের আলোকচ্ছটায়। পুরাতত্ত্ব বিষয়ে হিউমানিস্ট পণ্ডিতদের এক সহজাত আগ্রহ ছিল। পুরাতন পুঁথিপত্র থেকে শুরু করে, জীর্ণ অট্টালিকা, প্রাসাদ, মঠ মন্দির সবই তাঁরা এক নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শুরু করেন। মিশর সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের ঔৎসুক্য আবার উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

কিন্তু মিশরীয় শাস্ত্র-চর্চার সুবর্ণযুগের দ্বারোদ্ঘাটন হল ঊনবিংশ শতাব্দীতে রসেটা স্টোন আবিষ্কার ও তার পাঠোদ্ধারের মধ্য দিয়ে। এই বিখ্যাত প্রত্ননিদর্শনটি নেপোলিয়নের আনুকূল্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল। তিনি উৎসাহ না দেখালে মিশরীয় শাস্ত্রাদির চর্চা আরও শতাব্দীকাল পিছিয়ে পড়ত। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় নেপোলিয়নের আগ্রহ ও উৎসাহের কথা ইউরোপের পণ্ডিত সমাজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেও, এ বিষয়ে তাঁরা অপর একজন জার্মান পণ্ডিতের অবদান বেমালুম ভুলে গেছেন। ইনি হলেন জার্মান দার্শনিক লাইবনিৎস। দার্শনিক হলেও কূট রাজনীতিবিদ্ হিসাবেও লোকে তাঁকে সমীহ করত। ফরাসিরাজ চতুর্দশ লুই, রাইন সীমান্তকে কব্জা করবার জন্য জার্মানির সঙ্গে আজীবন লড়াই করবেন, এমন এক দৃঢ়পণ করেছিলেন। এই সর্বনাশা পণ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতে লাইবনিৎস ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিরাজের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। ফরাসিরাজের দৃষ্টি জার্মানি থেকে সরিয়ে অন্যত্র চালিত করাই এই স্মারকলিপির মূল উদ্দেশ্য ছিল। লাইবনিৎস্ বিশেষ করে দেখালেন যে, আফ্রিকার উত্তরে মিশর দেশটি অনায়াসে ফরাসি সম্প্রসারণের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। রাইন সীমান্তে যা পাবেন বলে লুই আশা করছেন, তার সহস্রগুণ বেশি পাবার সম্ভাবনা আছে উত্তর আফ্রিকাতে। যতদূর জানা যায়, এই প্রতিবেদনটি পড়ে লুইয়ের মনে কোন পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু লাইবনিৎসের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তীকালে নেপোলিয়ন নামে এক তরুণ ফরাসি সেনাপতি এই স্মারকলিপিটি পড়বার সুযোগ পান। এটি পড়েই নাকি তিনি এতটা অভিভূত হয়েছিলেন যে, মনে মনে পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন—ক্ষমতা হাতে পেলেই তিনি মিশরে এক ফরাসি অভিযান করবেন। যথাসময়ে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরীও করেছিলেন। অভিযানের পূর্বমুহূর্তে তিনি এক পণ্ডিতমণ্ডলীর সামনে এই অভিযানের নানা উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বিস্তারিত আলোচনা করেন। সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে এই অভিযান সফল হয়নি। তবু সামরিক শক্তিতে ইংরেজদের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেও এই অভিযানের ফলে ফরাসিরা মিশর দেশের অফুরন্ত পৌরাণিক ঐশ্বর্যের সন্ধান পেল। ইংরেজ নৌসেনাপতি নেলসন

নীলনদের মোহনায় একে একে সবকটি ফরাসি রণতরী বিধ্বস্ত করলেন। উপকূলভাগ তখনও ছিল ফরাসিদের দখলে। তাই আত্মরক্ষায় মরিয়া হয়ে তারা যুদ্ধ চালিয়ে গেল। নীলনদের ব-দ্বীপে রসেটা শহরটি অবস্থিত। তার পাঁচ মাইল দক্ষিণে ফোর্ট রশিদ। কেল্লার চারিদিকে পরিখা খুঁড়ে ঘাঁটি আগলাবার হুকুম দিলেন ফরাসি সেনাপতি বুচার্ড। কোন এক অজ্ঞাতনামা সৈনিক মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কোদালের ফলকে বড় সাইজের একটি কালো পাথরের টুকরো আবিষ্কার করে। সে অবাক হয়ে দেখল, পাথরের গায়ে অদ্ভুত অক্ষরে কি সব যেন লেখা! অশিক্ষিত সাধারণ সৈনিক সে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন তার মন। সে ভাবল অমঙ্গলজনক কিছু সে অজানিতভাবে মাটি খুঁড়ে বার করে ফেলেছে। ভীতবিহ্বল হয়ে সে তাই ছুটে এলো বড় কর্তাদের কাছে, হাতে তার সেই কালো পাথর। ফরাসি সেনাবাহিনীতে নেপোলিয়ন ইচ্ছা করেই কিছু পণ্ডিত ব্যক্তিকেও এনেছিলেন। এঁরা শিলালিপি পড়তে চেষ্টা করে দেখলেন যে, প্রথম পঙক্তিতে আছে মিশরীয় চিত্রলেখ বা হায়রোগ্লিফিক্‌স্। সর্বনিম্নে গ্রিক। মধ্যেব অংশে যা আছে, তা তাঁদের অজ্ঞাত। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে কালো পাথরটি যে খুবই মূল্যবান তা বুঝতে তাঁদের অসুবিধা হয়নি। পাছে কোন দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে এটি হাতছাড়া হয়, এই আশঙ্কায় শিলালিপির একটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করে তখনি তাঁরা সেটি দেশে পাঠিয়ে দেন। আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ মিলল কয়েকদিনের মধ্যেই। নীলনদের যুদ্ধে ফরাসিরা পরাজিত হল। ১৮০১ সালে ইংরেজ সেনাপতির কাছে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। সেই সঙ্গে তারা রসেটা স্টোন তুলে দিল ইংরেজদের হাতে। কালবিলম্ব না করে ইংরেজ সেনাপতি এটি চালান করে দিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। নীলনদের যুদ্ধে জেতা ট্রফি হিসাবে আজও তা সযত্নে রক্ষিত। কিন্তু যুদ্ধে হেরেও ফরাসিরা প্রমাণ করল যে, সত্যিকারের পরাজয় তাদের ঘটেনি। কেননা ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শাঁপলিয়ঁ রসেটা স্টোনের মর্মোদ্ধার করে দেখিয়ে দিলেন যে, জয়ের ট্রফি ফরাসিদের অধিকারেই থেকে গেছে।

রসেটা স্টোনের পাঠোদ্ধার কাজে ইংলন্ডের টমাস ইয়ং এবং ফ্রান্সের শাঁপলিয়ঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এঁরা দুজনই ছিলেন "শিশু প্রডিজি"। এগারো বছর বয়সে শাঁপলিয়ঁ হিব্রু ও আরবিতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। অন্যদিকে টমাস ইয়ং চার বছর বয়সে বাইবেল শেষ করেন এবং ছ'বছর বয়সে গোল্ডস্মিথের "ডেজার্টেড ভিলেজ" সবটাই মুখস্থ আবৃত্তি করতে পারতেন। তিনি শাঁপলিয়ঁর চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। রসেটা স্টোনের মর্মোদ্ধার করবেন এই আশা নিয়ে তিনি প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা শুরু করেন। তাঁর পড়াশুনার গণ্ডি খুব বিস্তৃত ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও ছিল অগভীর। প্রত্নগবেষণায় এই অভাব দুস্তর বাধা সৃষ্টি করলেও অন্যান্য গুণ দিয়ে তিনি এটা পুষিয়ে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছিলেন এমন এক তীক্ষ্ণ মেধা, যার সাহায্যে সকল বাধা তিনি অনায়াসে কাটাতে পারতেন।

তারপর আসে তাঁর ইনট্যুইশন বা সহজাত জ্ঞানের কথা, যেখানে অধীত বিদ্যার চেয়ে স্থান পায় তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি, যার আলোতে তিনি অনেক জটিল সমস্যার সহজ সমাধান বলে দিতে পারতেন। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে যেখানে সমস্যার কূলকিনারা হয় না, সেখানে সহজ বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তিনি আশ্চর্য ফল পেতেন। ইয়ং প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন, রসেটা স্টোনের প্রথম পঙক্তিতে যে হায়রোগ্লিফিক লিপি আছে তার সবটা নিছক চিত্রসমষ্টি নয়। হয়ত এগুলির পিছনে কোন অজ্ঞাত বর্ণমালা আত্মগোপন করে আছে। ছবির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করা গেলেও, কোন দেশের রাজার নাম ব্যক্ত করা যাবে কি উপায়ে? ইয়ং দেখলেন যে, ঐ বিশেষ নামটি যে কটি ধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয় তার জন্য প্রতি সিলেবলে এক একটি চিত্র ব্যবহার করা চলে। রসেটা স্টোনে এক বিদেশী রাজার নাম আছে। গ্রিক অংশটি পড়ে জানা যায়, তাঁর নাম টলেমেয়স। ইয়ং যথার্থই অনুমান করেছিলেন যে, হায়রোগ্লিফিকে এই নামটি চক্রাকার ফ্রেমে এঁকে দেখানো হয়েছে। যাকে তিনি ফ্রেম বললেন, ফরাসিরা তাকেই বলত 'কার্তুশ'। কিন্তু ইয়ং নিজের হাতে যে দরজা খুললেন, তার চৌকাঠ পেরিয়ে তিনি আর প্রত্নতত্ত্বের স্বপ্নলোকে প্রবেশ করতে পারলেন না। আগেই বলেছি, ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁব জ্ঞান ছিল অগভীর। মিশরের প্রাচীন ভাষা 'কপটিক' তাঁর জানা ছিল না। তার ওপর তিনি নিজে বিজ্ঞানের সাধক বলে, বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। গ্রিক বৈজ্ঞানিক পিথাগোরাস অনেক বিষয়ে প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে ঋণী ছিলেন। এই ধারণা থেকে তিনি মিশরের বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন নিদর্শনগুলি ঘেঁটে মৃত রাজরাজড়া ও দেবদেবীর নাম ছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ে তেমন কিছুই যখন জানা গেল না, তখন তাঁর উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। মিশরশাস্ত্রের আলোচনা ছেড়ে তিনি অন্য বিষয়ে মন দিলেন। সকলেই দেখল ইয়ং-এর গৌরব-রবি অস্তমিত হয়েছে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে দেখা দিয়েছে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর নাম জাঁ ফ্রাঁসোয়া শাঁপলিয়ঁ।

শাঁপলিয়ঁ ছিলেন ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ফিজাক শহরের এক পুস্তক-ব্যবসায়ীর কনিষ্ঠ পুত্র। জীবনীকার হার্টলেবেন তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে এমন সব অত্যাশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেগুলির বাস্তবতা সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। সত্য হোক আর মিথ্যাই হোক—কাহিনীগুলি চমকপ্রদ। শোনা যায়, পুত্রের জন্মমুহূর্তে তাঁর মা-এর জীবন-সংশয় হয়েছিল। বাঁচার কোন আশা ছিল না তাঁর। শহরের নাম-করা ডাক্তাররা যখন জবাব দিয়ে গেলেন, তখন শেষ চেষ্টা হিসাবে পিতা ডেকে আনলেন এক দৈব-চিকিৎসককে। ২৩শে ডিসেম্বর ১৭৯০ সালে দীর্ঘ যন্ত্রণা ভোগ করার পর মা জন্ম দিলেন তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানটিকে। নবজাতকের গায়ের রঙ তামাটে, চোখ দুটি বড় বড়, মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল, আর চোখের কোণও যেন ঈষৎ হরিদ্রাভ। সব মিলিয়ে

চেহারা-ছবিতে সুস্পষ্ট প্রাচ্য দেশীয় ছাপ। দৈব-চিকিৎসক ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, নবজাতক সুলক্ষ্মণযুক্ত, বেঁচে থাকলে সে পৃথিবী-জোড়া সুনামের অধিকারী হবে।

ফ্রান্সের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তে শাঁপলিয়ঁর জন্ম। ১৭৮৯-এ সারা দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ এসে পৌঁছাল ফিজাক শহরে। শাঁপলিয়ঁর পরিবার বিপ্লবের আবর্তে জড়িয়ে পড়েছিল। পিতা জ্যাক্ মনেপ্রাণে বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সপক্ষে তিনি স্বেচ্ছাচারী বুর্বন শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। বিপ্লবকালীন ঘটনাগুলি শিশু শাঁপলিয়ঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পিতার সহযোগী বন্ধুরা প্রতি সন্ধ্যায় মিলিত হতেন তাঁদের বাড়িতে। তাঁদের উত্তেজনাপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক, শিশুমনকে ভীত বিহ্বল করে তুলত। পিতা জ্যাক বিদ্রোহের সমর্থন করলেও, তিনি অযথা রক্তপাত ও ধ্বংসকার্য থেকে সতত বিরত থাকতেন। উদারভাবাপন্ন মানুষটি ছিলেন প্রকৃত এক সজ্জন। 'রেন অব টেররের' সংহারলীলায় তিনি বহু নিরীহ রাজভক্ত ফরাসি প্রজাকে বাঁচিয়েছিলেন। একদিকে বিপ্লবীদের হর্ষধ্বনি, অন্যদিকে শরণার্থীদের কাতর ক্রন্দন সমভাবে উদ্বেলিত করেছিল শাঁপলিয়ঁর শিশুমনকে।

বিপ্লবের এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় লালিত হচ্ছিলেন ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ প্রত্নবিদ। শৈশবের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে জীবনীকার একটি মজার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ঘটনাটি অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু শাঁপলিয়ঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা স্মরণ করলে হয়ত এর বিশেষ তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যাবে। একদিন এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায় ফিজাক শহরের ওপর। এই দুর্যোগের মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল ছোট্ট শাঁপলিয়ঁকে বাড়িতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবনাকুল মা তন্নতন্ন করে সমস্ত বাড়ি খুঁজে দেখেও ছোট ছেলেটির কোন হদিশ পেলেন না। বাকি ছিল ছাদের চিলে-কোঠা। কিন্তু সেখানে ছোট ছেলে যাবে কেমন করে? তবু ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে মা ছুটে এলেন ছাদে এবং ঘরে ঢুকেই তাঁর চক্ষুস্থির। অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর ছোট্ট প্রমিথিউস হাতের মুঠোয় স্বর্গের আগুন বিদ্যুৎকে ধরবার জন্য কড়িবরগা থেকে চামচিকের মতো ঝুলছে।

ছোট ছেলেটি কোনদিন যে এক পৃথিবী-বিখ্যাত প্রত্নগবেষক হবে, একথা কিন্তু কারও মনে উদিত হয়নি। পড়াশুনার আবহাওয়ার মধ্যে তাঁর শৈশব কেটেছিল। বাবা এক স্বনামধন্য পুস্তক-ব্যবসায়ী হওয়াতে ছোট থেকে তিনি মানুষ হয়েছিলেন বই-এর জগতে। বই পড়েছেন এবং ভালও বেসেছেন বই পড়তে। বাড়িতে বড় ভাই জ্যাক যোশেপের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় তাঁর বিদ্যাশিক্ষা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত। গ্রেনোবল শহরে তিনি একটা ভাল চাকরি করতেন। ছোট ভাই তখন ফিজাক শহরে মা-বাবার কাছে থেকে পড়াশুনা করে যাচ্ছিলেন। একবার জ্যাক যোশেপ খবর পেলেন যে, বাৎসরিক পরীক্ষায় ছোট ভাই মোটেই ভাল ফল করতে পারেনি। ল্যাটিন ও গ্রিকে সে

ভাল নম্বর রাখলেও, অঙ্কে পেয়েছে কম নম্বর। পাছে ছোট ভাই পড়াশুনায় আরও পিছিয়ে যায়, এই আশঙ্কায় তিনি তাকে গ্রেনোবল শহরে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। ভাল স্কুলে তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। এখানে শাঁপলিয়ঁ হিব্রু ও আরবি ভাষা শেখার সুযোগ পেলেন। তার চেয়েও সুখের বিষয়, এখানে তিনি এক দিকপাল প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের সংস্পর্শে আসেন। এঁর নাম জাঁ বাপতিস্ত ফুরিয়ে। নেপোলিয়নের আদেশে ইনি মিশর পরিভ্রমণ করেন এবং সে দেশ থেকে ফিরে এক জ্ঞানগর্ভ রিপোর্ট লিখে দেন। ফুরিয়ের উপস্থিতিতে গ্রেনোবল মিশরীয় শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। যে বিদ্যালয়ে শাঁপলিয়ঁ ছাত্র ছিলেন, একদিন সেটির পরিদর্শনে আসেন আচার্য ফুরিয়ে। তরুণ ছাত্রটির প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহ লক্ষ্য করে তার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাকে স্বগৃহে ডেকে আনিয়ে তাঁর সংগ্রহে মিশর দেশের যে সব প্রত্ননিদর্শন ছিল সেগুলি দেখিয়ে তাদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে শোনান। প্যাপাইরাস ও পাথরে খোদাই করা চিত্রলিপি বালকটিকে মুগ্ধ করেছিল। সেদিনই তার মনে নিহিত হল এক সম্ভাবনার বীজ। ফুরিয়ে যখন বললেন যে, অজ্ঞাত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার তখনও সম্ভব হয়নি, বালকটি তখন বিজ্ঞের মত বলে বসল, বড় হয়ে সে নিজেই সেগুলি পড়ে দিতে পারবে। বিশ বছর বাদে এই প্রতিশ্রুতিকে সে সার্থক করে তুলেছিল। ঠিক একই ধরনের কথা শোনা গিয়েছিল ট্রয় আবিষ্কারক, বালক হেনরিশ স্লীম্যানের মুখ থেকে। অনেক বিষয়ে দুই প্রত্নবিদের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য থাকলেও, এক বিষয়ে দুস্তর প্রভেদ ছিল। স্লীম্যান প্রত্নতত্ত্বের জগতে একজন 'অ্যামেচার' হিসাবে গণ্য হতেন। ভাষাতত্ত্ব বা প্রত্নবিদ্যায় তাঁর বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ছিল না। নিছক সহজাত বুদ্ধি ও কঠোর সঙ্কল্প সম্বল করে তিনি অসাধ্য সাধন করেন। অপর দিকে শাঁপলিয়ঁ বরাবরই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন; শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে এক চুল নড়চড় হয়নি তাঁর কাজে। তিনি প্রত্নবিদ্যার ব্যবহারিক দিকটা যেমন ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন, তেমনি বিভিন্ন প্রাচীন ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। এতগুলি বিভিন্ন হাতিয়ার দখলে না থাকলে, হায়রোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধার তাঁর দ্বারা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। গ্রেনোবল শহরে এসে তিনি যে উন্নত ধরনের পঠনপাঠনের সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে তাঁর মেধার স্ফূরণ ঘটে। মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি হিব্রু ও আরবি, ক্যালডিয়ান ও কপটিক ভাষায় অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেন। কেবলমাত্র প্রাচীন মিশরকে জানার জন্য তিনি এতগুলি সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করেছিলেন। শোনা যায় প্রাচীন চৈনিক ভাষাও তিনি শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর অনুসন্ধান-কাজে সহায়ক হবে এই বিশ্বাস নিয়ে কপটিক ভাষাকেই তিনি বেশি করে আঁকড়ে ধরেন। অথচ মিশরের এই অবলুপ্ত ভাষা শেখা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কেবলমাত্র মিশরীয় খ্রিস্টান সমাজ তাদের প্রার্থনামন্ত্রেই কপটিক ভাষাকে জিইয়ে রেখেছিল। হায়রোগ্লিফিকে

যে ভাষার ব্যবহার হয়েছে তারই জঠরে কপটিক ভাষার জন্ম হলেও এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল দুস্তর। এ্যাংলো-স্যাকসন যুগের ইংরেজির সঙ্গে বর্তমান যুগের ইংরেজির তফাতের মতই। কপটিক ভাষার মধ্যে হায়রোগ্লিফিকসের চাবিকাঠি লুকানো আছে মনে করেই শাঁপলিয়ঁ উঠেপড়ে লেগেছিলেন ভাষাটি আয়ত্ত করতে। কপটিক তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তিনি কপটিকের একটি অভিধানও সঙ্কলন করেন। সহোদরা ভাষা হিসাবে তিনি গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষাও শিখেছিলেন। ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর এমনি এক স্বাচ্ছন্দ্য এসে গিয়েছিল যে, যতই দুর্বোধ্য হোক কোন একটি নূতন ভাষা শিখতে তাঁর তিন-চার মাসের বেশি সময় লাগত না। পাড়াপড়শিরা বলত যে, প্রাচ্য ভাষা শিখতে শিখতে তাঁর গলার স্বরের পরিবর্তন হয়েছিল, চেহারাও গিয়েছিল বদলে। শোনা যায়, প্যারিসের এক সান্ধ্য-সভায় আরবদেশী কয়েকজন শেখ শাঁপলিয়ঁকে স্বদেশীবাসী বলে ভুল করে মাতৃভাষায় তাঁর সঙ্গে খোশগল্প জুড়ে দেন।

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র সতেরো বছর বয়সে শাঁপলিয়ঁ "ফারাওদের আমলে মিশব দেশ" শীর্ষক এক জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ বচনা করেন। ফারাওদেব সম্পর্কে এত বিজ্ঞানসম্মত বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা পূর্বে আব কোন পণ্ডিত করেননি। তরুণ গবেযকের সব বক্তব্যকে বিনা বিচারে মেনে নেওযা সে দেশেব যশস্বী পণ্ডিতদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তাঁরা এর ত্রুটিগুলি দেখাতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে হার স্বীকার করে বলতে বাধ্য হলেন যে, শাঁপলিয়ঁর মতামত কল্পনাপ্রসূত নয়। সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে যখন তাঁরা বুঝলেন, শাঁপলিয়ঁর সোনায় কোন খাদ নেই—তখন সানন্দে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। তাঁদের সুপারিশে শাঁপলিয়ঁকে গ্রেনোবল আকাদেমির সদস্য করা হল। সে যুগে প্যারিস ছিল ইউরোপের প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার প্রাণকেন্দ্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যাক যোশেপ জানতেন যে, যতক্ষণ প্যারিসের বিদ্বৎসমাজের স্বীকৃতি না পাচ্ছেন ততক্ষণ প্রত্নবিদ হিসাবে তাঁর ছোটভাই-এর আসনটি পাকা হবে না। এজন্যই তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হল প্যারিসে। এখানে এসে প্যারিসের পণ্ডিত-সমাজের শিরোমণি সিলভেস্তর দ্য সাসির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন তরুণ গবেষক শাঁপলিয়ঁ। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব সাসি তখন সবেমাত্র শাঁপলিয়ঁর লেখা ফ্যারাওদের কাহিনীর প্রথম অধ্যায়টি পড়ে শেষ করেছেন। ছেলেটির মধ্যে সত্যকারের প্রতিভার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। শাঁপলিয়ঁর বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু নতুন কথা ছিল, যা তাঁকে মুগ্ধ করে। কিন্তু সাক্ষাৎকারের দিন সাসি খানিকটা নিরাশ হয়েছিলেন। শাঁপলিয়ঁর কথাবার্তায় বিনয়ের অভাব ছিল। প্রথম থেকেই জ্ঞানবৃদ্ধ সাসিকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে শাঁপলিয়ঁ তাঁকে নানা কূটপ্রশ্নে জর্জরিত করতে থাকলেন। সাসির ধারণা হল, ছেলেটি মেধাবী—কিন্তু এর মধ্যে এক ফোঁটা বিনয় নেই। শ্রদ্ধা ও বিনয় ছাড়া কি জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হয়? তাই প্রথম দর্শনে ছাত্রটির বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে যতটা না হোক, তার অকালপক্কতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ

হয়েছিলেন আচার্য সাসি। অকালপক্কতার আর একটি নিদর্শন শীঘ্রই পাওয়া গেল। সেই বয়সেই তিনি বিয়ে করলেন তাঁর বৌদির বোন পলিনকে—যে ছিল তাঁর চেয়ে ছ'বছরের বড়। দুঃখের বিষয় বিবাহোত্তর জীবনের স্বপ্ন-রঙিন দিনগুলি বেশি দিন স্থায়ী হল না। বাস্তবের কঠিন আঘাতে তাঁর সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হল। কেবলমাত্র প্রত্নতত্ত্বের চর্চায় বা কাব্যালোচনায় সংসার চলে না। তার জন্য ভিন্ন রকমের প্রস্তুতি দরকার, যা শাঁপলিয়ঁর জানা ছিল না। অর্থকরী কোন বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেননি। পরের অধীনে চাকরি নিতেও তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল। দাদা জ্যাক যোশেপ সামান্য কিছু অর্থ তাঁকে প্রতি মাসে পাঠাতেন। সেই স্বল্প কটি টাকার উপর নির্ভর করেই তাঁকে সংসার চালাতে হত। অভাব অনটনের শেষ ছিল না। ল্যুভর মিউজিয়ামের কাছে ছোট একটি অস্বাস্থ্যকর ঘর তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন। এই ছোট ঘরটিতে তিনি অনন্যমনে পড়াশুনা চালিয়ে যেতেন—কেমন করে যে দু'বেলা আহার জুটছে সেদিকে বড় একটা খেয়াল ছিল না তাঁর। অবশেষে এমন একদিন এল যে, দাদার পাঠানো মাত্র আঠারো ফ্রাঁতে সংসার চালানো তাঁর দায় হয়ে উঠল। দাদাও ঠিক এই সময়ে আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁর পক্ষে ছোট ভাইকে নিয়মিত টাকা পাঠানো আর সম্ভব হচ্ছিল না। অর্থাভাবে শাঁপলিয়ঁর দু'বেলা ভরপেট খাওয়া বন্ধ হল—শীতবস্ত্রের অভাবে দারুণ শীতে তাঁর কষ্টের অবধি রইল না। অর্ধাহার ও অনাহারে শরীর এতই জীর্ণ হল যে, বছর না ফুরাতে তিনি শয্যা নিলেন। ঈশ্বরের অশেষ করুণা যে, শাঁপলিয়ঁ তখনো প্রাণে বেঁচে রইলেন। দুঃখের দিনের অবসান ঘটল সেইদিন, যেদিন তিনি শুনলেন, গ্রেনোবল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত করেছে। এই অল্পবয়সী ছাত্রটির সাফল্যে বয়োজ্যেষ্ঠরা ঈর্ষান্বিত হলেন। নানাভাবে তাঁরা শাঁপলিয়ঁর বিরোধিতা করতে থাকলেন। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তিনি এমন এক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন যাতে তাঁর মনের শান্তি নষ্ট হল। ঈর্ষাকাতর সতীর্থরা তাঁর বিরুদ্ধে জোট পাকাতে শুরু করল। তারা কুৎসা রটাল এবং কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধেও অভিযোগ তুলল। নিরপেক্ষভাবে অভিযোগের তদন্ত না করেই কর্তৃপক্ষ তাঁর বরাদ্দ বেতনের এক অংশ কেটে দিলেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি আর্থিক ক্ষতি। কিন্তু তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি যা শাঁপলিয়ঁর মনকে আঘাত করল, তা হচ্ছে এক অপমান-বোধ। মানসিক গ্লানি নিরন্তর তাঁর মনকে জর্জরিত করতে থাকল। সতীর্থদের নোংরামি কিন্তু তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারেনি। বাইরের সব ঝঞ্ঝাবাতকে উপেক্ষা করে প্রত্নতত্ত্বের সাধনায় তিনি অবিচলিত থাকলেন।

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজনৈতিক আকাশে আবার দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিল। নেপোলিয়নের একাধিপত্য শেষ হল—আরম্ভ হল তাঁর পতনের যুগ। বুর্বন-শাসকরা আবার ফিরলেন প্যারিসে, মিত্রশক্তির সক্রিয় সমর্থনে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়—ইতিহাসের চাকা আবার ঘুরল। তড়িৎগতিতে নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপের নির্বাসন ছেড়ে

আবার ফিরে এলেন মাতৃভূমিতে। শুরু হল 'একশত দিনের' সেই স্মরণীয় অধ্যায়। বুর্বন শাসক সিংহাসন ছেড়ে চম্পট দিলেন—আবার জয়মাল্য পরলেন বিপ্লবের বরপুত্র নেপোলিয়ন। পুর্বেই বলেছি, শাঁপলিয়ঁর পরিবার চিরদিনই ছিলেন নেপোলিয়নের সমর্থক। নেপোলিয়ন যেদিন সদলবলে গ্রেনোবল-এ এসে উপস্থিত হন—সেদিন শাঁপলিয়ঁ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নেপোলিয়ন মিশরের উপর তাঁর গবেষণা সম্পর্কে ঔৎসুক্য দেখান এবং বলেন, কপটিক ভাষা সম্বন্ধে তাঁর বইটি সরকারি খরচে তিনি প্রকাশ করে দেবেন। একজন পণ্ডিত-গবেষকের কাছে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে? কিন্তু নেপোলিয়ন তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি। তাঁর শেষের দিন দ্রুত ঘনিয়ে এলো—তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার সমাধি রচিত হল ওয়াটারলু প্রান্তরে। ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়ে তিনি চালান হয়ে গেলেন সেন্ট হেলেনা দ্বীপের চিরনির্বাসনে। প্যারিসে আবার বুর্বন শাসকদের পুনরাগমন ঘটল। অনেক নেপোলিয়ন-পন্থী বিপ্লববাদী গিলোটিনে প্রাণ দিল, অনেক দেশপ্রেমিক হল নির্বাসিত অথবা কারাগারে বন্দী। বিশেষ করে ধনেপ্রাণে মরল ফিজাক শহরের অধিবাসীরা—যারা ছিল নেপোলিয়নের অন্ধ ভক্ত। শাঁপলিয়ঁরা দুই ভাই বুর্বন শাসকের কুনজরে পড়লেন। দু'জনকেই সব রকম দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে বরখাস্ত করে শহরের মধ্যেই অন্তরীণ করে রাখা হল।

শাঁপলিয়ঁ যখন প্রায় গৃহবন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন মিশর দেশে নিত্যনতুন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার অব্যাহত ছিল। দেরিতে হলেও সে সব সংবাদ তাঁর কাছে এসে পৌঁছচ্ছিল। ইংরাজ প্রত্নবিদ্ হেনরি সল্ট 'ভ্যালি অব কিংস' উপত্যকায় খননকার্য চালিয়ে পাঁচটি রাজসমাধি ও সেই সঙ্গে 'বুক অব দ্য ডেড'-এর সন্ধান পান। প্যাপাইরাসের উপর হায়রোগ্লিফিক লিপিতে লিখিত এই 'মৃতের বইগুলিতে' পরলোকযাত্রী ফ্যারাও কি কি মন্ত্রবলে পরলোকের পথে সবরকম বাধাবিপত্তি এড়িয়ে অমৃতধামে পৌঁছবেন তারই বিস্তারিত নির্দেশ ছিল। হেনরি সল্ট ছাড়া আর একজন প্রত্নবিদ্, উইলিয়াম জন ব্যাঙ্কস্ হায়রোগ্লিফিক ও গ্রিক উভয় ভাষায় লিখিত 'ওবেলিস্ক অব ফাইলি' নামক শিলালিপির সন্ধান পেলেন। ঐতিহাসিক গুরুত্বে এটি দ্বিতীয় রসেটা স্টোনের সম্মান পেয়েছে।

এই মিশরীয় শিলালিপিগুলি পরীক্ষা করে শাঁপলিয়ঁ তিনটি ভিন্ন ধরনের লিপির পরিচয় পেয়েছিলেন—হায়রোগ্লিফিক, ডেমোটিক ও হায়রাটিক। ডেমোটিক হচ্ছে হায়রোগ্লিফিক লিপির ছোট হাতের টানা লেখার সংস্করণ। রসেটা স্টোনের দ্বিতীয় পঙক্তিতে ডেমোটিক লিপির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৬ খ্রিঃ পূর্বাব্দে মেমফিস নগরীতে মিলিত হয়ে পুরোহিত-মণ্ডলী এক ডিক্রি জারি করেন। রসেটা স্টোনে এই ডিক্রিটিই উৎকীর্ণ ছিল। কেবলমাত্র হায়রোগ্লিফিকে এই ডিক্রি লেখা থাকলে পণ্ডিত ও পুরোহিতরা বাদে এর মর্ম অন্য কেউ গ্রহণ করতে পারত না। তাই সর্বজনবোধ্য ডেমোটিক লিপিতে এটি লেখার প্রয়োজন হয়েছিল। হায়রোগ্লিফিক দেবভাষা—এর পরিচয় পণ্ডিত

demotic

hieroglyphic

p  t  o (wi)  l (rw)  m (mi)

i (jj)  s (s)

k (q)  l (rw)  e (j)

o (wi)  p  a (i)

t (d)  r  a (i)

Feminine ending

Determinative following a feminine name

হায়রোগ্লিফিক লিপির নমুনা (টলেমী ও ক্লিওপেট্রার নাম)

সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ডেমোটিক সর্বসাধারণের। এই দুই লিপি ছাড়া আর একটি লিপি প্রাচীন মিশরে ব্যবহৃত হত। এর নাম হায়রাটিক। হায়রোগ্লিফিক যখন প্যাপাইরাসের উপর লিখিত হত অথবা মঠমন্দির বা পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ হত, তখন এই টানা লেখার উৎপত্তি ঘটে। মনে রাখতে হবে, আইন আদালতের দলিলে বা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে ডেমোটিক লিপির প্রচলন ছিল। ডেমোটিক ও হায়রোটিক যমজ সহোদরা—তাদের উদ্দেশ্য এক এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। বয়সের দিক থেকে কোনটি আগে, কোনটি পরে, এ সম্বন্ধে শাঁপলিয়ঁ কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। 'বুক অব দ্য ডেড'-এ যে অসংখ্য হায়রোগ্লিফিকের নমুনা পাওয়া গেল তার মধ্যে ডুবে রইলেন তিনি। সমস্ত চিহ্নগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে এবং পর পর মিলিয়ে দেখতে শুরু করেন তিনি। প্রধান অক্ষর বা চিহ্নগুলি ক্রমশ তাঁর কাছে এতই পরিচিত হয়ে গেল যে, কোনটা বড় হাতের, কোনটা ছোট হাতের অথবা কোনটা কেবল টানা লেখাতেই ব্যবহৃত হয়, এসব কথা তিনি সহজেই বলে দিতে পারতেন। তার চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হায়রোগ্লিফিকের কোন এক অংশকে অপর দুই টানা লেখায় তিনি নিখুঁত রূপান্তরিত কবতে পারতেন। রসেটা স্টোনে শাঁপলিয়ঁ দেড় হাজার হায়রোগ্লিফিক চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিলেন। অপরদিকে এর গ্রিক ভাষ্যে ছিল পাঁচশত গ্রিক অক্ষর। এতে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, রসেটার চিত্রলেখ কেবলমাত্র ভাবব্যঞ্জক প্রতীক চিহ্ন বা ইডিওগ্রাম নয। তখন পর্যন্ত একটি মাত্র পরিচিত শব্দ 'টলেমেয়স্'-কে দিগদর্শনী হিসাবে ধরে শাঁপলিয়ঁ অজ্ঞাত বর্ণমালার গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এই শব্দটির জন্য তিনি ইয়ং-এর কাছে ঋণী ছিলেন। পরবর্তীকালে উইলিয়ম ব্যাঙ্কসের কাছ থেকে পাওয়া গেল 'ওবেলিস্ক অব ফাইলি'। সেখানে চক্রবদ্ধ অবস্থায় আরও একটি-নাম পাওয়া গেল। গ্রিক ভাষ্য পড়ে জানা গেল, নামটি "ক্লিওপ্যাটরা"। এক রাজা ও এক রানী—এই দুই নাম থেকে সর্বসমেত এক ডজন হায়রোগ্লিফিক চিহ্ন পেয়ে গেলেন শাঁপলিয়ঁ। মিশরের স্বর্ণযুগের দুই বিখ্যাত ফ্যারাও-এর নামও কিছুদিনের মধ্যে তিনি উদ্ধার করলেন। এতদিনের নীরবতা কাটিয়ে হায়রোগ্লিফিক লিপি সরবে আত্মপরিচয় ঘোষণা করতে থাকল। নতুন একটি শিলালিপিতে আরও একটি চক্রবদ্ধ নাম আবিষ্কার করে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে শাঁপলিয়ঁ সেটি পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। তাঁর মনে হল, এটির ভিতরকার একটি চিহ্ন যেন 'জন্ম নেওয়া' ক্রিয়াপদটির দ্যোতক। প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় তাঁর অসাধারণ জ্ঞান থাকায় তিনি ঠিকই অনুমান করলেন, ক্রিয়াপদটির মিশরীয় প্রতিশব্দ হচ্ছে 'মেস' কথাটি। এই শব্দের আগে ছিল সূর্যের প্রতীক চিহ্ন—যা ভগবান "রা"-কে বোঝায়। সবমিলিয়ে "রামেসিসে"র নামটি তিনি পেয়ে গেলেন। অনুরূপ চেষ্টায় 'থুটমোসের' নামটিও তিনি উদ্ধার করলেন। এতদিনে শাঁপলিয়ঁ নিঃসন্দেহ হলেন যে, হায়রোগ্লিফিক লিপি নিছক চিত্রসমষ্টি নয়। এগুলি ধ্বনিগুণ সমৃদ্ধ। এই সত্য উপলব্ধির পর আনন্দ ও উত্তেজনায়

অধীর হয়ে শাঁপলিয়ঁ ছুটে এসেছিলেন তাঁর বড় ভাই-এর ঘরে। কাগজপত্র সব তাঁর টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, "Je tiens l'affiire"—কাজটি আমার শেষ হয়েছে। তারপর তিনি মুর্ছিত হন। কঠোর পরিশ্রমের শেষে, ফলপ্রাপ্তির প্রচণ্ড উত্তেজনা ও আনন্দে, তাঁর জীবনীশক্তি একেবারে নিঃশেষিত। টানা পাঁচদিন তাঁর কাটল আচ্ছন্নতার ঘোরে—কখনও জেগে, কখনও ঘুমিয়ে। পাঁচদিনের মধ্যে এক মুহূর্তও ছোট ভাই-এর শয্যাপার্শ্ব ছেড়ে ওঠেননি জ্যাক-যোশেফ। মায়ের মত অতি যত্নে সেবাশুশ্রূষা করে ছোট ভাইকে আবার তিনি চাঙ্গা করে তুললেন। ছোট ভাই বিশ্ববরেণ্য হতে চলেছে এই আনন্দে তিনিও বিভোর ছিলেন। সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে শাঁপলিয়ঁ তাঁর পাঠোদ্ধার-কাহিনীর একটি রিপোর্ট লেখেন এবং গ্রেনোবল আকাদেমিতে তা পেশ করেন। ফ্রান্সের পণ্ডিত সমাজে এই আবিষ্কারের সংবাদ পৌঁছতে দেরি হল না। টমাস ইয়ং-এর মনে যে অনুমানটি উদিত হয়েছিল, তাকেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ও তথ্যের সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শাঁপলিয়ঁ। যে সম্ভাবনার কথা একজনের মনে অঙ্কুর অবস্থায় ছিল, তাকেই ফুলে-ফলে প্রস্ফুটিত করে তোলেন অপরজন। কপটিক ভাষার গঠন ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞানই তাঁকে নির্ভুল পাঠোদ্ধারে সহায়তা করেছিল। ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকেই হায়রোগ্লিফিকের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন হেনরি সল্ট, রিচার্ড লেপসিয়াস, ফন হ্যামবোল্ট ও আরও অনেক কৃতবিদ্য প্রত্নতাত্ত্বিক। যে সব পণ্ডিত এতকাল বলে বেড়াচ্ছিলেন যে, হায়রোগ্লিফিকের পাঠোদ্ধার দুঃসাধ্য—তাঁরা এবার হার স্বীকার করলেন। কিন্তু এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা কিছুতেই মানতে পারলেন না, শাঁপলিয়ঁ অসাধ্য সাধন করেছেন। প্রকাশ্যে কুৎসা রটনা করতেও তাঁদের বাধল না। বিশেষ করে ইংলন্ডে একদিন লোক প্রচার করল যে, শাঁপলিয়ঁ নয়, ইয়ং-ই আসলে পথ দেখিয়েছেন। সাফল্যের সবটুকু বাহবা তাঁরই প্রাপ্য। ফরাসি প্রত্নবিদের সাফল্যে ঈর্ষাকাতর ইংরেজরা মনে করল, এটা তাদের কাছে একটি জাতীয় পরাভব। দুঃখের বিষয়, ইয়ং নিজেও এই সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। তিনি শাঁপলিয়ঁকে কোন অভিনন্দন-বার্তা পাঠাননি। ইংরেজ পণ্ডিতরা আজও বলেন যে, শাঁপলিয়ঁ কোনদিনই অত বড় ছিলেন না—যতটা তাঁর সম্পর্কে ভাবা হয়েছে। আজ হায়রোগ্লিফিকের ব্যাখ্যা আমাদের কাছে খুব সহজ ও সরল মনে হয়। এককালে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যে প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডা ও বিতর্কের ঝড় উঠেছিল—সে কথা আমরা বিস্মৃত হই। পৃথিবীর সব বড় বড় আবিষ্কার সম্বন্ধেই বোধহয় একথা সত্য যে, নতুন কোন মতকে কেউ মালা-চন্দন নিয়ে বরণ করে না—তার প্রতিষ্ঠা হয় সন্দেহ-সংশয় ও নিন্দা প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই।

মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে মিশর দেশ ভ্রমণে এসেছিলেন শাঁপলিয়ঁ। জীবনব্যাপী সাধনার ক্ষেত্র মিশর ছিল তাঁর কাছে সকল দেশের সেরা দেশ। অধীর আগ্রহে পুরাকীর্তি

দেখে তাঁর দিন কাটল। অনেক দুর্গম স্থানে তিনি ঘুরে বেড়ালেন, সন্ধান পেলেন নতুন নির্দশনের। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর জীবনীশক্তি কমে আসছিল। প্রত্নতত্ত্বের কঠিন সাধনায় তার দৈহিক শক্তি নিঃশেষিত—অনাহারে ও অল্পাহারে তাঁর শরীর শীর্ণ, চক্ষু কোটরাগত, দেহ আনত। সময় বুঝে যক্ষ্মা রোগের বিষ প্রবেশ করল তাঁর দুর্বল দেহে। এই সময় সমস্ত অসুস্থতাকে ভুলে তিনি এক বিরাট কপটিক অভিধানের সঙ্কলন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অভিধানটি যেমন দিন দিন স্ফীতাকার হচ্ছিল, অন্যদিকে হতভাগ্য লেখক কৃশ থেকে কৃশতর হচ্ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। তাই প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, ঈশ্বর যদি আর দুটি বছর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখেন তবে আরব্ধ কাজটি তিনি সম্পন্ন করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছা শেষপর্যন্ত পূর্ণ হল না। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক শেষ-নিঃশ্বাস ছাড়লেন ১৪ মার্চ ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ বছর। মৃত্যুর পর তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর সমাধিস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন হাজার-হাজার ফরাসি নর-নারী-সহ ইউরোপের অনেক গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি। শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে আসেন আচার্য সাসি ও ফন হ্যামবোল্ট। তাঁরা শবাধারটি বহন করে সমাধিস্থলে আনেন। জীবিতকালে যিনি তাঁর যথাযোগ্য সম্মান পাননি, মৃত্যুতে তিনি লাভ করলেন সকলের অকুণ্ঠ সাধুবাদ। প্রত্নতত্ত্বের সাধনায় শাঁপলিয়ঁ তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ উজাড় করে দিয়েছিলেন। সরকারের আক্রোশ, শত্রুদের নিন্দা, তাদের ঈর্ষা ও বিদ্রূপ, সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত অভাব-অনটন, রোগভোগ—কোন কিছুর দিকে নজর দেবার সময় ছিল না তাঁর। সুনাম-দুর্নাম যশ-অপযশের কথা না ভেবে, ফলপ্রাপ্তির আশা মনে পোষণ না করে, নিষ্কাম সাধনায় ব্রতী ছিলেন তিনি। তাঁর মতে, প্রত্নতত্ত্বের সাধনায় যারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা অর্থ-প্রতিপত্তির কথা চিন্তা করে তারা নিরাশ হতে বাধ্য—কেননা 'আর্কেয়লজি ইজ্ আ বিউটিফুল ডটার উইদাউট এনি ডাওরি'।

---

# বেহিস্তুনের শিলালিপি

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় পাঁচ শত বছর আগে পশ্চিম এশিয়া-প্রান্তে হখামণিষীয় বা আকেমিনীয়ান্ রাজারা এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্দারের আক্রমণে তাঁদের এই সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। ঐতিহাসিক ডায়োডোরাস্-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পারস্য অধিকারের পর একদিন সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে আলেকজান্দার এঁদের রাজধানী পার্সিপোলিস্ আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দেন। এথেন্সের নর্তকী থেইস্ নাকি তাঁকে এই ধ্বংসকার্যে প্রবৃত্ত করে। বর্তমান সিরাজ শহরের চল্লিশ মাইল উত্তরে পার্সিপোলিসের ধ্বংসস্তূপ। খননকার্যের ফলে এখান থেকে পণ্ডিতেরা সংগ্রহ করেছেন অসংখ্য বাণমুখ বা কিউনিফর্ম লিপি—কোনটা প্রস্তরগ্রাত্রে খোদাই করা, কোনটা বড় বড় ইঁটের উপর তীরের ফলার মত খোঁচা খোঁচা অক্ষরে লেখা। কেবল পার্সিপোলিসই নয়—নিকটে অবস্থিত চিহিল মিনার ও নাক্‌খি রুস্তমে এ ধরনের আরও লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস নদী-বিধৌত অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পলিমাটির অভাব ছিল না কোনদিনই। এই পলিমাটির উপর লৌহশলাকা বা গাছের ডাল দিয়ে অনায়াসে খোঁচা খোঁচা অক্ষরগুলি খোদাই করত এখানকার অধিবাসীরা। এগুলিকে পরে রৌদ্রে উত্তপ্ত করে বা অগ্নিদগ্ধ করে কঠিন আকৃতি দান করত তারা। প্রস্তরে বা ধাতুর উপর কোন কিছু উৎকীর্ণ করতে হলে তারা বাটালি ব্যবহার করত। অনেকক্ষেত্রে লেখাগুলি দেখতে হত সাধারণ পেরেকের মত। তাই এই লিপির নাম হল 'নেল রাইটিং' বা 'কিউনিফর্ম'—বাংলায় কীলাকৃতি বা বাণমুখ লিপি।

ইউরোপে রেনেসাঁস আন্দোলনের পর থেকেই সেখানকার পণ্ডিত-সমাজে প্রাচ্য দেশগুলিকে জানবার ও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার একটা আগ্রহ ও কৌতূহল দেখা দিল। প্রাচ্য দেশীয় পুরাকীর্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হলেন তাঁরা পারস্যের প্রাচীন বাণমুখলিপির প্রতি। সপ্তদশ শতকে স্পেনিশ্ পর্যটক পিয়েত্রো দেল ভালে এবং অষ্টাদশ শতকে জার্মান পণ্ডিত কারস্টেন নিইবুর পারস্য ভ্রমণে এসে এখানকার প্রত্নকীর্তির অনুসন্ধান করেন। পার্সিপোলিস্ প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে তাঁরা অনেক শিলালিপি দেখলেন। এই লিপি কারা উৎকীর্ণ করে গেছে,—কি তাদের ভাষা, কি তাদের অর্থ, এ ধরনের নানা প্রশ্ন তাঁদের মনে ভিড় করে আসে। নিইবুর গভীর যত্ন সহকারে শিলালিপির ছবি নিজের খাতায় এঁকে নেন এবং পরে এইগুলিই ইউরোপের পণ্ডিত সমাজের সামনে উপস্থাপিত করেন। বাণমুখ লিপির বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা তাঁর

আমল থেকেই শুরু হয়। সারা অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে একাধিক পণ্ডিত—ডু পেরোঁ, কাউন্ট কাইলাস্, টিসেন, মিউন্টার প্রভৃতি বাণমুখ লিপির রহস্য অনুসন্ধান করেন এবং তাঁদের সম্মিলিত সাধনা পাঠোদ্ধার প্রচেষ্টাকে সফলতার পথে অনেক দূর এগিয়ে দেয়। অবশেষে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে গবেষণা-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন জার্মান পণ্ডিত গ্রটেফেন্ড এবং তাঁরই চেষ্টায় অসম্ভব সম্ভব হল। বহুদিন কঠোর পরিশ্রমের পর তিনিই সন্ধান পেলেন কিউনিফর্মের চাবিকাঠির। জার্মানির ছোট শহর মুন্ডেনে ১৭৭৫ সালে তাঁর জন্ম। গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধর্মশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্বে পাঠ গ্রহণ করেন। পাশ করে বেরিয়ে তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল স্কুলে চাকরি নেন। নগণ্য শিক্ষক তাই কোনদিনই খানদানি পণ্ডিত সমাজে তাঁর স্থান হয়নি। সামান্য ইস্কুল মাস্টার বলে সকলে যেন তাঁকে একটু দূরে সরিয়ে রাখত। ভাষাতত্ত্ব থেকে কোন এক সময়ে গ্রটেফেন্ড প্রত্নতত্ত্বে আকৃষ্ট হন। খানিকটা ঝোঁকের বশেই পার্সিপোলিসের শিলালিপি নিয়ে পড়াশুনা শুরু করে দেন। একদিন কয় বন্ধু মিলে রেস্তোরাঁয় খানাপিনা করছেন, এমন সময় এক বন্ধু বোধহয় পরিহাস-ছলেই কিছু বলেছিলেন—যার উত্তরে গ্রটেফেন্ড বাজি রাখলেন যে, কিউনিফর্মের পাঠোদ্ধার তিনি করবেনই। ঘটনাটি অকিঞ্চিৎকর হলেও তাঁর কর্মজীবনে এক গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল।

b) … 1. a) …
b) … 2. a) …
b) … 3. a) …

1. a) *šar*
2. a) *gir*
3. a) *lum*

b) *ša-ar*
b) *gi-ir*
b) *lu-um*

*বেহিস্তুনের শিলালিপির নমুনা*

পার্সিপোলিস্-এর শিলালিপি পরীক্ষা করতে করতে গ্রটেফেন্ড লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাণমুখ লিপির কীল বা ফলাগুলি উপর থেকে নিচে অথবা বাঁদিক থেকে ডাইনে হেলানো এবং দুটি ফলার সংযোগে যে কোণের সৃষ্টি হয় সেটিও ক্রমশ দক্ষিণে সঞ্চরণশীল। এর থেকে গ্রটেফেন্ড সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেলেন যে, শিলালিপিটি বাঁ দিক থেকে ডাইনে পড়তে হবে। দ্বিতীয়ত তিনি ভেবে দেখলেন যে, প্রাচীন স্মৃতিসৌধ বা শবাধারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এমন কতকগুলি কথা লেখা থাকে, যা প্রায় বাঁধা গতের মধ্যে পড়ে যায়। লেখকরা অন্য কথার সঙ্গে ফর্ম বা প্রথা অনুযায়ী কিছু বাঁধা বুলি জুড়ে দেন। যেমন ধরা যাক, সাধারণ কফিন্ বা শবাধার। তার ওপর মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে 'শান্তিতে নিদ্রা যাও' কথাটি তো লেখা থাকবেই। পার্সিপোলিস্ লিপিতে অনুরূপ কোন বাঁধা বুলি বা ফর্মুলা পাওয়া যাবে কি? এই চিন্তা থেকে গ্রটেফেন্ড ক্রমশই এক অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে চললেন। সমগ্র লিপিটি পরীক্ষা করে তাঁর মনে হল কয়েকটি অক্ষর যেন বার বার ঘুরে-ফিরে আসছে। তাহলে কি এমন হতে পারে যে, পার্সিপোলিস্ প্রাসাদ যা রাজারা বানিয়েছিলেন, তাঁদের নাম বংশপরম্পরায় এই লিপিতে উৎকীর্ণ হয়েছে? ফর্মুলাটি মনে মনে গ্রটেফেন্ড ছকে ফেললেন; তাঁর মনে হল, হয়ত এ ধরনের কথা এতে থাকবে, যথা 'ক বিখ্যাত রাজা, খ দেশের রাজা, গ ও ঘ এর পুত্র, বড় রাজা, রাজার রাজা' ইত্যাদি। এবার তাঁর চেষ্টা হল, কি করে শিলালিপির অক্ষরের উপর পারস্যের প্রাচীন শাসকদের নাম বসানো যায়। আকেমিনীয় রাজাদের নামের তালিকা হেরোডোটাস পড়ে জানা গেল। সেই তালিকা থেকে প্রয়োজন-মত নাম চয়ন করে দেখতে লাগলেন, কোন নামটা ঠিক জায়গায় বসানো যায়। কাইরাস্ ও ক্যাম্বাইসিস্—নাম দুটো প্রথমেই বাতিল করতে হল; কেন না শিলালিপিতে একই আদ্যক্ষরযুক্ত দুটি নাম পর পর পাওয়া গেল না। আরও একটি নাম বর্জন করতে হল—আরটাজারেক্সেস্। এত বড় দীর্ঘ নাম শিলালিপিতে বসানো গেল না। বাকি রইল—ডেরিয়াস ও জোরেক্সেস্। গ্রটেফেন্ডের দৃঢ় ধারণা হল, এই নাম দুইটি শিলালিপিতে ব্যবহৃত হয়েছে। শিলালিপিতে নাম দুটি খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। কিন্তু সব অক্ষরগুলি যখন ঠিক ঠিক মিলল না তখন তিনি আকেমিনীয়ান রাজাদের আদি ও অকৃত্রিম নামগুলি জানবার জন্য হেরোডোটাস্ ছেড়ে, ওল্ড টেস্টামেন্ট ও অবেস্তার শরণাপন্ন হলেন। সেখানে তিনি হিস্টাসপিস্কে গোস্টানসপ, জোরেক্সেসকে খয়ারর্স এবং ডেরিয়াসকে দারবযুস রূপে উচ্চারিত হতে দেখলেন। এই রকম উচ্চারণের তিনটি নামকে তিনি শিলালিপিতে যথাযথ স্থাপন করতে পারলেন এবং তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে তেরোটি বাণমুখ লিপির ধ্বনিগুণ জানা গেল।

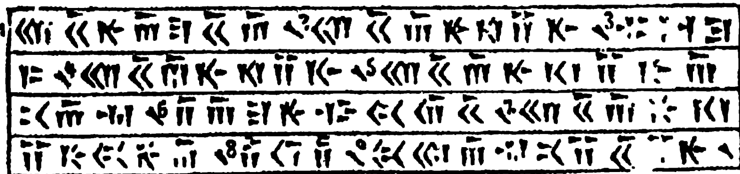
গ্রটেফেন্ডের এই আবিষ্কারকে কিউনিফর্মের রহস্যোদ্ঘাটনের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। কিন্তু এতবড় যুগান্তকারী কীর্তির জন্য তাঁকে কেউ অভিনন্দন জানাল না।

বেচারি গ্রটেফেন্ড জীবদ্দশায় কোন স্বীকৃতি পেলেন না। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ বছর। তিনি যখন তাঁর গবেষণা গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করলেন তখন সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁর মত অর্বাচীনের এত বড় দাবি অবিশ্বাস্য বলে থিসিস্‌টি বাতিল করে দিলেন। এক সামান্য স্কুল-মাস্টার এত বড় একটা গবেষণায় সফল হবে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহা-মহোপাধ্যায়রা কিছুতেই মানতে চাইলেন না। ইতিহাসের পাতা থেকে গ্রটেফেন্ডের নাম চিরতরে মুছে যেত যদি না তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর উইলিয়াম মেয়ার সেই বাতিল করা থিসিসটি পুনরুদ্ধার করতেন। এখন সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, সর্বপ্রথম সফলতার সঙ্গে তেরোটি বাণমুখ অক্ষরের পাঠ তিনিই করেছিলেন এবং যদিও পরে অনেকে অধিকতর সাফল্য লাভ করেন, তবু পথিকৃতের সম্মান গ্রটেফেন্ডের প্রাপ্য। অনুসন্ধানের প্রথম পর্ব শেষ হল গ্রটেফেন্ডের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু ইংরাজ পণ্ডিত রলিনসনের আবির্ভাবে।

১৮১০ সালে রলিনসনের জন্ম। বিদ্যালয়ে তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পড়াশুনোয় যেমন তাঁর মাথা, খেলাধুলাতেও তেমনি তিনি চৌকস। তাঁর মত ছেলের দিকে তাকিয়েই হয়ত সে আমলের প্রবাদ বাক্যটির উৎপত্তি—“ইটনের খেলার মাঠে ইংরাজরা ওয়াটারলুর যুদ্ধ জিতেছিল।” দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান যুবক রলিনসন্ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দপ্তরে একটি ভাল চাকরি পেয়ে গেলেন। কিন্তু যিনি ধুরন্ধর রাজপুরুষ হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য জীবন শুরু করেছিলেন, তিনিই অবশেষে প্রত্নতত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে সারা জীবন দুরূহ গবেষণা নিয়ে মেতে রইলেন। এক দৈব তথা আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে রলিনসন প্রত্ন-জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন। যে জাহাজে তিনি ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন সেই জাহাজেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর স্যার জন্ ম্যালকমের—যিনি ছিলেন সে যুগের এক প্রখ্যাত প্রাচ্য-শাস্ত্রবিদ্। জাহাজের ডেকে এই তরুণকে দেখে তাঁর খুব ভাল লেগে যায়। খানিকটা ইচ্ছা করেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন তিনি। প্রথম পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে আলাপ ঘনীভূত হল। স্যার ম্যালকম যুবকটির কৌতূহল ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তি দেখে খুবই প্রীত হয়েছিলেন—এবং আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রাচ্যশাস্ত্রাদির প্রতি তাঁর নিজস্ব অনুরাগের কিছুটা এই তরুণের মনেও সংক্রামিত করতে পেরেছিলেন। ভারতে নেমে রলিনসন এদেশের প্রাচীন ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে বদ্ধপরিকর হলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হিন্দুস্থানী, আরবি ও ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেন। প্রাচীন পারস্যের সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবর রাখতে আরম্ভ করলেন। ফিরদৌসীর শাহনামা কাব্য থেকে তিনি অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন।

১৮৩৬ সালে ভারত থেকে পারস্যে তাঁকে বদলি করা হল। পারস্যের জনৈক প্রাদেশিক গভর্নরের সামরিক সচিব হিসাবে রলিনসন কিরমানসাতে এসে উপস্থিত হলেন।

অল্প দিনের মধ্যে পারস্যবাসীদের হৃদয়ও জয় করলেন তিনি। জনপ্রিয়তার দিক থেকে তাঁর সুখ্যাতির একমাত্র তুলনা করা চলে পরবর্তী কালের লরেন্স অব অ্যারেবিয়ার সঙ্গে। কিরমানসাতে পৌঁছে রলিনসন দুটি সংবাদ পেলেন যা তাঁকে অতিমাত্রায় উৎসাহিত করে তুলল। অনুচররা খবর দিল, হামাদানের দক্ষিণে ১২ হাজার ফুট উঁচুতে আলতেন্দ পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি অদ্ভুত লিপি খোদাই করা আছে। সাধারণের ধারণা, এগুলি পড়তে পারলে গুপ্তধনের সন্ধান মিলবে। রলিনসন কিন্তু এছাড়াও এমন একটি রত্ন ভাণ্ডারের সন্ধান পেলেন যার কাছে হামাদানের ঐশ্বর্য হার মানবে। তিনি খবর পেলেন, কিরমানসা থেকে বিশ মাইল দূরে বেহিস্তুন পাহাড়ের গায়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিরাট এক শিলালিপি। বেহিস্তুন পাহাড়ের দক্ষিণ সীমা দিয়ে চলে গেছে পুরাকালের সেই বিখ্যাত সড়কটি যা বাগদাদ থেকে হামাদান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দীর্ঘ শতাব্দী ধরে ব্যবসায়ীরা এই পথেই যাতায়াত করত। যাতে এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের লোকেরা হাজার হাজার বছর ধরে তার বিজয়বার্তা পড়তে পারে, সেই উদ্দেশ্যে রাজা ডেরিয়াস্ বেহিস্তুন শিলায় তাঁর কীর্তি-কাহিনী লিখে দিয়েছিলেন। রলিনসন ভাল অশ্বারোহী—কালবিলম্ব না করে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন বেহিস্তুন পাহাড়ের দিকে। পৌঁছে যা চোখে দেখলেন তা অবাক হবার মতই। বহু দূর থেকে দেখা যায় পাহাড়ের চূড়া—আকাশ ভেদ করে যা উঠে গেছে প্রায় দু'হাজার ফুট উপরে। তারই গায়ে মাটি থেকে তিনশ ফুট উঁচুতে শিলালিপির নিম্নাংশ কেবল চোখে পড়ে। শিলালিপিটি বিরাট। দৈর্ঘ্য ১৫০ ফুট, প্রস্থে ১০০০। এই লিপির পূর্ব ইতিহাস বলে রাখা ভাল। পারস্য দেশ আকেমিনীয় শাসকদের দখলে আসে খৃস্টপূর্ব ৭০০ অব্দে। এই রাজবংশের প্রসিদ্ধ রাজা কাইরাসের (কুরুষের) পুত্র ক্যাম্বাইসিস্ (কম্বুষ) মিশর জয় করেন। মিশর যুদ্ধে তিনি যখন ব্যস্ত, তখন পারস্যের



*বেহিস্তুনের বাঁদিকমুখো লিপির নমুনা*

পুরোহিত-সম্প্রদায় গৌমত নামক এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। ক্যাম্বাইসিস্ দ্রুত রাজধানীতে ফেরার তোড়জোড় শুরু করলেন—কিন্তু পথে সিরিয়াতে তাঁর মৃত্যু হল। তাহলেও বিদ্রোহীদের সুবিধা হল না শেষ পর্যন্ত—কেন না রাজপুত্র ডেরিয়াস্ গৌমতকে হত্যা করে সিংহাসন নিষ্কণ্টক করলেন এবং গৃহযুদ্ধ দমন করে বিদ্রোহীদেরও শাস্তি দান করলেন। ভগবান আহুরা মাজদার আশীর্বাদে জয়ী হয়ে ডেরিয়াস (দারবয়ুস) পাষাণ-ফলকে তাঁর বিজয়বার্তা উৎকীর্ণ করে দিলেন। বেহিস্তুন পাহাড়ে রলিনসন যে চিত্রটি দেখলেন তা নিম্নরূপ।

মুকুটপরিহিত রাজা সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান। উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তে তিনি ভগবান আহুরা মাজদার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন; বাম হস্তে ধনুক বাণ। তাঁর দুই পার্শ্বে দুই রাজপুরুষ, পদতলে বিদ্রোহী গৌমত শায়িত। আটজন সামন্তরাজা সম্রাটের কৃপা ভিক্ষা করছে। তাদের সকলের গলা একটি মোটা দড়িতে এক সারে বাঁধা।

এই অদ্ভুত চিত্রটি পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কেউ এর সঠিক পরিচয় জানত না। এক আরব পণ্ডিত এক সময়ে খুব মজার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, চিত্রটিতে নাকি প্রাচীন এক বিদ্যায়তন দেখানো হয়েছে—যেখানে গুরুমশাই বেত হাতে ন'জন অবাধ্য ছাত্রকে শাসন করছেন!

বেহিস্তুন-লিপি ত্রিভাষিক। এর প্রথম অংশে প্রাচীন ইরানি, পরে এলামাইট ও সব শেষে ব্যাবিলনীয়ান ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যেস্থানে প্রাচীন ইরানি অংশটি উৎকীর্ণ আছে, সেখানে পৌঁছতে লম্বা মই-এর দরকার হল। কিন্তু মই জোগাড় করেও দেখা গেল, পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ খাঁজে মই ঠিকমত দাঁড় করানো যায় না। তবু সব বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কোনক্রমে লিপিটির কপি নিতে শুরু করলেন রলিনসন। অবসর মুহূর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি চলে আসতেন বেহিস্তুনে এবং এই ভাবে অনেকদিন ধরে কাজটি ধীরে ধীরে সমাপ্ত হল। কিন্তু বাদ সাধল এলামাইট লিপিটি—যেটির অবস্থান ছিল আরও উঁচুতে। পাহাড়ের গায়ে এক স্বল্প-পরিসর স্থানে কোনরকমে মইটি বসানো হল এবং তারই সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে কোনদিকে ভর না রেখে, ড্রয়িং করলেন রলিনসন। সিঁড়ি ভেঙে পড়ে একবার তো তাঁর প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছিল—দড়ি আঁকড়ে ঝুলে পড়ে কোনক্রমে বেঁচে যান। ব্যাবিলনীয়ান লিপিটি কপি করা আরও কঠিন। ভাল দূরবীন চোখে লাগিয়ে নীচ থেকে ধীরে ধীরে কপি করা যায়—কিন্তু সমগ্র লিপিটির ছাপ নিতে হলে কাজটা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। নিজে আর এই বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে রলিনসন দলের লোকদের সুযোগ দিয়ে দেখলেন, কে এই দুঃসাহসিক কাজ করতে রাজি আছে। এক কুর্দি যুবক এগিয়ে এসে জানাল, সে চেষ্টা করে দেখতে পারে। পাহাড়ের ফাটলে একটি খুঁটি গুঁজে সে দড়ির সাহায্যে নিজেকে দোলনার মত দুলিয়ে দিয়ে অপর চূড়ায় (যেখানে ব্যাবিলনীয়ান লিপিটি ছিল) পৌঁছে গেল। তারপর দুই খুঁটির মধ্যে এক দড়ি

বাঁধল এবং তার মধ্যে এক খাঁচা বসিয়ে অনায়াসে শিলালিপির মধ্যস্থানে পৌঁছে গেল। প্রয়োজনীয় ছাপ সংগ্রহ করে আনতে তার দেরি হল না। সব দেখে রলিনসনের মনে হল, এ যেন সার্কাসের ভেল্কিবাজি!

সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় রলিনসন প্রাচীন ইরানি অংশটির সবটাই অনুবাদ করতে পেরেছিলেন। প্রথমে তিনি গ্রটেফেন্ড-এর মতই রাজারাজড়ার নাম খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেন এবং ক্রমে সবটাই পড়ে ফেলেন। যদিও তাঁর গবেষণা-রীতির সঙ্গে গ্রটেফেন্ডের পদ্ধতির গভীর মিল ছিল, তবু তিনি তাঁর পূর্বসূরির কাছ থেকে কিছুই ধার করেননি। গ্রটেফেন্ডের মতই রাজা-রাজড়ার নাম তিনি আদৌ জানতেন না। ১৮৪৫ সালে রলিনসনের বিখ্যাত 'মেমওয়ার' প্রকাশিত হল—তাতে তিনি কিউনিফর্মের রহস্য-কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। যে বিষয়টি এতদিন পণ্ডিতসমাজে বিতর্কের বিষয় ছিল—তা এবার সহজ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের উপযোগী হয়ে উঠল। রাতারাতি বিখ্যাত হলেন হেনরি রলিনসন। বেহিস্তুন লিপির প্রথমাংশে আছে রাজা ডেরিয়াসের বিস্তারিত বংশপরিচয়। দ্বিতীয়াংশে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তাঁর বাণী—যেখানে তিনি পথিকদের আহ্বান করে বলছেন, 'তোমরা যারা পথে হেঁটে যাচ্ছ—ক্ষণেকের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। ভাল করে চেয়ে দেখ আমার উৎকীর্ণ বাণীর দিকে। কেউ এগুলিকে মুছে ফেলো না, বা ভাঙবার চেষ্টা করো না। আমর প্রবল প্রতাপের নীরব সাক্ষীস্বরূপ এরা যেন মহাকালের সামনে অনাদি-অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকে।'

রসেটা স্টোনের গ্রিক অংশ জানা থাকাতে মিশরীয় চিত্রলেখের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছিল। তেমনি বেহিস্তুনের প্রাচীন ইরানি অংশের পাঠোদ্ধার হওয়ার ফলে অন্য দুটির—এলামাইট ও ব্যাবিলনীয়ান অংশেরও রহস্যোদ্ঘাটনের বিলম্ব হল না।

রাজা ডেরিয়াস্ তিনটি ভাষায় তাঁর বাণী উৎকীর্ণ করেছিলেন। একটি ভাষাই কি যথেষ্ট ছিল না? এলাম পারস্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য—যার রাজধানী ছিল বিখ্যাত সুসানগরী। সুমার ও ব্যাবিলনীয়ান সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে এলামাইটদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এই ভাষা না ইন্দো-ইউরোপীয়, না সেমিটিক। আজও এই ভাষা সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। আকেমিনীয় শাসকদের হাতে পরাজিত হলেও এলামাইটরা নিজেদের ভাষা-সম্পদ বাঁচিয়ে রাখে। শিলালিপিতে পরাজিত এলামাইটদের ভাষা গ্রহণ করে ডেরিয়াস তাকে স্থায়ী মর্যাদা দিয়ে গেলেন। তৃতীয় ভাষাটি সে যুগের অতি সমৃদ্ধিশালী ভাষা। ব্যবিলনীয়ান ভাষা সমগ্র পশ্চিম এশিয়া প্রান্তে রাষ্ট্রভাষার সমান মর্যাদা পেত এবং এই ভাষা নিজ মাহাত্ম্যেই শিলালিপিতে তার স্থান করে নেয়। এলামাইট লিপির মর্মোদ্ধার করেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত এডুইন মরিস। ইনি রলিনসনের সমকালীন। এলামাইট অংশটি পরীক্ষা করে মরিস দেখেন এতে ১১১টি চিহ্ন বিদ্যমান। সংখ্যা দেখে বোঝা গেল এই লিপির মধ্যে

কোন বর্ণমালা আত্মগোপন করে নেই। আবার এখানে চিত্রলেখের মত সুপ্রচুর প্রতীক চিহ্নেরও সন্ধান পেলেন না মরিস। অনেক ভেবে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, এলামাইট লিপিতে এক একটি অক্ষর এক একটি সিলেবেলের মত ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেহিস্তুনের তৃতীয় লিপি অর্থাৎ ব্যবিলনীয়ান অংশের পাঠোদ্ধারেই সব চেয়ে দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন পণ্ডিত সমাজ। অনেকভাবে সমস্যাটির উপর আলোক-সম্পাতের চেষ্টা হল—কিন্তু অন্ধকার কিছুতেই দূর হল না। রলিনসন নিজে হতাশ হয়ে গবেষণা থেকে সরে দাঁড়াবেন ভেবেছিলেন। গবেষকরা যখন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, কোন রকমেই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছেন না, তখন একদিন শোনা গেল, প্রখ্যাত প্রত্নবিদ্ বোটা ও লেয়ার্ড মেসোপটেমিয়ায় খননকার্য চালিয়ে অনেক নতুন নিদর্শনের সন্ধান পেয়েছেন। লেয়ার্ডের পরম সৌভাগ্য, তিনি প্রাচীন নিনিভের বিখ্যাত গ্রন্থাগারটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছিলেন। এখানে প্রায় বিশ হাজার মাটির 'ট্যাবলেট' পাওয়া গেল। এগুলির মধ্যে এমন একটি আশ্চর্য জিনিস ছিল, যা হাতে পেয়ে হতাশাক্লিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিকরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন। এটি একটি অভিধান বা ব্যাকরণের বই—যার সাহায্যে ব্যবিলনীয়ান বাণমুখ লিপির ধ্বনিগুণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। বিদেশি ছাত্রদের সুবিধার জন্যই হয়ত এমন একটি বই রচিত হয়েছিল। এটির সাহায্যে পণ্ডিতরা অনেক অজ্ঞাত অক্ষরের ধ্বনিগুণ জেনে নিলেন। ফলে অজ্ঞাত লিপিটি আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল। চারজন নামকরা প্রত্নতাত্ত্বিক—রলিনসন, হিনকস, ট্যালবট ও ওপার্ট প্রায় একই সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা ব্যবলনীয়ান লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন। এঁদের দাবি কতদূর সত্য যাচাই করার জন্য একটা সুযোগও উপস্থিত হল। মধ্য প্রাচ্য থেকে তখন সবেমাত্র একটি ব্যবিলনীয়ান লিপির নমুনা লন্ডনে এসে পৌঁছেছিল। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সুযোগ্য সেক্রেটারি এডুইন মরিস চার বিশেষজ্ঞের কাছে এর এক-একটি কপি পাঠিয়ে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই উত্তর চলে এলো। মরিস গভীর পরিতোষের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, চার পণ্ডিত প্রায় একই অনুবাদ পাঠিয়েছেন। এর দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল যে, অসংখ্য জটিলতা সত্ত্বেও দুরূহতম বাণমুখ লিপির রহস্যভেদ হয়েছে।

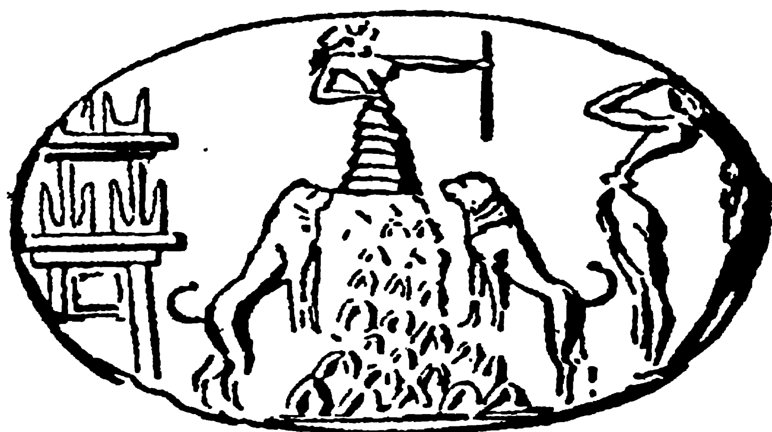
বাণমুখ লিপি সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের শতবর্ষব্যাপী গবেষণা প্রাচীন জগৎ সম্বন্ধে মানুষের চিরাচরিত ধারণাকে আমূল বদলে দিল। একশ' বছর আগে সকলেই জানত, ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায়টি শুরু হয়েছে হোমারের আমল থেকে। নতুন আবিষ্কারের ফলে ইতিহাসের দিগন্ত আরও সুদূরে বিস্তৃত হল—পরিচয় পাওয়া গেল আরও অনেক প্রাচীন সভ্য সমাজের। জানা গেল, হোমারের গ্রিস নয়, মানব সভ্যতার অরুণোদয় ঘটেছিল মিশর, ব্যবিলন ও অ্যাসিরিয়াতে।

---

# মিনসের রাজপ্রাসাদ ও আর্থার এভান্স

খ্রিস্টজন্মের আনুমানিক তিন হাজার বছর আগে গ্রিকরা কোন এক অজ্ঞাত আস্তানা ছেড়ে ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিতে বসবাস করতে আসে। বহিরাগত এই জাতি সঠিক কোন সময়ে গ্রিসে প্রবেশ করেছিল এবং কাদের হটিয়ে এখানে নিজেদের জায়গা করে নিল, সে খবর ইতিহাসে লেখা নেই। গ্রিসের সাবেকি অধিবাসীরা আক্রমণের চাপে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হল—উন্নততর গ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের গ্রাস করল কালক্রমে আক্রমণকারীদের সঙ্গে অবলীলাক্রমে তারা এমন মিশে গেল যে, তাদের আলাদা করে চিনবার আর কোন উপায়ই রইল না। প্রাগৈতিহাসিক গ্রিসে যে সব জাতি-উপজাতি বসবাস করত তাদের ইতিহাস গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অন্ধকার ভেদ করে আলোর সন্ধান যে একেবারেই পাওয়া যায়নি, তা নয়। হোমারের মহাকাব্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা—এই দুই চাবিকাঠির সাহায্যে সুদূর অতীতের অনেক রহস্যের সন্ধান এখন আমরা পেয়েছি। গত একশ' বছরের মধ্যে প্রধানত চারটি জায়গা—ক্রীট, ট্রয়, মাইকেনী ও টিরিন্স-এ খনন কার্য চালিয়ে প্রত্নবিদরা হোমারের পূর্বে গ্রিক জগতের ছবি কেমন ছিল তার কিছুটা জানতে পেরেছেন।

আজ থেকে সত্তর বৎসর পূর্বে ক্রীটে মিনোয়ান সভ্যতার আবরণ উন্মোচন করেন ইংরেজ পণ্ডিত (স্যার) আর্থার এভান্স। ১৮৫১ সালে এক সচ্ছল অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা জন এভান্স ছিলেন সে যুগের এক প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্—এবং বিশিষ্ট জ্ঞানান্বেষী হিসাবে রয়াল সোসাইটির সদস্য। যদিও কাগজের ব্যবসায়ে লাভবান হয়ে তিনি প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিলেন—তবু অর্থোপার্জনকেই তিনি জীবনের সার ভাবেননি। বিশুদ্ধ জ্ঞানান্বেষণই তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল এবং সর্বদা সুধীজনের সঙ্গ কামনা করতেন। তাঁর বৈঠকখানায় যে সব বিদগ্ধ পণ্ডিত নিয়মিত আসন গ্রহণ করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক পিট-রিভার্স—ইংলন্ডে যাঁকে বৈজ্ঞানিক পুরাতত্ত্ব চর্চার জনক বলে সম্মানিত করা হয়। ছোট থেকে এই পরিবেশে লালিত ও বর্ধিত হচ্ছিলেন বালক আর্থার। পিতার প্রভাবেই তিনি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে আকৃষ্ট হন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথুরে হাতিয়ার সংগ্রহ করা তাঁর ছোটবেলার 'হবি'—এবং এই উদ্দেশ্যে বাবার সঙ্গে তিনি ফ্রান্স ও ইংলন্ডে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ছাত্র হিসাবে তাঁর মেধার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল, হ্যারোতে, তারপর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে—যেখান থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণী নিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন তিনি। তারপর আর্থার কিছুকাল জার্মানির গটিংগেনে পুরাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের পাঠ নেন এবং সেখানেও সমান কৃতিত্বের পরিচয় দেন।



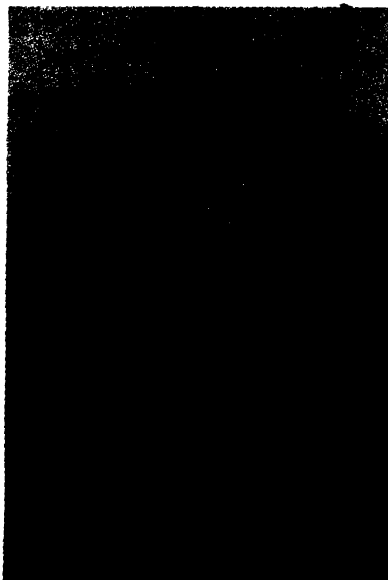


নসাস প্রাসাদে প্রাপ্ত দুটি শিলমোহর

কর্মজীবনের প্রথম দিকটাতে নানা বাধাবিপত্তি আসে। তিনবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কারণ অবশ্য যোগ্যতার অভাব নয়, তাঁর রাজনীতি। তিনি ছাত্রাবস্থায় গ্ল্যাডেস্টৌনপন্থী ছিলেন এবং সেই হিসাবে সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতির কঠোর সমালোচনা করতেন। অক্সফোর্ডের রক্ষণশীল কর্মকর্তারা এজন্য তাঁকে পছন্দ করতেন না। তবে এসব বাধাবিপত্তি কেটে গেল এবং ১৮৮৪ সালে তিনি অক্সফোর্ডের অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ামের 'কিপার' নিযুক্ত হলেন। তারপর ক্রীটের খননকার্য তাঁর জীবনে আশাতীত সাফল্য এনে দেয়। কর্মকর্তারা আর তাঁর দাবিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি—১৯০৯ সালে প্রত্নবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকের পদটি গ্রহণ করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানানো হয়।

ট্রয় আবিষ্কারক স্লীম্যানের অসমাপ্ত কাজটি হাতে তুলে নেন আর্থার এভান্স। একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার উপলক্ষে গ্রিসে তাঁর প্রথম আগমন। ইচ্ছা ছিল, যত শীঘ্র পারেন কাজটি সেরে তিনি অক্সফোর্ডে ফিরে আসবেন। কিন্তু অত শীঘ্র গ্রিসের মায়া কাটিয়ে স্বদেশে ফেরা তাঁর ভাগ্যে ছিল না। পরবর্তী সুদীর্ঘ পঁচিশটি বছর তিনি গ্রিসের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারের আশায় খননকার্য চালিয়ে গেলেন এবং পরিশেষে হয়ত তাঁর জ্ঞানপিপাসা মেটেনি। এথেন্সের এক কিউরিও বিক্রেতার কাছে অদ্ভুত চিত্রাঙ্কিত কয়েকটি শিলমোহর দেখে তিনি ভাবলেন, সুবিন্যস্ত ও পরিচ্ছন্ন চিহ্নগুলির মধ্যে হয়ত কোন অজ্ঞাত লিপির বর্ণমালা আত্মগোপন করে আছে। তারপর চলল তাঁর অক্লান্ত অনুসন্ধান। বহুজনকে জিজ্ঞাসা করেও যখন এই শিলমোহরগুলির উৎপত্তিস্থান জানতে পারা গেল না, ঘুরতে ঘুরতে তখন তিনি ক্রীট দ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন। নানা কারণে তাঁর মনে হয়েছিল এই দ্বীপটিতে অতীতে কোন সুসভ্য জাতির বাস ছিল। ক্রীট দ্বীপ সে সময়ে তুরস্ক সরকারের অধীনে। তুর্কীরা কোনদিনই বৈজ্ঞানিক গবেষকদের সুনজরে দেখত না। তাই পদে পদে এভান্সকে বাধা পেতে হল। কিন্তু কিছুতেই নিরুৎসাহ হননি তিনি। সুযোগ্য সহচর জন মায়ার্স-কে সঙ্গে নিয়ে তিনি সমগ্র দ্বীপটি পদব্রজে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলেন। অবশেষে তাঁর দুঃসাহসিক অভিযান সফল হল। যে শিলমোহর তিনি খুঁজছিলেন, ক্রীটের গ্রামবাসী অনেক কৃষক রমণীর কাছে তার সন্ধান পাওয়া গেল। এগুলি গ্রামের মেয়েরা তাবিজ বা মাদুলির মত অঙ্গে ধারণ করে। এভান্সের সন্দেহ রইল না, ক্রীটের কোন অজ্ঞাত লিপির সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাবে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এই দ্বীপটি ইংরেজ অধিকারভুক্ত হয় এবং সেই বছর নসাস নামক স্থানে খনন শুরু করে দেন আর্থার এভান্স। মাত্র এক সপ্তাহ কাজ চলার পরই এভান্স প্রাচীন উপকথায় বর্ণিত রাজা মিনসের প্রাসাদটির সন্ধান পান। এটি এ যুগের এক বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। গ্রিক উপকথায় জানা যায় যে, রাজা মিনস্ দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে ক্রীটে রাজত্ব করতেন। সমুদ্রবক্ষে তাঁর ছিল অপ্রতিহত প্রাধান্য। প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াদিতে অংশগ্রহণ করার

জন্য মিনস্ তাঁর ছেলেকে গ্রিসে পাঠিয়েছিলেন। সুপুরুষ ও বীর এই রাজপুত্র প্রতিটি খেলায় বিজয়ী হয়ে গ্রিকদের বিরাগভাজন হন। পরে ঈর্ষান্ধ গ্রিকরা তাঁকে হত্যা করে। এই সংবাদ ক্রীটে পৌঁছনো মাত্র পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মিনস্ গ্রিস আক্রমণ করলেন। শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল গ্রিকরা। প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছায় তিনি পরাজিত গ্রিকদের উপর এক চরম শর্ত চাপিয়ে দিলেন। ঠিক হল, প্রতি ন'বছর অন্তর গ্রিকরা তাদের সাতজন শ্রেষ্ঠ বীর যুবক ও সাতটি রূপসী তরুণীকে ক্রীটে পাঠাবে। রাজপ্রাসাদের দুর্গম গোলকধাঁধার আবর্তে মিনোটর নামক যে নরমাংসাসী রাক্ষসকে লুকিয়ে রেখেছিলেন রাজা মিনস্—গ্রিক তরুণ-তরুণীরা তারই বলি হবে। এই ব্যবস্থা বেশ কিছু কাল চলার পর একবার অন্যান্য তরুণ-তরুণীর সঙ্গে ক্রীটে এলেন রাজপুত্র থীসিয়াস। মিনসের কন্যা অ্যারিয়াডনি তাঁকে দেখামাত্র ভালবেসে ফেলেন। এই রাজকন্যার কাছ থেকে থীসিয়াস রাক্ষস বধের জন্য মন্ত্রপূত এক শাণিত তরবারি লাভ করেন। শুধু তাই নয়, রাক্ষস মিনোটরকে বধ করে তিনি যাতে সেই গোলকধাঁধা থেকে ঠিকমত বেরিয়ে আসতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে একগাছি সুতোও পেলেন—যার একপ্রান্ত ধরা রইল অ্যারিয়াডনির হাতে। বীর থীসিয়াস মিনোটরকে হত্যা করে সেই সুতো ধরে যথাসময়ে

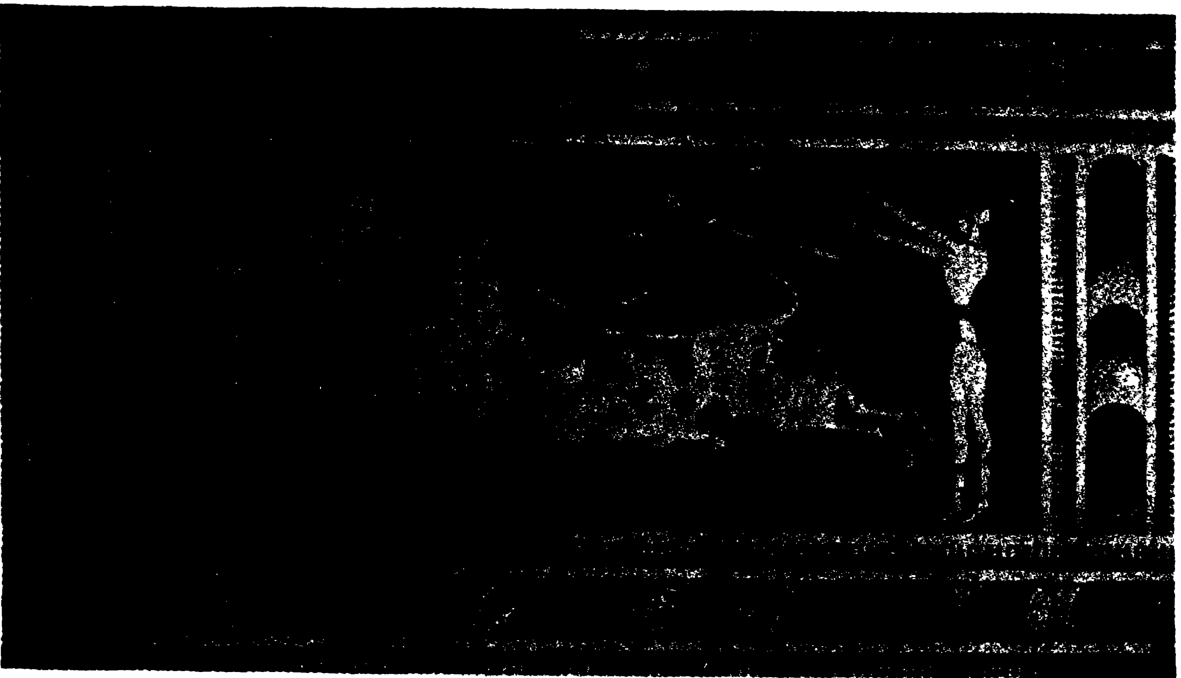


*নসাস প্রাসাদে প্রাপ্ত নারীমূর্তি*

দুর্গম আবর্তের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর রাজকন্যাকে বিবাহ করে বিজয়ী বীর ফিরে গেলেন গ্রিসে। রূপকথার খোলস ছাড়ালে এই উপাখ্যান থেকে দুটি তথ্য বেরিয়ে আসে। প্রথমত, সুদূর অতীতে একটি সামুদ্রিক-শক্তি গ্রিস আক্রমণ করে এথেন্স বিধ্বস্ত করেছিল। দ্বিতীয়ত, মিনস ছিলেন ক্রুর প্রকৃতির ব্যক্তি—নিষ্ঠুর ও নৃশংস। এভান্স মাটি খুঁড়ে সমস্ত প্রাসাদটি উদ্ধার করেছিলেন—সেই সাড়ে পাঁচ একর জমির ওপর এর ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো ছিল। প্রাসাদের প্রশস্ত অলিন্দ, বিরাট বিরাট প্রকোষ্ঠ ও অসংখ্য সিঁড়ির ধাপ রাজা মিনসের ঐশ্বর্য ও বৈভবের পরিচয় বহন করছে। এভান্স অনুমান করেছেন, নসাস্ শহরটিতে ন্যূনপক্ষে লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল।

নসাসের রাজপ্রাসাদটি শিল্পীদের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। হলঘরের বড় বড় দেয়ালে নানা ধরনের ফ্রেসকো আঁকা—দেয়ালগাত্রে একাধিক বৃষমূর্তি প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর পূর্বে মাইকেনীতে প্রাপ্ত এক শবাধারে রৌপ্য নির্মিত এক বৃষমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। ক্রীটের ছবিগুলি প্রাণবন্ত। প্রচণ্ড বেগে ধাবমান এক বৃষের শিং ধরে এক কৃস্তিগীর যুবক ডিগবাজি খেয়ে তার পিঠে পড়ছে—তারপর আবার লাফিয়ে মাটিতে নামছে এবং তাকে ধরে নেবার জন্য অদূরে অপেক্ষা করছে এক সুন্দরী ললনা। সার্কাসে দেখা যায়, খেলোয়াড় একলাফে ছুটন্ত ঘোড়ার উপর উঠল—তারপর ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়ল। কিন্তু ক্রীটের খেলাটি আরও সহস্রগুণ বিপজ্জনক। এ ধরনের দৃশ্য প্রাসাদের অনেক স্থানে দেখে এভান্সের মনে প্রশ্ন জাগে, এই চিত্রগুলি কোন বিশেষ অর্থ বহন করছে না তো? মিনোটরের উপাখ্যান স্মরণ করে তিনি ভাবলেন, ছবিতে যে তরুণ-তরুণীকে দেখা যাচ্ছে তারা কি বৃষ রাক্ষসের বলি হবার জন্য প্রেরিত? তাছাড়া বৃষের শিং ধরে ডিগবাজি দেবার বিপজ্জনক খেলাটি প্রাচীন পূজা উপচারের কোন অঙ্গ নয় তো! আর একটি চিত্র বিশেষভাবে এভান্সকে মুগ্ধ করেছিল। সেটি হচ্ছে ব্রোঞ্জ-নির্মিত এক নারীমূর্তি। অলঙ্কার-ভূষিতা, সুবেশা এই নারী কিন্তু অনাবৃতবক্ষা। এভান্স কল্পনা করেছেন, মাতৃরূপা এই দেবীমূর্তি গ্রিক দেবী রিয়ার সঙ্গে তুলনীয়। মিনোয়ানদের জগন্মাতার প্রতিকৃতি। পরবর্তীকালে এই দেবীমূর্তির সঙ্গে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছিল—যেমন দেবীর দুই হাতে একছড়া মালার মত জড়ানো থাকত দুটি বিষধর সর্প।

এভান্স কয়েকটি সুস্পষ্ট অধ্যায়ে ক্রীটের পুরাতত্ত্বকে ভাগ করেছেন। আনুমানিক ৪০০০—৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিনোয়ানদের পূর্বপুরুষেরা এশিয়ার কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে এই দ্বীপে আগমন করেন। মিনোয়ান সভ্যতার আদি পর্বের (৩০০০—২০০০ খ্রিঃ পূঃ) এই দ্বীপের জনসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়—সেই সঙ্গে অনেক শহরের পত্তন হয়। এই যুগের লোকেরা ধাতুর ব্যবহার না জানলেও মৃৎশিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিল। ক্রীটের মধ্য যুগকেই (২০০০—১৬০০ খ্রিঃ পূঃ) মিনোয়ান সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা চলে। এই সময় অধিবাসীরা সুখী ও সচ্ছল জীবন যাপন করত।



নসাস প্রাসাদে প্রাপ্ত ফ্রেস্কো—যেখানে বীর থিসিয়াস ও মিনোটারকে দেখা যাচ্ছে

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাদের সৌন্দর্যানুভূতি যা তাদের নিরন্তর বিভিন্ন শিল্পকর্মে প্রেরণা যোগাত। এ যুগে তারা ধাতুশিল্পে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। কয়েকটি নয়নাভিরাম ব্রোঞ্জ-মূর্তি এ যুগের মানুষের সূক্ষ্ম শিল্প-চাতুর্য ও কলাকৃতির পরিচয় দিচ্ছে। এই যুগে ক্রীট বিশ্ববিশ্রুত এক সামুদ্রিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তার নৌবহর একদিকে যেমন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল—অন্যদিকে আবার তার বাণিজ্য পোতগুলি শান্তি ও সমৃদ্ধির বার্তা বহন করে দেশ থেকে দেশান্তরে গমনাগমন করত। মিনোয়ান সভ্যতার শেষ অধ্যায়ে (১৬০০—১২০০ খ্রিঃ পূঃ) ক্রীট ঐশ্বর্যের চরম শিখরে উঠেছিল—কিন্তু বেশিদিন এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যে বিপর্যয়ের কালো মেঘ সমস্ত দ্বীপটিকে গ্রাস করে ফেলে। বিপর্যয়ের আসল কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। নসাস, ফিয়াস্টস, হেগিয়া ট্রিয়াডা প্রভৃতি প্রাচীন শহরগুলির গভীর তলদেশে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অগ্নিদগ্ধ প্রচুর নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। তাছাড়া দেখা গেছে, একটি বিরাট আলোড়নে মাটির স্তরগুলি কেমন যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। এভান্স বলেন, এই সময়ে এক প্রবল ভূমিকম্পের ফলে সব ভেঙেচুরে নষ্ট হয়। ক্রীট দ্বীপটি আগ্নেয়গিরি-বলয়ের মধ্যে অবস্থিত—তাই সেখানে এ ধরনের প্রচণ্ড ভূমিকম্প ঘটতে পারে। কিন্তু এই যুক্তি তাঁর শিষ্য জন পেনডেলবেরী মেনে নেননি। তাঁর অনুমান, একিয়ান অথবা মাইকেনীয়ানরা ক্রীটের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি বিনষ্ট করতে এক তীব্র আক্রমণ চালায় এই দ্বীপের উপর। মিনোয়ানরা পরাস্ত হয় এবং আক্রমণকারীরা তাদের বড় বড় শহরগুলি অগ্নিতে ভস্মীভূত করে। ঠিক কিভাবে বিপর্যয় ঘটেছিল, এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা আজও সম্ভব হয়নি।

মিশরের স্থাপত্য-কীর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জলবায়ুর প্রভাবে কালজয়ী হতে পেরেছে। ক্রীটের জলীয় আবহাওয়ায় ঐতিহাসিক কীর্তি ভালভাবে সংরক্ষিত হতে পারেনি। তাছাড়া নসাসের রাজপ্রাসাদে প্রচুর পরিমাণে কাঠের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বৃষ্টিপাতের ফলে ও আর্দ্র আবহাওয়ায় কাঠের কড়ি-বরগাগুলি সহজেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়, প্রচুর অর্থব্যয়ে, দক্ষ কারিগর ও সুযোগ্য আর্কিটেকটের সাহায্যে প্রাসাদের ভগ্নাংশগুলি মেরামত করে জোড়াতালি দিয়ে একেবারে তার পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন স্যার আর্থার এভান্স। তাঁর ছিল প্রখর কল্পনাশক্তি। বিনা চশমায় তিনি কিছুই দেখতেন না—কিন্তু চোখ বন্ধ করলে মনের দৃষ্টি তাঁর অনেক দূর চলে যেত। চার হাজার বছর পূর্বেকার নসাসের প্রাসাদ কেমন দেখতে ছিল, তার কোনখানে কি ছিল, কারা এখানে বসবাস করত, এই সবই তিনি যেন পরিষ্কার দেখতে পেতেন। খুঁটিনাটি বিষয়ে সহকর্মীদের এত বিশদ ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন যে, তারা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হত। এভান্সের আর একটি

বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল না থেকে, সরকারের কাছে উপযাচক না হয়ে, একাই খনন কার্যের সব ব্যয়ভার বহন করেছেন। তিনি প্রভূত ধনী ছিলেন এবং প্রত্নগবেষণায় নিজস্ব অর্থেরই সদ্ব্যবহার করে গেছেন। সে আমলে ইংলন্ডের ধনী ব্যক্তিরা এ ধরনের প্রচেষ্টায় অর্থ ব্যয় করতে নিশ্চয়ই কার্পণ্য করতেন না এবং তাঁদের কাছে আবেদন করলে এভান্স নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় টাকা যোগাড় করতে পারতেন। কিন্তু সে চেষ্টা তিনি কোনদিনই করেননি—কারণ বাইরের কারও কাছে টাকা নিলেই তাঁর স্বাধীনতা খর্ব হত। তিনি সর্বদা মনে করতেন, নসাস তাঁর একক কীর্তি এবং সেইজন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, বাইরের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এখানে নাক গলাতে দেবেন না। এই আচরণের মধ্যে হয়ত তাঁর বড়লোকি মেজাজ ও ক্ষমতাপ্রিয়তাই পরিস্ফুট। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ক্ষমতা তাঁকে স্বৈরাচারী করেনি—বরং জ্ঞানদৃপ্ত শাসকের পদে উন্নীত করেছিল। তাঁর নিজের হাতে একক কর্তৃত্ব থাকার জন্যই ক্রীটের খননকার্য এত উচ্চমানের এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা এত নিখুঁত হয়েছিল।

এভান্সের জীবনের শেষ দিনগুলির উপর বিষাদের কালো ছায়া নেমেছিল। বার্ধক্যের জরা তাঁর শরীরকে আচ্ছন্ন করেছিল—দেহ হয়েছিল অপটু ও অসমর্থ। ক্রমশই তিনি যেন নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করছিলেন। পঞ্চাশ বছর পূর্বে, যৌবনের দীপ্ত মধ্যাহ্নে, তিনি তাঁর জীবনসহচরী মারগারেটকে হারান। তারপর তিনি আর দার-পরিগ্রহ করেননি। প্রত্নতত্ত্বের সাধনায় পুরোপুরি নিজেকে উৎসর্গ করে মনে অপার শান্তি পেয়েছিলেন, প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা ভুলেছিলেন সহকর্মীদের নিবিড় সান্নিধ্যে। কিন্তু একে একে প্রিয় বন্ধুরাও বিদায় নিলেন। বিদায় নিলেন হল সেইস্, ফ্রেডারিকো বুলভের এবং আরও অনেকে। 'প্যালেস অব মিনস' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের মুখবন্ধে এই সব পরলোকগত বন্ধুদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন এভান্স—তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রণাম। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটায় আকাশ সমাচ্ছন্ন হল। অশীতিপর বৃদ্ধ দেখলেন, কিভাবে তাঁর চোখের সামনেই ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত আস্তে আস্তে ধসে যাচ্ছে—অথচ এই সভ্যতা নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না। এই যুদ্ধে সমূলে উৎপাটিত হল সেইসব চিরন্তন মূল্যবোধগুলি—যেগুলির উপর এতকাল তাঁর গভীর আস্থা ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের উপর জার্মান বোমারু বিমান বোমাবর্ষণ করে গেল—ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখতে পরদিন সকালে সেখানে তিনি সশরীরে উপস্থিত হলেন। ১৯৪১ সালে একদিন বৈদেশিক দপ্তর তাঁকে খবর দিল, তাঁর সারাজীবনের স্বপ্ন ও সাধনার ক্ষেত্র ক্রীটে জার্মান ছত্রীবাহিনী অবতরণ করেছে এবং তাদের বাধা দিতে গিয়ে নসাসের কিউরেটার জন পেনডেলবেরি মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রিয় শিষ্যের এই অকালমৃত্যুতে

মনে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন এভান্স। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না; এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখন তাঁর বয়স নব্বই। তাঁর মৃত্যুর পর আরও খবর এল যে, জার্মান সৈনিকেরা এভান্সের সাধের বাড়ি 'ভিলা অ্যারিয়াড্‌নি' দখল করে নিয়েছে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের সামরিক মন্ত্রণালয়। জার্মানরা কিন্তু 'ভিলা অ্যারিয়াড্‌নি'র কোন ক্ষতি করেনি। নসাসের রাজপ্রাসাদ ও সংগ্রহশালা যেমন এভান্স রেখে গিয়েছিলেন, যুদ্ধের শেষেও ঠিক তেমনি ছিল। জার্মানদের এই মহানুভবতার কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

---

# ‘লিনিয়ার’ লিপি ও মাইকেল ভেন্ট্রিজ

ক্রীটে খননকার্য চালিয়ে স্যার আর্থার এভান্স প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে অসংখ্য লিপিমালার সন্ধান পেয়েছিলেন, সেগুলিকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথম শ্রেণীতে ছিল ছবি আঁকা সিল, যেগুলিকে দেখতে অনেকটা মিশরীয় চিত্রলেখের মত। দ্বিতীয় পর্যায়ের লিপিগুলির মধ্যে ছিল সাঙ্কেতিক চিহ্ন বিশিষ্ট মাটির চৌকো ট্যাবলেট—এভান্স যার নামকরণ করেন ‘লিনিয়ার এ’। এছাড়া নসাসের রাজপ্রাসাদের ছোট এক কুঠরির মধ্যে তিনি আরও তিন-চার হাজার মাটির ট্যাবলেট পান। এগুলিতে কতকগুলি চিহ্ন-সমষ্টি লক্ষ করা গেল এবং সমস্ত লাইনটি স্থানে স্থানে দাঁড়ি দিয়ে ভাগ করা আছে দেখা গেল। এ পর্যায়ের লিপিগুলির নাম দেওয়া হল ‘লিনিয়ার বি’। এভান্স হিসাব করে দেখেছিলেন, এতে প্রায় উননব্বইটি চিহ্নের ব্যবহার হয়েছে। এত অধিক সংখ্যায় পাওয়া গিয়েছিল বলেই প্রত্নতাত্ত্বিকদের মনে আশা হয়েছিল, হয়ত এই লিপির পাঠোদ্ধার একদিন-না-একদিন সম্ভব হবে।

কোন অজ্ঞাত লিপির পাঠোদ্ধারকালে প্রত্নবিদ তিনটি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। প্রথমত ধরা যাক এমন লিপি—যার ভাষা আংশিকভাবে জানা, কিন্তু বর্ণমালা অজ্ঞাত। যেমন কিউনিফর্ম লিপি। জার্মান পণ্ডিত গ্রটেফেন্ড যখন কিউনিফর্মের রহস্য ভেদ করেন তখন দেখা গেল, এর ভাষা প্রাচীন পারস্য দেশীয় ভাষা—যা একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু বর্ণমালা আদৌ জানা না থাকায় পাঠোদ্ধার হচ্ছিল না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এমন লিপি প্রত্নতাত্ত্বিকের হাতে আসে, যার বর্ণমালা সহজেই চেনা যায়, অথচ ভাষা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। যেমন ইটরাস্কান লিপি। এর হরফগুলি গ্রিক—কিন্তু ভাষা জানা না থাকায় অর্থোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। তৃতীয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিল সমস্যার উদয় হয় সেইখানেই, যেখানে ভাষা ও বর্ণমালা দুই থাকে অজ্ঞাত। বিস্মৃত বর্ণমালা ও ততোধিক দুর্বোধ্য ভাষার গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে হয় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাবিদদের। কিন্তু ঐ রহস্যাবৃত লিপির যদি অন্যভাষায় অনূদিত কোন প্রতিলিপি থাকত—তাহলে হয়ত পাঠোদ্ধার সহজে হতে পারত। এক্ষেত্রে মিশরের বিখ্যাত রসেটা স্টোন স্মরণীয়। নীলনদের ব-দ্বীপে প্রাপ্ত এই চিত্রলেখটির সঙ্গে যদি একটি গ্রিক ভাষা না থাকত তাহলে মিশরীয় হায়রোগ্লিফিক লিপির রহস্যোদ্‌ঘাটন হত কিনা সন্দেহ। ক্রীটের ‘লিনীয়ার বি’ বা ভারতের মহেঞ্জদরো লিপি এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

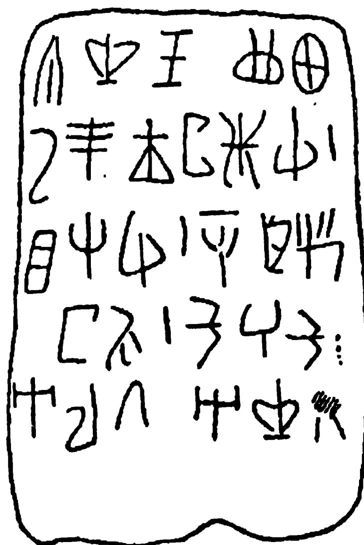
ক্রীটে মিনোয়ান বা লিনিয়ার লিপির আবিষ্কারক স্যার আর্থার এভান্স তাঁর ‘স্ক্রিপটা মিনোয়া’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করেন। এতে কেবলমাত্র চিত্রলেখের পরিচয়

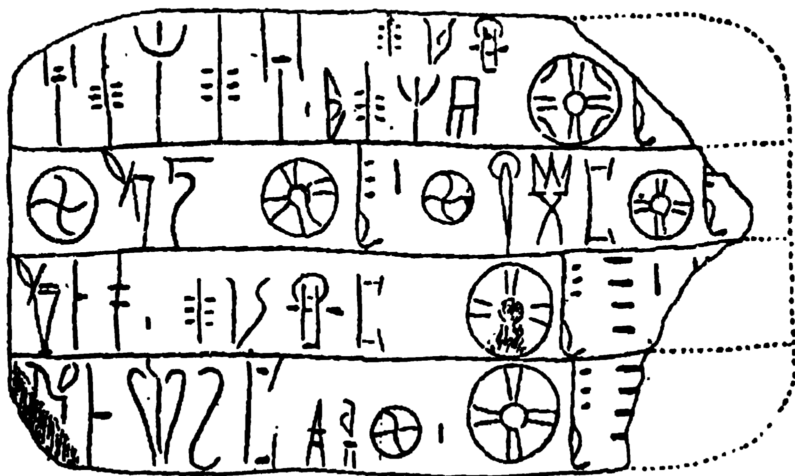
ছিল, অপর দুই লিপি সম্পর্কে কোন আলোচনা করেন নি লেখক। ছাব্বিশ বছর পর ১৯৩৫-এ তিনি লিনিয়ার লিপির চিত্র সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরলেন। এই সুদীর্ঘকাল নীরব থাকার জন্য স্যার আর্থার সুধীসমাজে নিন্দিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পর তাঁর সুযোগ্য সহচর স্যার জন মায়ার্স 'স্ক্রিপটা মিনোয়ান' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করেন (১৯৫১)—এতে ক্রীটের লিনিয়ার লিপিগুলির বিশদ বিবরণ পাওয়া গেল। এভান্স ক্রীটের প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করেননি। কিন্তু তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় এমন কতকগুলি মত জারি করেছিলেন যা তাঁর শিষ্যরা আপ্তবাক্য বলে মেনে নিলেও, বিদ্বৎসমাজে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি। এভান্সের স্থির বিশ্বাস ছিল, ক্রীটের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রিক সম্পর্ক শূন্য। তাই তিনি ক্রীটের লিপির মূল খুঁজতে চেষ্টা করতেন সাইপ্রাস দ্বীপের প্রাচীন ভাষার মধ্যে। কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে অধিকাংশ গবেষকই এমন এক গোলকধাঁধার আবর্তে গিয়ে পড়েন যার থেকে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না।

১৯৩৬ সালে লন্ডনের বার্লিংটন হাউসে প্রত্নতত্ত্বের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে স্যার আর্থার মিনোয়ান লিপি সম্পর্কে এক ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেদিনকার সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ছাত্র মাইকেল ভেন্ট্রিজ। অখণ্ড মনোযোগ সহকারে ক্ল্যাসিকসের এই ছাত্রটি সেদিন প্রত্নতাত্ত্বিকের বক্তৃতা শুনছিলেন। প্রাচীন সভ্যতার বিস্মৃত অধ্যায়গুলি তাঁর মানসপটে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছিল। স্বপ্নাবিষ্ট মন নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। সেইদিনই তাঁর মনে নিহিত হল এক বিরাট সম্ভাবনার বীজ। সাত বছর বয়সে হোমারের মহাকাব্য হাতে পেয়ে স্লীম্যান যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন, বড় হয়ে তিনি ট্রয়নগরী আবিষ্কার করবেন, ভেন্ট্রিজও তেমনি সঙ্কল্প করেছিলেন বড় হয়ে তিনি মিনোয়ান লিপির রহস্যোদ্‌ঘাটন করবেন।

সুখী ও সচ্ছল এক পরিবারে মাইকেল ভেন্ট্রিজের জন্ম। বাবা ছিলেন ভারতীয় সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী, মা ছিলেন বিদুষী পোলিশ মহিলা। মায়ের প্রভাব মাইকেলের জীবনে বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল এবং তাঁর কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন শিল্পীসুলভ সূক্ষ্ম রসবোধ এবং সজীব একটি মন। গৃহশিক্ষা সমাপনান্তে তাঁকে বিদেশে সুইজারল্যান্ডের এক বিদ্যায়তনে পাঠানো হয়েছিল। এখানে অবস্থানকালে তিনি ফরাসি ও জার্মান ভাষা ভাল করে শিখে ফেলেন। পোলিশ ও সুইডিশ ভাষাতেও তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন। ইংলন্ডে ফিরে তিনি সামান্য গ্রিক শিখেছিলেন—পরবর্তীকালে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে নিজের এই কৃতিত্বের কথা উচ্চারণ করতে শোনা গিয়েছিল। ভাবী কালের শ্রেষ্ঠ প্রত্নগবেষক কিন্তু কোন কালেই অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে ইতিহাস বা ক্লাসিক্স চর্চায় নিজেকে উৎসর্গ করেননি। নিয়তি তাঁকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। জীবনের লক্ষ্য হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন স্থাপত্যশিল্পকে। লন্ডনে অবস্থিত স্থাপত্য চর্চার প্রধান কেন্দ্রে তিনি ভর্তি হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং সাময়িকভাবে পড়াশুনো বন্ধ রেখে দেশের কাজে নামতে তিনি বাধ্য হলেন। তিনি রয়াল

এয়ার ফোর্সে যোগ দিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর সহকর্মী জন চ্যাডুইকও এই সময়ে নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধশেষে দু'জনেই আবার ফিরে এলেন তাঁদের পূর্বতন কাজে—ভেন্ট্রিজ স্থাপত্যশিল্প কেন্দ্রে এবং চ্যাডুইক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৮ সালে সম্মানের সঙ্গে স্থাপত্যের ডিগ্রি নিয়ে পাশ করে বেরোলেন মাইকেল ভেন্ট্রিজ। কিন্তু যিনি নামকরা স্থপতি হিসাবে বিশ্ববরেণ্য হতে পারতেন, তিনি তাঁর অক্ষয় কীর্তি রেখে গেলেন সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে। যে কৌতূহল বাল্যকাল থেকে তাঁর মনে সঞ্চিত হচ্ছিল, সেই কৌতূহলই তাঁকে টেনে নিয়ে চলল মিনোয়ান লিপি পাঠোদ্ধারের দুঃসাহসী প্রচেষ্টার পথে। মিনোয়ান লিপি সম্পর্কে প্রতি বছর যে সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হত—তার সব খবরই রাখতেন তিনি। কোন্ পণ্ডিতের কি মত, নতুন কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হল কিনা, গবেষকরা নতুন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন কিনা—এসবই ছিল তাঁর নখদর্পণে। ১৯৪০ সালে তিনি আমেরিকার এক নামকরা পত্রিকায় মিনোয়ান লিপির উপর এক প্রবন্ধ লিখে পাঠান। সম্পাদকমণ্ডলীর কেউ এযাবৎ মাইকেল ভেন্ট্রিজের নাম শোনেননি—তবু প্রবন্ধটি তাঁরা ছাপলেন, কারণ এতে দু-একটি নতুন কথা ছিল। মাইকেলের বয়স তখন মাত্র আঠারো এবং প্রবন্ধটি পাঠাবার সময় তিনি বয়সটি গোপন রেখেছিলেন। মিনোয়ান লিপির রহস্যোদ্‌ঘাটনে এটিই তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা। আরও পরে ১৯৫০ সালে তিনি একটি বিস্তারিত প্রশ্নমালা তৈরি করেন এবং সেটি সবসুদ্ধ বারোজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে পাঠিয়ে দেন, তাঁদের উত্তর ও মতামত জানার আশায়। ভেন্ট্রিজের মনে মিনোয়ান লিপি সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন ও সমস্যার উদয় হয়েছিল সবই এই প্রশ্ন-তালিকায় স্থান পেল। দশজন পণ্ডিতের কাছ থেকে উত্তর এলো। সেগুলি আবার প্রয়োজন-মত অনুবাদ করিয়ে এবং নিজস্ব ব্যয়ে ছাপিয়ে তিনি অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে বিলি করেন। গবেষণা ক্ষেত্রে ভেন্ট্রিজ কতখানি আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন, এটি তারই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। মিনোয়ান লিপির প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে কি বিরাট মতভেদ ছিল, তা এই প্রশ্নোত্তরগুলি থেকে সবিশেষ জানা যায়। ভেন্ট্রিজের এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে গত পঞ্চাশ বছর মিনোয়ান লিপি সম্বন্ধে যে গবেষণা হয়েছিল তার একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেল। এই বছরই নিজস্ব মতামতসহ তিনি প্রশ্নোত্তরগুলি একটি পুস্তিকায় প্রকাশ করেন—যার নাম দেওয়া হল 'মিড্ সেঞ্চুরি রিপোর্ট'; লিনিয়ার বি-র চিহ্নগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাজিয়ে, ধীর পর্যবেক্ষণ-দ্বারা তার মধ্যে ভাষার কোন প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এই সময় সরকারি চাকরি গ্রহণ করাতে তাঁর অবসর সময় অল্পই ছিল। রিপোর্টের শেষাংশে তাই আক্ষেপ করে তিনি লিখেছিলেন যে, এই দুরূহ গবেষণা কাজে নিজস্বভাবে তাঁর আর কিছুই দেবার নেই—কেননা জীবিকার্জনের নিমিত্ত তাঁকে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি যে পথের সন্ধান পেয়েছেন, সে পথে অগ্রসর হলে সফলতা অনিবার্য। কিন্তু মুখে যাই বলুন না কেন, ভেন্ট্রিজ মিনোয়ান





লিনিয়ার বি লিপি

লিপির গবেষণা থেকে নিজেকে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। যিনি একবার পাথরের প্রেমে পড়েছেন তাঁর আর সহজে মুক্তি নেই। সমস্ত কাজকর্ম সেরে তাই ভেন্ট্রিজ ফিরে আসতেন তাঁর নিজস্ব জগৎ—প্রত্নতত্ত্বের যাদুপুরীতে। সেখানে চলত তাঁর অক্লান্ত গবেষণা। যে কাজে তাঁর এত উৎসাহ, এত আনন্দ, সে কাজে তাঁর ক্লান্তি বা অবসাদ কোথায়? দু'বছর পর তাঁর কাজের নমুনা পাওয়া গেল ১৭৬ পাতার এক 'ওয়ার্ক নোটস্'-এ। এটিও তিনি নিজস্ব ব্যয়ে ছাপিয়ে সহযোগী বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করলেন। সকলেই জানলেন, কিভাবে ভেন্ট্রিজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন এক সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের দিকে। কোন কিছু গোপন করেননি তিনি। ওয়ার্ক নোটস-এর পাতায় তার ভাল-মন্দ, দোষত্রুটি সবই দেখিয়ে দিলেন। যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর দৃঢ় মতামতের মধ্যে কাল্পনিক বা মনগড়া কোন তথ্যের স্থান ছিল না। এভান্স মিনোয়ান লিপি সম্পর্কে রায় দিয়েছিলেন : এগুলি গ্রিক-সম্পর্ক-শূন্য এবং তাঁর মতই এতকাল বিনা বাক্যব্যয়ে অনেকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এতদিন পর এভান্সের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভেন্ট্রিজ জোর গলায় ঘোষণা করলেন, 'লিনিয়ার বি'-র ভাষা গ্রিক—যদিও তার ধরনটি খুবই প্রাচীন। ক্রমশই ভেন্ট্রিজ একটি বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, সেটি হচ্ছে প্রাচী গ্রিক ভাষা ও উপ-ভাষাদি সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা। এখন থেকে তিনি গ্রিক ভাষাবিদ একজন পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞের সাহায্যের উপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এ বিষয়ে স্যার জন মায়ার্স তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। কেম্ব্রিজের তরুণ অধ্যাপক ভাষাতত্ত্ববিদ্ জন চ্যাডুইকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। ইনি ক্ল্যাসিক্সে সুপণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং কিছুকাল পূর্বে অক্সফোর্ড ল্যাটিন অভিধান সম্পাদনা-কাজে জড়িত ছিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধ মায়ার্সের প্রচেষ্টায় দুটি নবীন প্রাণ মিলিত হল এক কঠিন সাধনায়। শুরু হল ভেন্ট্রিজ-চ্যাডুইক-এর বিস্ময়কর সহযোগিতা বা যৌথ তপস্যা—যার ফলে তিন হাজার বছরের সুষুপ্তি কাটিয়ে মিনোয়ান লিপি সরবে আত্মপরিচয় ঘোষণা করল—সুস্পষ্ট গ্রিক ভাষায়। ভেন্ট্রিজ ও চ্যাডুইক মিনোয়ান লিপির গ্রিক-উৎপত্তি সম্পর্কে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করেন, সেগুলি তাঁদের এক নিবন্ধে প্রকাশিত হল। এর নাম দেওয়া হয়েছে, 'এভিডেন্স'। কিন্তু সাফল্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বিদ্বৎসমাজের স্বীকৃতি পাওয়াও সহজ হয়নি। ইংলন্ড ও সুইডেনে কিছু সংখ্যক পণ্ডিত তাঁদের মতকে স্বীকার করে নিলেও, প্রকাশ্যে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এমন লোকের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। কিন্তু ১৯৫৩ সালে আমেরিকান প্রত্নবিদ কার্ল ব্লেগেনের আবিষ্কার সব সন্দেহের নিরসন করল। ইনি মাইকেনির অন্তর্গত পাইলসে খননকার্য চালিয়ে অসংখ্য 'লিনিয়ার বি' ট্যাবলেটের সন্ধান পান। এগুলির মধ্যে এমন একটি নিদর্শন ছিল যেটি ভেন্ট্রিজ পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি নিজেই পড়ে ফেলতে পারলেন। "লিনিয়ার বি"-র রহস্যভেদ হয়েছে, এ সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না। উল্লসিত চিত্তে তিনি ভেন্ট্রিজ ও চ্যাডুইককে অভিনন্দন জানালেন। এবার অবিশ্বাসীর দলকে হার মানতে হল।

খ্যাতির দরজা খুলে গেল—সেই সঙ্গে সৌভাগ্যেরও। স্বদেশে-বিদেশে বহু স্থানে বিদ্বৎমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা দিয়ে নিজেদের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন তরুণ গবেষকদ্বয়। ২৪ জুন ১৯৫৩ সালে ভেন্ট্রিজ লন্ডনে তাঁর ভাষণ দেন। পরের দিন "টাইমস্" পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঠিক ঐদিনই এভারেস্ট-বিজয় সম্বন্ধে একটি খবর সংবাদপত্রের অপর স্তম্ভে ছাপা হয়েছিল। একই পৃষ্ঠায় পাশাপাশি দুই শীর্ষে দুটি আবিষ্কার-কাহিনী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হয়ত এমন নাটকীয়ভাবে সংবাদ দুটি পরিবেশন করার মধ্যে কোন গূঢ় অর্থ ছিল না। তবু দেখা গেল কিছুকালের মধ্যে সাংবাদিকরা 'লিনিয়ার বি'-র পাঠোদ্ধার-কাহিনীকে 'দ্য এভারেস্ট অব গ্রিক আর্কিওলজি' বলে বর্ণনা করছেন।

প্রাচীন গ্রিক কবি গেয়েছেন, ঈশ্বর যাদের ভালবাসেন, তাদের তিনি তাড়াতাড়ি নিজ স্নেহময় কোলে টেনে নেন। ভেন্ট্রিজ সম্পর্কে কথাটি অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গেল। ১৯৫৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এক রাত্রে তিনি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। লন্ডনের অদূরে হ্যাট্‌ফিলডের কাছে তাঁর গাড়ির সঙ্গে এক ট্রাকের সংঘর্ষ লাগে এবং দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৪ বছর। গত শতাব্দীতে এইরকম কম বয়সেই দেহাবসান ঘটেছিল পৃথিবী-বিখ্যাত আর-এক প্রত্নতাত্ত্বিকের—তাঁর নাম জাঁ শাঁপলিয়ঁ, যিনি মিশরীয় চিত্রলেখের পাঠোদ্ধার করে অমর কীর্তি রেখে গেছেন।

ভেন্ট্রিজ এক অনন্যসাধারণ ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর মন এত দ্রুত কাজ করত যে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তাঁর নিজের পক্ষেও সহজ হত না সব সময়ে। কোন একটি নতুন সূত্র বা সম্ভাবনার ইঙ্গিত তাঁর কাছে উপস্থাপিত হলেই তড়িৎগতিতে তাঁর মন কাজ করে চলত এবং অতি অল্প সময়ে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সব দিক বিবেচনা করে প্রশ্নের সমাধানেও তিনি পৌঁছুতে পারতেন। ভেন্ট্রিজের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর সুশৃঙ্খল মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টি—যা অসংখ্য এলোমেলো ঘটনা ও হাজার-হাজার সাঙ্কেতিক চিহ্নের অরণ্যে পথ না হারিয়ে একটা প্যাটার্ন খুঁজে পেত। স্থাপত্যচর্চায় তিনি সম্ভবত এই শক্তি পুরোমাত্রায় অর্জন করেছিলেন এবং সেই শক্তিই তাঁকে 'লিনিয়ার বি'-র রহস্যোদ্‌ঘাটনে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে।

এই ট্যাবলেটগুলিতে মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য কতকগুলি অতি সাধারণ দ্রব্যোপকরণের তালিকা মাত্র পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কোন মহৎ সাহিত্য বা শিল্পকর্মের প্রেরণা নেই। যাঁরা ভেবেছিলেন এই আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের কোন অবলুপ্ত কীর্তির সন্ধান মিলবে, তাঁরা নিরাশ হয়েছেন। তবে এই আবিষ্কার যুগান্তকারী এই কারণে যে, হোমারের সাতশ' বছর পূর্বে গ্রিসে যে ভাষায় কথা বলা হত তার একটা রূপ অন্তত আমরা জানতে পেরেছি। আজ পর্যন্ত অতি প্রাচীন গ্রিক ভাষা ও উপভাষার যে নিদর্শন আমাদের হাতে এসেছে, তার মধ্যে লিনিয়ার বি-র লিপিমালা প্রাচীনতম।

---

# হিত্তীলেখমালার পাঠোদ্ধার-কাহিনী

পৃথিবীতে নিছক পূর্ব-প্রস্তুতি বা পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়াই যে কত বড় বড় আবিষ্কার সম্ভব হয়ে যায়, তার খোঁজ আমরা বড়-একটা রাখি না। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের ঘটনাটিই ধরা যাক। কলম্বস চেয়েছিলেন, ভারতে আসার পথ খুঁজে বার করবেন এবং তাই করতে গিয়ে শেষে একটা স্বতন্ত্র মহাদেশেরই সন্ধান পেয়ে গেলেন। প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে এমন একটা আবিষ্কারের কথা আমরা জানি : যার পিছনে কোন উদ্যোগ-আড়ম্বর বা প্রস্তুতি-পরিকল্পনা কিছুই ছিল না এবং প্রথমত একটি আকস্মিক ও অকিঞ্চিৎকর ঘটনার মধ্যে এর উৎপত্তি হলেও পরে জানা গেল যে, কয়েকটি হিজিবিজি আঁকা পাথরের টুকরো হাজার-হাজার বছরের ভুলে-যাওয়া এক জাতি সম্বন্ধে সহসা আমাদের সচেতন করে তুলেছে।

সুইশ পরিব্রাজক বুরখার্ড (১৭৮৪-১৮১৭) সিরিয়ার অন্তর্গত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হামা শহরের বাজারে ঘুরতে-ঘুরতে একদিন এক আশ্চর্য পাথরের সন্ধান পান। ঘিঞ্জি বস্তির এক জীর্ণ বাড়ির উঠোনে একটি বড় পাথর—তারই উপর অজ্ঞাতলিপিতে অনেক কিছু আঁকাজোঁকা। পুরাতত্ত্ব-প্রেমিক পরিব্রাজক এটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পাথরের উপর লেখাগুলি দেখতে অনেকটা মিশরীয় চিত্রলেখের মত হলেও ধরনটা যেন আলাদা। তাঁর কৌতূহল জাগল, আরও খোঁজখবর নেবেন—কিন্তু কার্যত বিশেষ কিছুই জানতে পারেননি। বুরখার্ড তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'ট্রাভেলস ইন সিরিয়া অ্যান্ড হোলিল্যান্ড'-এ এই পাথরটির খবর সংক্ষিপ্তভাবে লিখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর ষাট বছর পর হামা পাথরের খোঁজে সিরিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন দুই আমেরিকান প্রত্নবিদ্ জনসন ও যেশপ। হামা শহরের বাজারে পাথরটি ঠিক সেই জায়গাতেই তাঁরা পেলেন। আনন্দে ও উত্তেজনায় তাঁরা এমন ভাব দেখাতে লাগলেন, যেন সেই পরশপাথরটিরই সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন, যার স্পর্শে সব কিছু সোনা হয়ে যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা এ ধরনের আরও দুটি পাথরের সন্ধান যখন তাঁদের জানাল, তখন তাঁদের আনন্দ আর ধরে না। যখন তাঁরা নিশ্চিতচিত্তে শিলালিপির কপি নিতে শুরু করেছেন, তখনই ঘটল অঘটন। সাধারণ অধিবাসীরা তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে পাথরগুলিকে ঠাকুর-দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। এঁদের হাবভাব দেখে তারা আশঙ্কা করে বসল যে, বিধর্মীরা তাদের পবিত্র পীঠস্থানকে অপবিত্র করতে এসেছে। ক্রুদ্ধ অধিবাসীরা মারমুখী হয়ে উঠল এবং কোনক্রমে তাদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচলেন জনসন ও যেশপ। এই ঘটনার আরও কিছুকাল পর পুনরায় হামা পাথর উদ্ধারের চেষ্টা হয়। এবার সবরকম আটঘাট বেঁধে পথে নেমেছিলেন

আইরিশ মিশনারি রেভাঃ রাইট। তিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন দুই ক্ষমতাশালী বন্ধু—ডামাস্কাসের ইংরেজ কনসাল ও সিরিয়ার শাসক সুভাই পাশাকে। এঁদের উপস্থিতি তাঁকে সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করল। রাইট সাহেব হামা পাথরটি উদ্ধার করে কনস্টান্টিনোপল মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেন। অর্ধ-শতাব্দী ধরে 'হামা স্টোনের' বিষয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি এশিয়া মাইনর-এর অন্তর্গত আনাতোলিয়া প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসী, সুসভ্য হিত্তী জাতির কীর্তি—যাদের কথা মাত্র সেদিন আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে পেরেছি।

আনুমানিক চার সহস্র বছর পূর্বে মধ্য আনাতোলিয়ার সমতলভূমিতে হ্যালিস নদীর বাঁকে হিত্তীরা তাদের স্বাধীন শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলে। আংকারা শহরের নব্বই মাইল পূর্বে, বর্তমানের বোঘাজ কোই গ্রামে একদা তাদের রাজধানী হাট্টুসাস্ অবস্থিত ছিল। বোঘাজ কোই শব্দের অর্থ হল গভীর খাদের ধারে গ্রাম। হিত্তীরা যে এক অতি প্রাচীন জাতি, তার প্রমাণ আছে অনেক। বাইবেলে এদের বলা হয়েছে 'সনস অব হেথ্' আর মিশরীয়দের কাছে এদের দেশ 'ল্যান্ড অব খেতা' নামে পরিচিত ছিল। এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার উপর নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করে, এরা সে যুগের শ্রেষ্ঠ শক্তি—মিশর ও ব্যাবিলনিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়। রাজা সুবিলুলিমার আমলে (১৩৮০-১৩৪০ খ্রিঃ পূঃ) হিত্তীশক্তির চরম বিকাশ ঘটে এবং প্রায় সমস্ত পশ্চিম এশিয়া তাদের দখলে চলে আসে। প্রতিবেশী মিটান্নী রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে সুবিলুলিমা তার দর্পচূর্ণ করেন ; অরন্টিস উপত্যকার নগর রাষ্ট্রগুলিতে নিজের পছন্দমত রাজা নির্বাচিত করেন এবং ফিনিসীয়া ও লেবাননকে মিশরের প্রভাব থেকে মুক্ত করেন। এরপর মিশরের সঙ্গে হিত্তীদের সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠল। মিশরের প্রথম ও তৃতীয় থুটমোস পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করেন। কিন্তু সূর্যোপাসক ও ধর্মপ্রাণ ইখনাটনের পর মিশর এই প্রাধান্য হারাতে শুরু করে। টেল-এল-আমারনার পত্রাবলী থেকে এই পরাভবের কথা স্পষ্ট জানা যায়। বিখ্যাত ফ্যারাওদের মধ্যে প্রথম সেটি ও দ্বিতীয় রামেসিস হৃত শক্তি পুনরুদ্ধার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। রামেসিস কাদেশের যুদ্ধে জয়ী হয়েও কার্যত তেমন সুবিধা করতে পারেননি। হিত্তীদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তিনি সে দেশের এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং রাজনৈতিক কারণে সিরিয়ার উপর হিত্তী প্রভাবকে স্বীকার করে নেন। হিত্তীরা কিন্তু আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ধীরে ধীরে তারা পতনের দিকে এগিয়ে গেল। ১৩২০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের পর কোন হিত্তী শিলালিপি আমাদের হাতে আসেনি। সমসাময়িক দলিলের উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিকরা বলেন যে, হিত্তীদের উপর এই সময়ে এক চরম বিপর্যয় নেমে আসে। সম্ভবত ঈজিয়ান সাগরপথে আগত কোন সামুদ্রিক শক্তির আক্রমণে এদের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। ৭১৭ খ্রিঃ পূঃ অ্যাসিরিয়ান রাজা দ্বিতীয় সারগন যেদিন হিত্তীদের

পূর্বদিকের রাজধানী 'কারকেমিশ' দখল করে নেন—সেদিনই ইতিহাসের পাতা থেকে হিত্তীরা চিরবিদায় গ্রহণ করে।

হিত্তী লেখমালার পাঠোদ্ধার প্রচেষ্টায় যাঁরা সারা জীবন সাধনা করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে আর্চিবল্ড হেনরি সেইসের নাম করতে হয়। অনেকে ভুলক্রমে সেইসকে ইংরেজ বলে জানেন—কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন ওয়েলসের অধিবাসী। প্রাচ্যশাস্ত্র-বিশারদ ও বহুভাষাবিদ এই পণ্ডিত মাত্র দশ বছর বয়সে হোমার ও ভার্জিল পড়ে শেষ করেন। আঠারো বছর বয়সে তিনটি প্রধান প্রাচ্য ভাষা—হিব্রু, ফার্সি ও সংস্কৃত তিনি ভালভাবে শিখে ফেলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি নামকরা ছাত্র—পাশ করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি ৩০ বছর কাল অ্যাসিরীয় শাস্ত্রে প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ভ্রমণ করেন। ভ্রমণে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না। প্রত্নবস্তুর সন্ধানে তিনি মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়াতেন। দৈহিক কষ্টকে কোনদিন তিনি কষ্ট বলে স্বীকার করেননি—নজর দেননি নিজের বেশভূষার দিকে। তাঁকে বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র অবস্থায় দেখা যেত। কখন তিনি খালের ধারে এক-হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে হিব্রু অনুশাসনের কপি নিচ্ছেন, কখনও বা ধ্বসে-পড়া পড়ো বাড়ির আনাচে-কানাচে খুঁজে দেখছেন প্রত্ন-নিদর্শন কিছু পাওয়া যায় কিনা, কখনও বা দুস্তর মরুপথ একা হেঁটে পাড়ি দিচ্ছেন। চোখে চশমা, পিঠে ঝোলা, হাতে লাঠি এই 'স্কলার জিপসী'কে স্থানীয় অধিবাসীরা খুবই ভালবাসত।

১৮৬৩ সালে হ্যামবুর্গের পণ্ডিত ডাঃ মর্ডম্যান একটি রুপোর সিলমোহরের বিবরণ প্রকাশিত করেন। স্মারণা শহরের এক মুদ্রাবিশারদ তাঁকে এটির সন্ধান জানায়। শিলমোহরটির মধ্যস্থলে এক যোদ্ধামূর্তি এবং তার চারিপাশে বাণমুখ লিপি। যোদ্ধাটির বেশভূষা-চেহারা-ছবি বিচিত্র এবং এর কোন জুড়ি মধ্যপ্রাচ্যের আর কোন ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগ্রহ করা যায়নি। যোদ্ধাটি খর্বাকৃতি, কিন্তু দেহ বলিষ্ঠ ও মজবুত। গায়ে নকসাকাটা আঁটসাঁট জামা, পায়ে শুঁড়তোলা লম্বা জুতো, মাথায় শিরস্ত্রাণ ও হাতে বর্শা। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে সেইস যখন শিলমোহরের এই বিবরণ পাঠ করেন তখন কয়েক বছর আগেকার পুরাতন এক ঘটনা তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে যায়। সম্ভবত এই শিলমোহরটিই এক ব্যক্তি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বললেন, এ ধরনের নিদর্শন পূর্বে তাঁদের চোখে পড়েনি এবং তাঁদের ঘোরতর সন্দেহ যে নিদর্শনটি একটি জাল বস্তু। বিক্রেতাকে এঁরা ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু বুদ্ধি করে তাঁরা এর একটি ছাপ রেখে দিয়েছিলেন। এতদিন পর সেই ছাপটি ভালভাবে পরীক্ষা করে সেইস সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন সিলমোহরটি হিত্তীদের এবং যে কটি কথা এর চারিপাশে লেখা আছে তার অর্থ হল, 'টারকুমুয়া, মেরা রাজ্যের অধীশ্বর।' সেই অবধি শিলটির নাম হল—টারকুমুয়া শিল।

ইতিমধ্যে টেল-এল-আমারনার চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের ফলে হিত্তীদের সম্বন্ধে আরও

নতুন খবর জানা গেল। টেল-এল-আমারনা মিশরে অবস্থিত একটি আরব প্রধান গ্রাম। টেল কথাটির অর্থই হল ঢিবি এবং যেহেতু গ্রামটিতে অনেক ছোট বড় ঢিবি ছিল সেইজন্যই তার এমন অদ্ভুত নাম। এই গ্রামে একদিন এক কৃষক রমণী মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে অনেকগুলি পোড়া মাটির চাকতি আবিষ্কার করে ফেলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে খবর রটে গেল এক গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেছে। দলে দলে লোক ভিড় করে দেখতে এলো, কি সেই অদ্ভুত জিনিস যা মাটি থেকে উঠে এসেছে। কৌতূহলী জনতার উৎসাহ ঠেকিয়ে রাখা দায়। এদিকে কৃষক রমণীর মেজাজ গেল বিগড়ে—সে সদ্য মাটি থেকে তোলা টুকরোগুলি এলোপাথাড়ি ছুঁড়তে লাগল লোকদের তাড়াবার জন্য। কয়েকজন অনুনয় বিনয় করে মহিলাটিকে নিরস্ত করল এবং এদেরই একজন এই মাটির চাকতির কিছু নমুনা লুকসর শহরের এক কিউরিও ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে হাজির করল। দোকানদার জিনিসগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিছু বুঝতে না পেরে অবশেষে এগুলি পাঠাল পণ্ডিত বিশেষজ্ঞদের কাছে। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বললেন, মাটির চাকতির উপর বাণমুখলিপি খোদাই করা এবং যেহেতু এ ধরনের লিপি মিশর দেশে পাওয়া মোটেই সম্ভব নয়—তাই এগুলি সবই জাল। কিন্তু কেন জানি না তাঁরা পরে মত বদলালেন। কেউ কেউ বললেন, জিনিসগুলি আসল না নকল পরে ঠিক হবে, কিন্তু মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে যখন শোনা যাচ্ছে তখন একবার চোখে দেখলে মন্দ কি? প্রায় ৩৫০টি পোড়া মাটির চাকতি তাঁরা এইভাবে সংগ্রহ করেছিলেন। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার পর জানা গেল, এগুলি হচ্ছে ১৪০০ খ্রিঃ পূঃ কোন মিশরীয় রাজার বৈদেশিক দপ্তরে রক্ষিত অমূল্য দলিলের অংশবিশেষ। বেশিরভাগ দলিলই ব্যবিলনীয়ান কিউনিফর্মে লেখা। কিন্তু এগুলির মধ্যে এমন দুটি দলিল পাওয়া গেল যার হরফ পরিচিত, কিন্তু ভাষা একেবারেই অজ্ঞাত। এই দলিল দুটি আরাজোয়া লেটারস নামে খ্যাত। ১৯০২ সালে নরওয়েজিয়ান পণ্ডিত নুটজন এগুলির পাঠোদ্ধার করতে চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, এই দুটি অজ্ঞাত দলিলের মধ্যে একটি হচ্ছে রাজকীয় পত্র—যা কোন মিশরীয় ফ্যারাও এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত আরাজিয়োর রাজাকে লেখেন। তিনি আরও বলেন, অজ্ঞাত ভাষাটি প্রধানত ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

এশিয়া মাইনর ভ্রমণকালে সেইসের ধারণা হয়েছিল যে, আংকারা শহরের ৯০ মাইল পূর্বদিকে বোঘাজ কোই গ্রামে খননকার্য চালালে নিশ্চয়ই হিত্তী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নতুন মালমশলার সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি নিজের একক প্রচেষ্টায় কিছু করে উঠতে পারবেন না—এই ভেবে ট্রয় আবিষ্কারক প্রত্নবিদ হেনরিক স্লীম্যানকে এই খননকার্য গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন। স্লীম্যান তখন গ্রিক পুরাতত্ত্বের রহস্যে ডুবে আছেন—অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কাজেই সেইসকে একা অগ্রসর হতে হল। তুরস্ক সরকারের কাছে বোঘাজ কোই-এ কাজ শুরু করার অনুমতি

চাইলেন। কিন্তু খামখেয়ালি তুরস্ক সরকার তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর না করলেও, তাঁর জন্য একটি স্থান—কারকেমিশ, নির্দিষ্ট করে দিলেন। অন্যদিকে এক জার্মান অভিযাত্রী দলকে বোঘাজ কোই-এ খননকার্য চালাবার অনুমতি দেওয়া হল। ঈশ্বরের কি বিচিত্র বিধান! যিনি আজন্ম স্বপ্ন দেখলেন যে, বোঘাজ কোই-এর রুদ্ধ দরজা নিজের হাতে খুলে জগৎকে এক বিস্মৃত জাতির ইতিকথা শোনাবেন, তাঁকে চলে আসতে হল কারকেমিশে। আর জার্মান প্রত্নবিদ্, হুগো ভিঙ্ক্লের, যাঁর অত বাছবিচার ছিল না—ছিল না কোন বিশেষ স্থানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, তিনিই পেলেন বোঘাজ কোই। ভিঙ্ক্লের অতি ভাগ্যবান ব্যক্তি। খনন কাজ শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি হিত্তীদের রাজধানী হাট্টুসাসের সন্ধান পেয়ে গেলেন। সন্ধান পেলেন হিত্তীদের সবচেয়ে বড় মন্দিরটির—যার প্রাঙ্গণে নিত্য সমবেত হত হাজার হাজার দর্শনপ্রার্থী। কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে, দশ হাজার পোড়ামাটির ট্যাবলেট, যা এক সময়ে রাজ-দপ্তরে সযত্নে রক্ষিত থাকত। এগুলি সবই ছিল বাণমুখলিপিতে উৎকীর্ণ। ভিঙ্ক্লের দু'বার তুরস্কের এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান। প্রথমবার ১৯০৬-৭ এবং দ্বিতীয়বার ১৯১১-১২ সালে। দ্বিতীয়বার তিনি যখন বোঘাজ কোই-এ এসে উপস্থিত হন, তখন তিনি যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছেন—শরীরে তাঁর বার্ধক্য ও জরার ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু এই বয়সেও তিনি যে ধৈর্য, সাহস ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, সচরাচর তার তুলনা মেলে না। হিত্তী লেখমালা উদ্ধারকার্যে তাঁর বিরাট সাফল্য—তাঁকে প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে অমর করে রাখবে।

বোঘাজ কোই-এর ধ্বংসস্তূপ থেকে এমন কতকগুলি মাটির ট্যাবলেট পাওয়া গিয়েছিল যার ভাষা টেল-এল-আমারনায় প্রাপ্ত আরাজোয়া লেটারস-এর ভাষার মতই অজ্ঞাত। এটি যে হিত্তীদের নিজস্ব ভাষা সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ ছিল না। চেক পণ্ডিত বেডরিশ হ্রজনী (১৮৭৯-১৯৫২) এই অজ্ঞাত হিত্তী ভাষার পাঠোদ্ধার করে যশস্বী হয়েছেন। আসিরীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও কিউনিফর্মবিশারদ হ্রজনী ভিয়েনা ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি ভিয়েনা ও প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। বোঘাজ কোই লেখমালার মধ্যে তিনি এমন কোন পরিচিত রাজা-মহারাজার নাম খুঁজে পাননি যা তাঁকে আলোর সন্ধান দেবে। কিন্তু অজ্ঞাত ভাষার মাঝে মাঝে তিনি পরিচিত ভাষার বাক্যাংশ দেখে অবাক হয়েছিলেন। বাংলা গদ্যে যেমন সংস্কৃত উদ্ধৃতির ব্যবহার হয়ে থাকে, অথবা ইংরেজি গদ্যে ল্যাটিনের, তেমনি হিত্তী ভাষার দলিলেও কিছু ব্যবিলনীয় শব্দাংশের পরিচয় পাওয়া গেল—যেগুলি পাঠ করতে কোন অসুবিধা হল না। একদিন মনোযোগ সহকারে একটি হিত্তী মৃৎলেখের ভাষা পরীক্ষা করতে করতে হ্রজনীর মনে হল, এই অপরিচিত শব্দগুলি ক্রমশই যেন তাঁর কাছে অর্থবহ হয়ে উঠছে এবং অজ্ঞাত ভাষার অন্তরালে যেন একটি পরিচিত ভাষা উঁকি দিচ্ছে। যে লাইনটি তাঁকে হিত্তী ভাষার চাবিকাঠির সন্ধান জোগাল, সেটি এইরূপ—'নু

নিত্তা এন্ এজতানি, ভাদার মে একুতানি।" লিপিটিতে 'নিত্তা'-কথাটির জন্য যে প্রতীকের ব্যবহার হয়েছিল, তার অর্থ ব্রেড বা রুটি। 'এজতানি' কথার অর্থ খাওয়া—ইংরেজিতে টু ইট, এবং জার্মান ভাষায় এসেন। 'ভাদার' শব্দটি চেনা আরও সহজ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ ওয়াটার, জার্মান ভাষায় ভাসের। হ্রজনী 'একুতানি' শব্দের অর্থ করলেন, টু ড্রিঙ্ক, পান করা। সব মিলিয়ে হিত্তী ভাষায় লিখিত লাইনটির আক্ষরিক অনুবাদ হল, 'নাও, ইউ উইল ইট ব্রেড দেন ইউ উইল ড্রিঙ্ক ওয়াটার।' অনেক চিন্তাভাবনা ও আত্মবিশ্লেষণের পর হ্রজনী ১৫ নভেম্বর ১৯১৫ সালে বার্লিন মিডল ইস্ট সোসাইটির সামনে তাঁর নবাবিষ্কৃত তথ্যটি তুলে ধরলেন। তিনি জানালেন যে, হিত্তী ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের ভাষাগুলির মিল আছে—যার জন্য এই ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত মনে করা উচিত। 'দ্য সলিউশন অব দ্য হিটাইট প্রবলেম'-নামক নিবন্ধে তিনি তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলেন। দু'বছর পরে হিত্তীদের ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে আরও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া গেল তাঁর অপর এক স্মরণীয় গ্রন্থে। হ্রজনীর মতামতকে কেন্দ্র করে দশ বছরকাল পণ্ডিতদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক চলে। তাঁর মতকে অভ্রান্ত সত্যরূপে মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি ছিল। উচ্চারণগত সাদৃশ্যের জন্য অনেক হিত্তী শব্দকে হ্রজনী সরাসরি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সমগোত্রীয় বলেছেন—যা অনেকেই স্বীকার করেননি। দ্বিতীয়ত, হিত্তী ভাষাকে পুরোপুরি ইন্দো-ইউরোপীয় বর্গের অন্তর্গত করার একটি বাধা এই যে, এই ভাষার মধ্যে অনেক সেমেটিক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তৃতীয়ত, হিত্তীদের শব্দরূপ ধাতুরূপ ইন্দো-ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক সরল—সেদিক দিয়ে বিচার করলে পার্থক্যটাই যেন বেশি চোখে পড়ে। এই সব বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও দেখা গেল, অধিকাংশ পণ্ডিত হ্রজনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি মেনে নিয়েছেন—মতান্তর কেবল খুঁটিনাটি নিয়েই। ১৯৩৬ সালে সুইস পণ্ডিত এমিল ফোরার জানালেন যে, বোঘাজ কোই লেখমালার মধ্যে তিনি এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন আটটি ভাষা-উপভাষার সন্ধান পেয়েছেন—যার মধ্যে অন্তত তিনটির মূল খুঁজে পাওয়া যাবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে। এডওয়ারড মেয়ার একটি প্রত্নলেখে কয়েকজন বৈদিক দেবতার নাম আবিষ্কার করলেন—যেমন নশত্তিয়ান ( = না সত্য নাম), ইন্দর (= ইন্দ্র), মি-ৎর (= মিত্র), উরুবন্ (= বরুণ)। কয়েকটি ব্যক্তি নামেও ভারতীয় আর্যভাষার বিশিষ্টতা লক্ষ করা গেল। যেমন শুবন্দু (= সুবন্ধু), তুশরও (= দুরথ), মত্তিবজ (= মতিবাজ) অর্তমনিত্র (= ঋতমন্য) ইত্যাদি। হিত্তী প্রত্নলেখগুলির মধ্যে একটি অশ্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দে ভারতীয় আর্যভাষার ছাপ আছে। যেমন, 'আইকবর্তন'-সংস্কৃত একবর্তন। এই শব্দগুলির রূপ থেকে বোঝা যায়, এগুলি সংস্কৃতের পূর্ব অবস্থার শব্দ।

হিত্তীরা বাণমুখ ও চিত্রলিপি উভয়েরই প্রচুর ব্যবহার করেছে। জীবন-ধারণের কাজে











তারকুমুয়া সিল, হামা স্টোন

ও দৈনন্দিন ব্যবহারে তারা বাণমুখলিপির প্রচলন করেছিল, কিন্তু মঠ-মন্দির বা স্মৃতিসৌধে কিছু খোদাই করতে হলে চিত্রলিপির ব্যবহার করত। গঠনরীতি ও শিল্পসৌষ্ঠবের কথা বিচার করলে মিশরীয় চিত্রলেখ হিত্তী চিত্রলেখের চেয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ মনে হয়। কারনাকের মন্দিরে বা পিরামিডের অভ্যন্তরে যে অপূর্ব চিত্রগুলি খোদিত, তার মধ্যে মিশরের শিল্পী তার সৌন্দর্যবোধ ও কল্পনাশক্তির সঙ্গে কঠোর সংযম ও মাত্রাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বোঘাজ কোই-এর মৃৎলেখে বা ইয়াসিলিকায়ার মন্দিরে হিত্তীরা যে নিদর্শন রেখে গেছে, তার মধ্যে লাবণ্যের একান্ত অভাব। খানিকটা অন্যমনস্কতার ভাব নিয়ে হিত্তীশিল্পী তাঁর চিত্রলিপি উৎকীর্ণ করেছেন—যার মধ্যে বলিষ্ঠতা ও রুক্ষ সৌন্দর্য যথেষ্ট থাকলেও, প্রসাধন বা পারিপাট্য একেবারেই নেই—নেই মনোরঞ্জনের কোন সক্রিয় প্রচেষ্টা।

হিত্তী চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার খুব সহজ হল না। চিত্রে ব্যবহৃত প্রতীকের অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে ঘোর মতবিরোধ দেখা দিল। হিত্তী চিত্রলেখের একটি বৈশিষ্ট্য প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হচ্ছে, প্রতীক চিহ্নগুলির অদ্ভুত বিন্যাস। বাণমুখ লিপিতে ডান দিক থেকে বাঁয়ে পড়ে যেতে হয়—কিন্তু হিত্তী চিত্রলেখে প্রথম লাইন ডান দিক থেকে বাঁয়ে পড়ে যেতে হলেও পরের লাইনটি পড়তে হয় সম্পূর্ণ উল্টো দিক থেকে। অর্থাৎ বাঁ থেকে ডাইনে। তৃতীয় লাইন পুনরায় ডান দিক থেকে বাঁয়ে। ধানক্ষেতে হাল দিতে হলে জোয়াল কাঁধে বলদটা যেমনভাবে যাতায়াত করে, লাইনের গতিও অনেকটা সেই ধরনের। হিত্তী চিত্রলেখের সমস্যাটি এত জটিল যে, ১৯২৪ সালে জ্যানসেন ঘোষণা করেছিলেন যে, 'রসেটা স্টোনের' অনুরূপ কোন সার্থক দ্বি-ভাষিক শিলালিপি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত হিত্তী চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার আদৌ সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত, তিনি আরও জানান যে, এ যাবৎ হিত্তী সমস্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যা বলেছেন সব ভুলে গিয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটিকে বিচার করে দেখতে হবে। এই অত্যাবশ্যকীয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে হিত্তী চিত্রলেখের পাঠোদ্ধার হচ্ছে না। ইউরোপ ও আমেরিকার বিশিষ্ট পাঁচজন পণ্ডিত (তাঁদের মধ্যে বসার্ট ও গেল্‌ব্‌-এর নাম করতে হয় সর্বাগ্রে) এই কাজে এগিয়ে এলেন। এঁদের সমবেত চেষ্টার ফলে কয়েকটি প্রতীকের অর্থোদ্ধার করা গেল। 'কারকেমি' 'হামাথা', 'টিয়ানা' প্রভৃতি প্রাচীন শহরগুলির নাম পড়া গেল। আরও জানা গেল, রাজা, শহর দেশ, ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দ বোঝাতে হিত্তীরা কি কি চিহ্ন ব্যবহার করত। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও পাঠোদ্ধারের কোন সর্বগ্রাহ্য রীতি বা পদ্ধতি গড়ে তোলা সম্ভব হল না। মনে হল, সর্বক্ষেত্রেই বুঝি আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া হচ্ছে। শেষে আবার সেই পুরনো সিদ্ধান্তেই ফিরে আসা গেল যে, দ্বি-ভাষিক শিলালিপির আলোকবর্ষী মশালটি ছাড়া এই অন্ধকার আবর্তে আর পথ খুঁজে বার করা যাবে না।

১৯৪৬ সালে এই বহু আকাঙ্ক্ষিত শিলালিপির সন্ধান দিলেন জার্মান প্রত্নবিদ বসার্ট। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের

উদ্দেশ্যে একটি দল নিয়ে আসেন। টরাসের পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় যাযাবর অধিবাসীরা তাঁকে জানিয়েছিল যে, পাহাড়ের পাদদেশে গভীর জঙ্গলে আচ্ছাদিত এক স্থানে একটি পাথরের সিংহমূর্তি আছে। ১৯৪৬-এ বসার্ট তাঁর দলটিকে এখানে নিয়ে আসেন। এক স্কুল-শিক্ষক তাঁর পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিলেন, যাঁর সাহায্য ব্যতীত এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে ঠিক জায়গায় পৌঁছানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বসার্ট দেখলেন, পাথরে খোদিত সিংহ একটি মর্মর মূর্তির পাদদেশে স্থাপিত প্লিনতের কাজ করত। সিংহের পাশেই এই আসল মূর্তিটি ভগ্নাবস্থায় পড়েছিল এবং তারই উপর উৎকীর্ণ ছিল এক সেমেটিক লিপি। সমস্ত পাহাড়ের গা গভীর জঙ্গলে আচ্ছাদিত। স্থানীয় ভাষায় পাহাড়ের নাম 'কারাটেপ' বা কালো পাহাড়। এখানেই প্রত্নতাত্ত্বিক সে বছর কয়েকটি হিত্তী চিত্রলেখের ভাঙা টুকরো আবিষ্কার করেন। এতে তাঁর এই অঞ্চলে আরও ব্যাপক অনুসন্ধানের ইচ্ছা প্রবল হল। পরের বছর ১৯৪৭ সালে ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত পণ্ডিত ড. বাহাদুর আলকিমকে সঙ্গে নিয়ে বসার্ট আবার এসে উপস্থিত হলেন কারাটেপে। দু'জনের চেষ্টায় শেষে দ্বি-ভাষিক একটি শিলাখণ্ড আবিষ্কৃত হল, যার একপাশে ছিল হিত্তী চিত্রলেখ ও অপর পার্শ্বে প্রাচীন ফিনিসীও লিপি। এ যাবৎ হিত্তী চিত্রলেখ পাঠোদ্ধারের যত উপায় ও পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছিল সেগুলি যাচাই করে দেখার কষ্টিপাথর হয়ে দাঁড়ালো এই কারাটেপ শিলা। সমগ্র লিপিটির পাঠোদ্ধার তখন-তখনই করা গেল না। মাত্র ১৫টি চিহ্নের ধ্বনিগুণ জানা গিয়েছিল। এই নতুন আবিষ্কার হিত্তীশাস্ত্রীদের সামনে এক নবদিগন্ত খুলে দিয়েছে। সবেমাত্র চাবিকাঠির সন্ধান পাওয়া গেল—এখন ধীরে-ধীরে পণ্ডিতরা হিত্তী চিত্রলেখের রহস্যোদ্‌ঘাটন করবেন। ১৯৫৬ সালে সিরিয়ার রাস শামারার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে এমন কতকগুলি শিলমোহর পাওয়া গেছে যার কেন্দ্রে হিত্তী চিত্রলেখ ও চারিপাশে ব্যাবিলনীয় বাণমুখ লিপি। ফরাসি পণ্ডিত লারোস্ কতকগুলি চিহ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ হিত্তী চিত্রলেখের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আজও প্রকাশিত হয়নি। পণ্ডিতরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই—তাঁরা অবিরাম অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।

হিত্তী লেখমালার পাঠোদ্ধার-কাহিনীর বিশেষ গুরুত্ব আছে। মাত্র গত পঁচিশ বছরের মধ্যে পণ্ডিতেরা হিত্তী ভাষায় উৎকীর্ণ লেখমালা পড়তে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের শ্রমের ফলে প্রাচীনকালের একটি বিশিষ্ট ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে। এই ভাষা আমাদের সংস্কৃতের একটু দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। এতদিন পর্যন্ত কি ভারতের বাইরে, এমন কি ভারতের পণ্ডিতেরা মনে করতেন যে, ঋগ্বেদের ভাষা 'বৈদিক সংস্কৃত' পৃথিবীর তাবৎ আর্য অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-১২০০-এর বৈদিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সম্মান পেত। হিত্তী ভাষা বেদ-পূর্ব যুগের (খ্রিঃ পূঃ ১৫০০-১৪০০-র দিকে)—এই ভাষার পাঠোদ্ধার হবার পর সংস্কৃতের এই গৌরব আর টিকছে না।

# রাস শামরার লিপিমালা

গ্রিস রোমের যখন শৈশবাবস্থা চলছে, ফিনিসীয়দের তখন পূর্ণ যৌবন—ক্ষমতা প্রতিপত্তিতে তাদের সৌভাগ্য-সূর্য তখন ঠিক মধ্য-গগনে। সুদূরপ্রসারী ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের যে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল তার বলেই তারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। এরা সেমেটিক জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ওলড টেস্টামেন্ট- বর্ণিত ইহুদিদের পবিত্র দেশ। ল্যান্ড অব ক্যানান যখন ইসরায়েলিদের দখলে চলে যায় তখন যে স্বল্পসংখ্যক ক্যানানাইট নিজেদের বাঁচিয়ে রেখে ও সিরিয়া-লেবাননের সঙ্কীর্ণ সমুদ্রতটে নিজেদের আস্তানা করে নেয়—তারাই হল ফিনিসীয়দের পূর্বপুরুষ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে তারা যখন বুঝল যে, জীবনধারণের পক্ষে ভূমিজ ফসলাদি পর্যাপ্ত নয়, তখন তারা সমুদ্রপথে পা বাড়াল। সিরিয়া-লেবাননের পাহাড়ে সেডার বৃক্ষ জন্মাত। সেডার কাঠে সে আমলের ভারী পালতোলা জাহাজগুলি তৈরি হত। এই কাঠ বিদেশে চালান দিয়ে ফিনিসীয় বণিকরা প্রভূত অর্থের মালিক হল। লেবাননের পাহাড়-চূড়া থেকে সাইপ্রাস দ্বীপটি স্পষ্ট চোখে পড়ে। কালক্রমে সেখানেও গড়ে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্য-স্ফীত ফিনিসীয় শ্রেষ্ঠীর প্রথম উপনিবেশ। নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় এবং নতুন বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের তাগিদে এরা জিব্রাল্টার অতিক্রম করে আটলান্টিক অভিমুখে ধাবিত হল। এমন কি দক্ষিণাভিমুখী ফিনিসীয় বাণিজ্যপোত মিশর থেকে যাত্রা শুরু করে তটরেখার উপর দিয়ে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে এল। ভাসকো-ডা-গামার অনেক পূর্বে উত্তমাশা অন্তরীপ পরিক্রমা করার কৃতিত্ব এরাই অর্জন করেছিল। এখন তো একথাও শোনা যাচ্ছে যে, সিরিয়া-পালেস্টাইনের নাবিকরাই নাকি কলম্বসের বহুবর্ষ পূর্বে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেছিল।

আর্মানা লেটারস্ থেকে জানা যায়, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগর উপকূলে ফিনিসীয়দের একাধিক নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। যথা—এক্কো, টায়ার, সিডন বেরিটাস, বিবলস, সিমিরা, আরভাদ্ ও উগারিট। বিখ্যাত টায়ার ও সিডন এখন সমুদ্রগর্ভে। খননকার্যের ফলে বিবলস নিজ পরিচয় জ্ঞাপন করেছে। বিবলস গ্রিক নাম এবং বিবলিয়া (বই) কথাটি থেকে এর উৎপত্তি। মিশর থেকে প্যাপাইরাস আসত এই বন্দরে এবং এখান থেকে সেগুলি চালান হত ইউরোপে। এক্কো বর্তমানে একার, বেরিটাস্ বেরুট, সিমিরা সুমরা এবং আরভাদ্ রুয়াদ্। কিন্তু উগারিট যে কোথায় ছিল সে সংবাদ দীর্ঘদিন জানা যায়নি।

সিরিয়ার উত্তরে সমুদ্রতীরে মিনেত-এল-বেইদা বন্দর—গ্রিকরা তাকে বলত 'হোয়াইট হারবার'। ১৯২৮-এর গ্রীষ্মকালে এক কৃষক মিনেত-এল-বেইদার কাছে তার জমিতে লাঙ্গল দিতে-দিতে পাথরে চাপা এক সুড়ঙ্গপথের সন্ধান পায়। সুড়ঙ্গপথটি ধরে নিচে

নেমে সে এক অন্ধকার ঘরে এসে উপস্থিত হল—সেখানে ছড়ানো ছিল নানা অদ্ভুত ধরনের জিনিসপত্র। অজ্ঞ কৃষক প্রথমেই ধরে নিল সে মাটির তলায় গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও সে হয়ত তার সৌভাগ্যের কথা বলে থাকবে। তাই আবিষ্কারের কথা গোপন থাকল না। কানাঘুষার মধ্য দিয়ে ঘটনাটি স্থানীয় মহকুমা শাসকের কাছে পৌঁছে গেল। প্রকৃত ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে তিনি তৎক্ষণাৎ আবিষ্কারের সংবাদটি বেরুটে অবস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান সমিতিকে জানিয়ে দিলেন। ফরাসি প্রত্নবিদ্ ড. শার্ল ভিরলো সুড়ঙ্গপথে নেমে সমাধিকক্ষটি পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিলেন যে এখানে খননকার্য চালালে অচিরে অনেক পুরাবস্তুর সন্ধান মিলবে। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে মাসখানেকের মধ্যে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ড. ক্লোদ্ শেফে ও জর্জ শেনে রাস শামরার ঢিবিতে খননকার্য শুরু করলেন। এই খননের ফলে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত উগারিট নগরীর পুনরায় সন্ধান পাওয়া গেল—সেই সঙ্গে বহু পুরাতন এক ভাষা ও লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হল।

রাস শামরার ঢিবিটি প্রায় ৬০ ফুট উঁচু এবং তার সারা গায়েই গাছ-গাছড়ার গভীর জঙ্গল। প্রত্নতাত্ত্বিকদ্বয় কাজ আরম্ভ করে হাতে হাতে সুফল পেলেন। খননকার্যের ফলে যে সর্বনিম্ন স্তরটি আবিষ্কৃত হল সেটির বয়সকাল আনুমানিক তিন হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। এর উপরেই দ্বিতীয় স্তরে খ্রিঃ পূঃ ২০—১৬ শতকের এক বিস্তীর্ণ সমাধিক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। এই স্তরে মৃৎপাত্রের কোন নিদর্শন চোখে না পড়ায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করলেন যে, এই যুগে পার্শ্ববর্তী গ্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে উগারিটের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। উপরের স্তরটিতে (খ্রিঃ পূঃ ১৪—১২ শতক) একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল। প্রথমে প্রত্নবিদরা মনে করেছিলেন, এটি কোন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। স্থানে স্থানে অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন ছিল বলে তাঁরা ধরে নিলেন, একটি বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডের ফলে সুন্দর প্রাসাদটি বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু যেদিন ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে একটি শিলালেখ এবং দুটি দেবমূর্তি খুঁজে পাওয়া গেল, সেদিন কোন সন্দেহ থাকল না যে, এতদিন যাকে রাজপ্রাসাদ বলে মনে করা হয়েছিল আসলে সেটি মন্দির। মূর্তি দুটি অটুট অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। একজনের পরিধেয় বস্ত্রটি মিশরীয় ধরনে পরিহিত—অপরজনের চেহারার আদলে এবং পোশাক-পরিচ্ছদে মিশর-সিরিয়া-এশিয়া মাইনর প্রভৃতি একাধিক দেশের প্রভাব পরিস্ফুট। খননকার্যের ফলে আরও একটি নিদর্শন হাতে এলো যা পরিষ্কারভাবে জানাল যে, কেবল পশ্চিম এশিয়া বা মিশর নয়, এই অঞ্চলে সুদূর ক্রীট ও মাইকেনির প্রভাব যথেষ্ট কার্যশীল ছিল। নিদর্শনটি হাতির দাঁতের তৈরি অতিসুন্দর একটি ছোট বাক্স, যার উপর অঙ্কিত এক মোহিনী নারীমূর্তি। তিনি নগ্নবক্ষা, হাতে যবের শীষ, পরিধানে প্রশস্ত ঘাগরা। মনে হয় ইনি মাইকেনির সৃষ্টি ও প্রজননের দেবী—পটনিয়া থেরন। নিদর্শনটি যে

রাস শামরার লিপিমালা

রাস শামরার লিপির নমুনা

গ্রীক জগতের প্রতিচ্ছবি বহন করে এনেছে তা অনস্বীকার্য। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত রাস শামরায় একদা বিভিন্ন সংস্কৃতির পাশাপাশি সহ-অবস্থান সম্ভব হয়েছিল?

রাস শামরার দেব দেউলকে রাজপ্রাসাদ বলে ভ্রম করার একটি বড় কারণ এই যে ভগ্নস্তূপের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর আবিষ্কৃত হয়। একদা এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলিকে পণ্ডিতেরা রাজপ্রাসাদের শস্যভাণ্ডার বলে মনে করেছিলেন। এই ধারণা তাঁদের ত্যাগ করতে হল যখন কোন একটি ঘরের আবর্জনার মধ্যে অনেক কিউনিফর্ম ট্যাবলেট পাওয়া গেল। এখন পরিষ্কারভাবে জানা গেল, যাকে শস্যভাণ্ডার বলে মনে করা হচ্ছিল আসলে সেটি গ্রন্থাগার—যেখানে এরকম মাটির ট্যাবলেটের উপর লিখিত দলিলপত্রাদি সযত্নে রক্ষিত হত। পঁচিশ বছর পূর্বে এশিয়া মাইনরের বোঘাজ কোই-এর খননকার্য যেরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, রাস শামরার প্রত্নতাত্ত্বিক্ সম্পদও সেইরূপ বিস্ময়ের উদ্রেক করল পণ্ডিত সমাজে। বিস্ময় আরও ঘনীভূত হল, যখন দেখা গেল ট্যাবলেটগুলি এমন এক দুর্জ্ঞেয় ভাষায় লিখিত যার নমুনা এ পর্যন্ত আর কোথাও পাওয়া যায়নি। পণ্ডিতদের অনুমান তিন হাজার বছর পূর্বে এই অঞ্চলের লোকেরা এই ভাষাতেই কথা বলত। ফরাসি প্রত্নবিদরা এই লিপির মর্মোদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন। একদিকে যেমন শেপে ও শেনে মাটি খুঁড়ে নিত্যনতুন উপাদানের সন্ধান দিতে থাকলেন, অন্যদিকে সেগুলি পরীক্ষা করে পাঠোদ্ধার করার দুরূহ গবেষণায় নিযুক্ত থাকলেন সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত ও বেরুটের প্রত্ন-গবেষণা সমিতির সুযোগ্য পরিচালক শার্ল ভিরলো। তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে অল্প সময়ে পঞ্চাশখানি কিউনিফর্ম লিপির টেক্সট ছাপলেন। এর ফলে সারা ইউরোপের পণ্ডিত সমাজ এ বিষয়ে মনোযোগ দেবার সুযোগ পেল। বিশেষ করে উপকৃত হলেন জার্মান পণ্ডিত হানস্ বাওয়ার। ভিরলো ও বাওয়ারের যৌথ প্রচেষ্টায় রাস শামরা লিপিমালার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। সেমেটিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, প্রাচ্যশাস্ত্রবিশারদ ও বহুভাষাবিদ ড. হানস্ বাওয়ার জার্মানির হাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পাঠ নেন এবং অঙ্কশাস্ত্রে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেন। গাণিতিক প্রতিভা ও ভাষাজ্ঞান—উভয়ের সমন্বয়ে তিনি দুর্জ্ঞেয় লিপির রহস্য-ভেদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাস শামরার লিপিমালা পরীক্ষা করে সর্বপ্রথম ভিরলো এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, অজ্ঞাত লিপিমালার মূল অক্ষর সাতশটির বেশি নয় (পরে অবশ্য জানা গেছে সঠিক সংখ্যা বত্রিশ) এবং অক্ষরের সীমাবদ্ধতা থেকে তিনি অনুমান করেন যে, লিপিমালার মধ্যে ধ্বনিগুণ-সমৃদ্ধ একটি বর্ণমালাকে আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। এই পর্যন্ত তাঁর অনুমান সার্থক। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত—এটি সাইপ্রাস দ্বীপের ভাষা বা আর্মানা লেটারস্-এর ভাষার অনুরূপ—সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। হানস্ বাওয়ার এই ভুল করেননি। ধীর

পর্যবেক্ষণ গুণ ও প্রত্যক্ষ অনুধাবন-ক্ষমতা তাঁকে এক স্থির অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দিকেই চালিত করেছিল। তিনি রাস শামরা-উগারিটের ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক পটভূমি ও লোকচরিত্র ইত্যাদি থেকে অনুমান করলেন অজ্ঞাত ভাষাটি মূলত সেমেটিক এবং তাই কোন ক্যানানাইট বা ফিনিসীয় উপভাষার মধ্যে এর উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রথম থেকেই তিনি সেমেটিক ব্যাকরণের নিয়মকানুন, শব্দবিন্যাস ও উচ্চারণ-পদ্ধতি অজ্ঞাত অক্ষরগুলির উপর প্রয়োগ করতে মনস্থ করেন। দুটি দাঁড়ির মধ্যে স্বল্প পরিসরের বাক্য এবং তারই মধ্যে এমন একটি কিউনিফর্ম চিহ্ন আছে যা টেক্সটের মধ্যে বার-বার ঘুরে-ফিরে আসছে। বাওয়ার ধরে নিলেন, এটি নিশ্চয়ই সেমেটিক ভাষার কোন পরিচিত ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষর—কেননা ঐ ভাষায় স্বরবর্ণের ব্যবহার অজ্ঞাত। এই অক্ষরটির সম্ভাব্য ধ্বনিগুণ কি হতে পারে তা স্থির করতে তিনি গাণিতিক পদ্ধতিতে এক দীর্ঘ তালিকা বা নির্ঘন্টি তৈরি করলেন। এইভাবে কতকগুলি সাধারণ শব্দ যথা সান, গড, কিং ইত্যাদির পাঠ সম্ভব হল। সবসুদ্ধ সতেরোটি চিহ্নের ধ্বনিগুণ তিনি জানিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পূর্বে ফরাসি পণ্ডিত শার্ল ভিরলো একটি ব্রোঞ্জের তৈরি কুঠারে ছটি কিউনিফর্ম চিহ্ন খোদিত আছে লক্ষ করেছিলেন। তাঁর মনে হল চিহ্নসমষ্টি কোন ব্যক্তিবিশেষের নামকে বোঝাচ্ছে এবং নামের ঠিক পূর্বেই যে চিহ্ন, সেটিতে সম্বোধনসূচক কিছু আখ্যা দেওয়া আছে। তিনি বললেন, আক্কাদিয়ান ভাষায় এটি 'আনা', ইংরেজিতে 'টু'। এর মধ্যে একটি পরিচিত হিব্রু শব্দের সন্ধান পাওয়া গেল—'গারজেন' বা কুঠার। সব লাইনটির পাঠ দাঁড়াল, 'গারজেন রাব খান্‌ম্‌' বা প্রধান পুরোহিতের কুঠার। কিন্তু উগারিট ঠিক পুরোপুরি হিব্রু ভাষা নয়। সেমেটিক উপভাষার উপর অসাধারণ দখল ছিল বলেই বাওয়ার প্রমাণ করলেন শব্দটির যথার্থ পাঠ 'হারজেন', 'গারজেন' নয়।

১৯৩০-এ হানস্‌ বাওয়ার তাঁর গবেষণার ফলাফল এক সুদীর্ঘ নিবন্ধে প্রকাশ করলেন। তাতে তাঁর পাঠোদ্ধার-পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা ছিল। মূল বিষয়টি জানা গেলেও তখন খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারে সন্দেহ দূর হয়নি। শেষ পর্যন্ত পাঠোদ্ধার-পদ্ধতিকে সুসংবদ্ধ রূপ দিলেন জেরুজালেমে অবস্থিত ফরাসি প্রত্ন-গবেষণা সমিতির পরিচালক এদুয়ার দর্ম্‌। প্রখ্যাত পণ্ডিত দর্মের একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি গুপ্ত 'কোডের' নিখুঁত অর্থ করে দিতে পারতেন। প্রথম মহাযুদ্ধে শত্রুপক্ষের অনেক গোপন খবর এভাবে তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। এই বিশেষ ক্ষমতা প্রত্ন-গবেষণায় তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

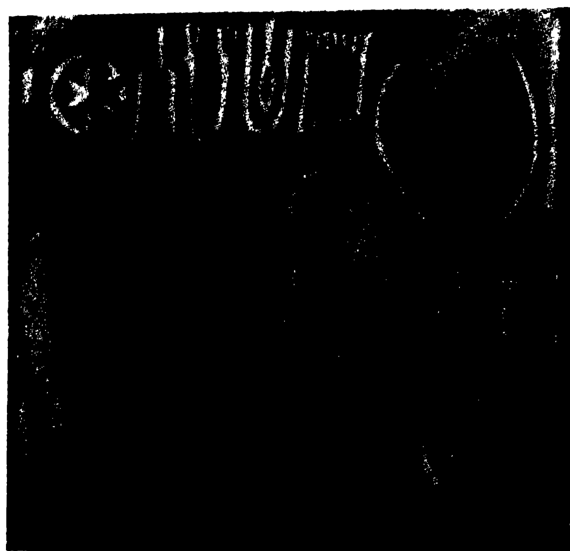
ভিরলো, বাওয়ার ও দর্মের গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, রাস শামরার লিপিমালায় কোন ভাবব্যঞ্জক সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা সিলেবিক চিহ্ন নেই—আছে একটি সুস্পষ্ট ও সুসম্পূর্ণ বর্ণমালা, যা সামান্য ব্যতিক্রম সত্ত্বেও অন্যান্য সেমেটিক বর্ণমালারই অনুরূপ। ধরাপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত উগারিট নগরী ও তার বিপুল ঐশ্বর্যের কথা আমরা এতদিনে

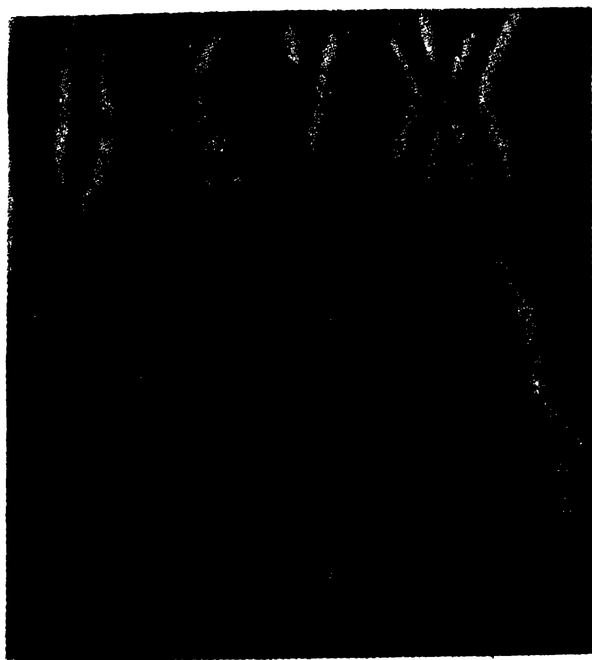
জানতে পেরেছি। গ্রিক, ব্যাবিলনীয় ও হিত্তী সাম্রাজ্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগের ফলে এখানে এক মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল—সাহিত্য ও শিল্পকলায় যার সার্থক রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাতে হলেও উগারিট সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য ধর্ম এবং ধর্মকে অবলম্বন করেই এই বিরাট গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের উৎস, অজ্ঞাত পূজাপদ্ধতি ও ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত অনেক দেবদেবীর প্রকৃত পরিচয় এই অজ্ঞাত লিপির পাঠোদ্ধারের ফলে জানা সম্ভব হয়েছে।

# মহেঞ্জোদরোর শিলমোহর

হাজার বছর ধরে যে সিন্ধু সভ্যতা মাটির তলায় চাপা পড়েছিল, মাত্র সেদিন অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা তার সন্ধান পেয়েছেন। করাচি থেকে দু'শ মাইল দূরে কয়েকটি লালরঙের ধ্বংসস্তূপ। কৌতূহলী মানুষ সেদিকে তাকিয়ে দেখত ও ভাবত, এর নিচেই হয়ত সমাধিস্থ হয়ে আছে প্রাচীন কোন জনপদ। কিন্তু এর বেশি কিছু মনে আসত না তাদের। ১৮৫৬ সালে লাহোর-করাচি রেলপথ খোলা হচ্ছিল। লাইন পাতার কাজ নিয়ে এলেন দুই ভাই—জন ও উইলিয়ম ব্রানটন। বড় ভাই জন যখন ইঁট-পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তখন স্থানীয় লোকেরা তাঁকে খবর দেয় যে, কাছেই ব্রাহ্মণাবাদ বলে এক পরিত্যক্ত শহর আছে যেখানে প্রচুর ইঁট-পাথর পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মণাবাদ থেকে কুলিরা ইঁট বয়ে নিয়ে এলো লাইন পাতার কাজে। একটি প্রাগৈতিহাসিক শহরের স্মৃতিও সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হল। হরপ্পার ধ্বংসস্তূপও ঠিক এইভাবে ইঁট জোগালো রেলের ঠিকাদারদের। আজও লাহোর-করাচি লাইনে যে রেলগাড়ি চলে, তার নিচেই পাতা আছে আড়াই হাজার বছরের পুরাতন সভ্যতার কঙ্কাল—এই প্রাগৈতিহাসিক ইঁটের টুকরোগুলি। এই ঘটনার কিছু পরেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর কানিংহাম সাহেব হরপ্পার স্তূপ থেকে অজ্ঞাত অক্ষরযুক্ত কয়েকটি শিলমোহর সংগ্রহ করেন। সিন্ধু উপত্যকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে কানিংহাম বিদ্বৎসমাজকে সজাগ করেন। যথারীতি খননকার্যও চলতে থাকে। হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ ১৯২১ সালে রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহানি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে খুঁড়তে শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে মধুস্বরূপ বৎস তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করেন।

মহেঞ্জোদরোর খননকার্যও শুরু হয়েছিল প্রায় একই সময়ে ১৯২২ সালে। হরপ্পা থেকে মহেঞ্জোদরোর দূরত্ব প্রায় চার'শ মাইল। মহেঞ্জোদরোর আবিষ্কর্তা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন প্রত্নবিভাগের পশ্চিম প্রান্তের পরিদর্শক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৭-২২ এই পাঁচ বছর শীতকালে তিনি সিন্ধু ও শতদ্রু তীরবর্তী অঞ্চলে পুরাকীর্তির অনুসন্ধান করে বেড়ান। শোনা যায়, গ্রিক বীর আলেকজান্ডার শতদ্রু তীরে ১২টি শিলাখণ্ডে গ্রিক ও ভারতীয় ভাষায় তাঁর নিজস্ব দিগ্বিজয়-বার্তা উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। এগুলির অন্বেষণই ছিল রাখালদাসের প্রধান লক্ষ্য। অনেক দুর্গম স্থান তিনি ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধ হল না—কোন শিলালিপিই তিনি খুঁজে পেলেন না। একদিন হরিণ শিকার করতে গিয়ে তিনি গভীর জঙ্গলে পথ হারালেন। ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনি পৌঁছলেন মৃতের শহর মহেঞ্জোদরোতে। সেখানে চকমকি পাথরের একটি ছুরি দেখে এই জায়গাটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। কাছেই এক বৌদ্ধস্তূপে তাঁর খননকার্য শুরু





মহেঞ্জোদড়োর সিলমোহর—দুটি নমুনা

হল। প্রথম ক'দিন খননের ফলেই আবিষ্কৃত হল অদ্ভুত অক্ষরযুক্ত কয়েকটি শিলমোহর। ৬৫ বছর পূর্বে কানিংহাম হরপ্পা থেকে যে শিলমোহরগুলি সংগ্রহ করেন, সেগুলির সঙ্গে নতুন সিলমোহরের হুবহু সাদৃশ্য লক্ষ করা গেল। তাছাড়া ধ্বংসস্তূপের নিচেই পাওয়া গেল আরও কয়েকটি স্তর—যেগুলি আরও অনেক প্রাচীনকালের সাক্ষ্য বহন করছে। এমনিভাবে এক বৌদ্ধ স্তূপ ও চৈত্য-বিহার উদ্ধার করতে গিয়ে রাখালদাস সন্ধান পেলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক সুপ্রাচীন সভ্যতার। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর জন মার্শালের তত্ত্বাবধানে ১৯২২-২৭ পর্যন্ত মহেঞ্জোদরোর খননকার্য চলে। এই কাজের পূর্ণ বিবরণ মার্শাল রেখে গেছেন ১৯৩১-এ প্রকাশিত তাঁর তিন খণ্ডের গ্রন্থে—যার নাম 'মহেঞ্জোদরো এন্ড দ্যা ইন্ডাস সিভিলাইজেশন'। এর সাত বছর আগে ১৯২৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি 'ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ' পত্রিকায় 'ফার্স্ট লাইট অন এ ফরগটন সিভিলাইজেশন' নামক একটি সচিত্র প্রবন্ধ লেখেন—যেটি পড়ে বিশ্ববাসী প্রথম এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা জানতে পারে। কয়েক বছর পূর্বে হাওয়ার্ড কার্টারের টুটেনখামেনের সমাধির বিস্তারিত খবর পাওয়া গিয়েছিল; এবার সিন্ধু উপত্যকার কাহিনী ইতিহাসের আর এক নবদিগন্তের সন্ধান দিল।

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় প্রায় আটশ শিলমোহর পাওয়া গিয়েছিল। এগুলির উপর অদ্ভুত অক্ষরে অনেক কিছু আঁকাজোকা। তাছাড়া দেবদেবীর মূর্তি, মানুষ ও পশুপক্ষীর ছবি। কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর লিপিগুলির পাঠোদ্ধার হয়নি আজও। যেদিন এগুলির পাঠোদ্ধার হবে, সেদিন সুদূর অতীতে ভারতে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ জানব। ভারত ও নিকট প্রাচ্যের অনেক অন্ধকার অধ্যায়ও সেই সঙ্গে আলোকিত হয়ে উঠবে।

শিলমোহরগুলি তাম্রনির্মিত অথবা পোড়ামাটির। হাড়ের তৈরি একটি শিলমোহরও আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্যেকটিতে চিহ্ন আছে এবং কোনক্ষেত্রেই তা ছ'টির বেশি নয়। সবশুদ্ধ কতগুলি চিহ্ন এগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে তা পণ্ডিতেরা সঠিক নিরূপণ করতে পারেননি। সি এইচ গ্যাড প্রমুখ প্রত্নবিদরা মনে করতেন, সবশুদ্ধ চারশটি চিহ্নের ব্যবহার হয়েছে। অপরদিকে হান্টারের মতে, দেড়শটির বেশি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি। দুই বিরুদ্ধ মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পণ্ডিতেরা একটি ভদ্রমত সংখ্যা, দু'শতে এসে পৌঁছেছেন। কম করে ধরেও যে সংখ্যাটি আমরা পাচ্ছি তা ধ্বনিগুণসম্পন্ন যে কোন বর্ণমালার পক্ষে খুবই বেশি। তাই বাধ্য হয়েই বলতে হয় চিহ্নগুলি ভাবব্যঞ্জক। এইরূপ লিপিতে দৃশ্যমান জগতের কোন না কোন প্রতীক বা প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা হয়ে থাকে। অনুমান করা যায়, মহেঞ্জোদরোর লিপিতে ধ্বনিগুণসম্পন্ন অক্ষরমালা ও প্রতীক চিহ্ন একই সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।

কি উদ্দেশ্যে এই শিলমোহরগুলি ব্যবহার করা হত? লক্ষ করা যায় যে, দেবদেবী

মত করে কেউ-কেউ তা ব্যবহার করত। অঙ্গে ধারণ করলে অপদেবতা ধারেকাছে ঘেঁষত না, রোগভোগও পালাত দূরে।

যদিও নিঃসন্দেহে কোন পণ্ডিত এখন পর্যন্ত এই লিপির রহস্য ভেদ করতে পারেননি তবু তাঁরা ভিন্ন-ভিন্ন পথ বা উপায়ের সন্ধান দিয়েছেন। হয়ত এগুলির কোন একটি অনুসরণ করে ভবিষ্যতের কোন গবেষক আলোর সন্ধান পাবেন। কানিংহাম তাঁর রিপোর্ট-এ (১৮৭২-৭৩) সর্বপ্রথম অনুমান করেন যে, হরপ্পার শিলমোহর-অঙ্কিত লিপি বিদেশী সংস্রবহীন একান্তই ভারতীয় এবং সম্ভবত প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির জনক। বিশেষ কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর তাঁর এই মত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি এমন এক প্রতিভাবান প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন যে, অনেক সময়ে নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন—যা পরে অভ্রান্ত বলে বিবেচিত হত। তাই এক্ষেত্রে কানিংহাম সাহেবের মতকে ভ্রান্ত বা অর্বাচীন বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ নয়। একাধিক পণ্ডিত তাঁকে সমর্থনও করেছিলেন।

সিন্ধুলিপি সম্বন্ধে আর-একটি মত হল এই যে, এটি প্রাচীন মেসোপটেমীয় লিপির সমগোত্রীয়। চেক-পণ্ডিত বেডরিশ হ্রজনী (১৮৭৯-১৯৫২) এই মতের প্রবক্তা। হ্রজনী ১৯৩৯ সালে এক প্রবন্ধে হিত্তী চিত্রলেখের সঙ্গে সিন্ধুলিপির নিকট-সাদৃশ্য লক্ষ করেন এবং সিলমোহরের অদ্ভুত চিহ্নগুলির উপর হিত্তী ধ্বনিগুণ আরোপ করে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। হিত্তী চিত্রলেখের পাঠোদ্ধার করে হ্রজনী বিশ্বের সুধীসমাজে তাঁর স্থায়ী আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু সিন্ধুলিপির গবেষণায় তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেননি।

পেভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিয়েরো মেরিজ্জি ১৯৩৭-এ এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে সিন্ধুলিপি সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল জানান। তাঁর প্রধান বক্তব্য—কোন বিদেশী ভাষার ধ্বনিগুণ এই চিহ্নগুলির উপর চাপানো চলবে না। তাঁর মতে, সিন্ধুলিপির চিহ্নগুলি বেশির ভাগই হচ্ছে ভাবব্যঞ্জক প্রতীক চিহ্ন, যার মর্ম ভেদ করা সহজ নয়। চিহ্নগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সাজিয়ে তার মধ্যে কোন ভাষার প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া সম্ভব কিনা, সেই চেষ্টাই করেছেন মেরিজ্জি। কতকগুলি চিহ্নের ব্যাখ্যাও তিনি দেন। কিন্তু হ্রজনী সেগুলি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেছেন। এই অতীব দুরূহ সমস্যার উপর আলোকপাত করতে এক ইটালিয়ান অধ্যাপকও অসমর্থ হয়েছেন।

১৯৩৪-এ হাঙ্গেরিয়ান পণ্ডিত হেভেশি বলেন যে, সিন্ধুলিপির সঙ্গে পলিনেশিয়ার ইস্টার আইল্যান্ডের অধুনালুপ্ত 'রঙ্গোরাঙ্গা' লিপির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। কাঠের ফলকে খোদাই করা এই লিপি এই দ্বীপের একটি প্রধান বিস্ময়। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে

তাহিটি দ্বীপের ফরাসি ধর্মযাজক বিশপ জসেন এই চিত্রলিপির কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন। অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে তিনি এগুলি নিয়ে আসেন লেখাপড়া জানা সম্ভ্রান্ত এক পলিনেশীয় যুবকের কাছে। আশা ছিল, তাঁর মত শিক্ষিত যুবক এগুলি পড়ে দিতে পারবেন। যুবকটি দুর্বোধ্য ভাষায় একটানা কি-এক মন্ত্র আবৃত্তি করে গেল। বিশপ বুঝলেন, প্রতিটি অক্ষর চিনে বা বুঝে সে পড়ছে না। কেবলমাত্র অভ্যাসের বশেই একটানা আবৃত্তি করে যাচ্ছে। এই ব্যাপার থেকে তাঁর বুঝে উঠতে কষ্ট হল না যে, ইস্টার আইল্যান্ডের রঙ্গোরাঙ্গা লিপির জ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। অগত্যা কি আর করেন, যুবকটি যেমন যেমন উচ্চারণ করেছিল, মূলমন্ত্রটি ঠিক যেমন ভাবে, আসল ধ্বনি বজায় রেখে ফরাসি ভাষায় লিখে ফেলেন। যদিও অনেক কথারই মানে তিনি জানতেন না, অন্যান্যদের সাহায্যে একটি ফরাসি অনুবাদও তৈরি করে ফেলেন। দুঃখের বিষয়, বিশপ জসেনের এই মহামূল্য দলিলটি পরবর্তীকালে হারিয়ে যায়। ১৯৫৪ সালে টমাস বারটেল নামক এক জার্মান প্রত্নবিদ রোমে আগমন করেন এবং ধর্মযাজকের গ্রন্থাগারটি তন্নতন্ন করে খুঁজে এই দ্বিভাষিক দলিলটি পুনরুদ্ধার করেন। এটির সাহায্যে তিনি 'রঙ্গোরাঙ্গা' লিপির কয়েকটি অক্ষর পাঠ করেছেন বলে দাবিও করেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তকে পণ্ডিত সমাজ মেনে নিতে পারেনি।

কিন্তু সিন্ধুলিপির সঙ্গে ইস্টার আইল্যান্ডের এই লিপির অদ্ভুত ও আশ্চর্য সাদৃশ্যের রহস্য ভেদ হল কি? হাঙ্গেরিয়ান পণ্ডিত হেভেশির মতে, ভারত থেকে প্রথম আদিবাসী আগন্তুক এই লিপি সুদূর ইস্টার আইল্যান্ড নিয়ে আসে। প্রমাণস্বরূপ তিনি দুই লিপির শতাধিক অক্ষরের হুবহু মিলটি দেখিয়ে দেন। তিনি পাঠোদ্ধার করেননি, কেবল মিল দেখিয়েই নিরস্ত হয়েছিলেন। এ ধরনের মিল থেকে যাঁরা কোন সহজ সিদ্ধান্তে পৌছতে চান, তাঁদের সর্বাগ্রে দুটি প্রধান বাধার কথা মনে রাখতে হবে। প্রথম কথা, ভারত ও ইস্টার আইল্যান্ডের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব। পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুই লিপির জন্ম। আকৃতিগত যে সাদৃশ্য এদের মধ্যে আছে, তা নেহাৎই আকস্মিক। দ্বিতীয় কথা, সময়ের ব্যবধান। ইস্টার আইল্যান্ডের রঙ্গোরাঙ্গা লিপি বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন। এই ভাষা উক্ত দ্বীপে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে সিন্ধুলিপির উৎপত্তি আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। উভয় লিপির মধ্যে সময়ের ব্যবধান চার হাজার বছরেরও বেশি।

ভারতবর্ষের অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউ সফল হতে পারেননি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত কাগজপত্র যাঁরা পড়েছেন তাঁরা বলেন, পাঠোদ্ধারের কাজ তিনি শুরু করেছিলেন। তবে তাঁর অকাল মৃত্যুতে সবই মাঝপথে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জয়সোয়াল, প্রাণনাথ, রেভা হেরাস, স্বামী শঙ্করানন্দ—প্রত্যেকেই এই লিপি সম্বন্ধে কিছু না কিছু চমকপ্রদ কথা বলেছেন। রেভা

হেরাস জানান যে, তিনি সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার করেছেন এবং সেই পাঠের ভিত্তিতে সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণও দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, রহস্যোদ্‌ঘাটনের চাবিকাঠিটি কি, সেকথা বিশদভাবে কোথাও তিনি আলোচনা করেননি।

এযাবৎ পাঠোদ্ধারের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার শিলমোহরগুলি আজও মৌন। আমরা প্রতীক্ষা করে আছি অনাগত দিনের সেই ঐন্দ্রজালিকের জন্য, যাঁর করস্পর্শে তাদের ঘুম ভাঙবে এবং শত শত বর্ষের সুষুপ্তি কাটিয়ে স্পষ্ট ভাষায় আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করবে।

---

# অশোকলিপির পাঠোদ্ধার-কাহিনী

ব্রাহ্মীলিপি ভারতের সর্বপ্রাচীন লিপি—যা আমরা পাঠ করতে সক্ষম হয়েছি। এখন থেকে দু'হাজার বছরেরও আগে এই লিপি আমাদের দেশে সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। খুব সম্ভব ব্রাহ্মীলিপিই ভারতের আর্যভাষা প্রভৃতির আদি বা প্রাচীনতম লিপি। পুরাণে খ্রিস্টপূর্ব বহু সহস্র বছরের কথা বলে; কিন্তু ভারতে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-র পূর্বেকার আর্যভাষায় রচিত কোন লেখ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি বা পঠিত হয়নি। মৌর্যসম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলি ব্রাহ্মীতে উৎকীর্ণ। অশোক-পূর্বযুগের কোন ব্রাহ্মী নিদর্শন আজও আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু অশোকের আমলে লিখন-পদ্ধতির যে উৎকর্ষের পরিচয় আমরা পাই, তাতে মনে হয়, বহু যুগ পূর্ব থেকেই ভারতবাসী এই লিপির অনুশীলনে অভ্যস্ত ছিল। দীর্ঘ শতাব্দীর সাধনা ও ঐতিহ্য পশ্চাতে না থাকলে অশোকলিপির প্রতিটি অক্ষর এত স্পষ্ট ও নিখুঁত এবং রেখাগুলি এত সুষমামণ্ডিত হত কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য আমাদের জানা নেই। এক সময়ে অনেকে মনে করতেন এটি প্রাচীন ফিনিশীয় লিপি থেকে উদ্ভুত। বিখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিদ ব্যুল্যার এই মতের প্রবক্তা। অপর পক্ষে কানিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, ভারতের আর্যভাষী জনগণ- কর্তৃক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে, কোন মৌলিক চিত্রলিপি থেকে ব্রাহ্মীর উৎপত্তি ঘটেছে। এঁরা অনুমান করেন যে, মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের লিপি পাওয়া গেছে, তাই হচ্ছে ব্রাহ্মীলিপির জনক। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ যে সময়ে ভারত-ভ্রমণ করেন (খ্রিস্টীয় ৭ম শতকের প্রথমার্ধে) সে সময়ে ব্রাহ্মীতে লিখিত অশোকলিপি সম্বন্ধে জ্ঞান এ দেশে একেবারেই লোপ পেয়েছিল। তা না হলে চীনা পরিব্রাজকের বিবরণে অন্তত কতকগুলি অশোকলিপির মর্ম অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যেত। অশোক যে তাঁর সমস্ত অনুশাসনই ব্রাহ্মীতে খোদিত করেছিলেন তা নয়। যে স্থানের অধিবাসীরা এই লিপির ব্যবহার জানত না, সেখানে তিনি সেই দেশের প্রচলিত লিপিই ব্যবহার করেছেন। যেমন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। এই অঞ্চলের দুটি স্থানে শহাবাজগাড়ি ও মানসেরাতে যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তা খরোষ্ঠীতে উৎকীর্ণ। খরোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর অক্ষরগুলি আরবি-ফারসির মত ডান দিক থেকে বাঁয়ে লেখা হত; অপর দিকে ব্রাহ্মী-বর্ণমালার গতি ছিল বাঁ দিক থেকে ডাইনে। সম্প্রতি ভারত সীমানার বাইরে কান্দাহারে গ্রিক ও অ্যারামিকে লিখিত একটি দ্বিভাষিক অশোক-অনুশাসন পাওয়া গেছে।

অশোক লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে মাত্র সেদিন, অর্থাৎ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। তার আগে স্থাপত্য শিল্পরসিক দিল্লির বাদশা ফিরুজ তুঘলক (১৩৫১-৮৮)

একবার অশোক লিপির রহস্যোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন। ফিরুজের জীবনীকার শামস্-ই-সিরাজ আফিফ্ এ সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সুলতান একবার সদলবলে মৃগয়ায় বেরিয়ে খিজিরাবাদের বত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আম্বালার কাছে তোপরা গ্রামে এসে উপস্থিত হন। এই গ্রামে মস্ত বড় একটি পাথরের স্তম্ভ সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লালচে রঙের আস্ত একখানা বেলে পাথর কেটে ও সুন্দরভাবে পালিশ করে কোন এক অজ্ঞাত কারিগর এটি তৈরি করেছিল। ফিরুজের সময় কোন ওস্তাদ মিস্ত্রি পাথরের উপর ওরকম সুন্দর পালিশ তুলতে জানত না। লম্বায় স্তম্ভটি ৪২ ফুট ৭ ইঞ্চি—সূর্যের কিরণ পড়লে এটি সোনার মত ঝকঝক করত। সুলতান এর নাম দিলেন—মিনার-ই জারিন্ বা সোনালি স্তম্ভ। তাঁর ইচ্ছা হল, এই নিদর্শনটি রাজধানীতে স্থাপন করে তাকে শিল্পসম্ভারে সমৃদ্ধ করে তুলবেন। কাজটি কিন্তু সহজ হল না। অত বড় স্তম্ভ তুলবার সময় জখম হবার সম্ভাবনা বেশি। আবার তোপরা গ্রাম থেকে দিল্লির দূরত্ব কম নয়। সুলতানের লোকেরা রাশি রাশি শিমুল তুলো যোগাড় করে আনল। স্তম্ভের পাদদেশে সেই তুলো খুব পুরু করে পেতে তার উপর স্তম্ভটিকে আস্তে আস্তে কাত করে ফেলা হল। তারপর ৪২ চাকার একখানা মানুষ-টানা গাড়িতে সেই স্তম্ভ আনা হল যমুনার তীরে এবং সেখান থেকে নদীপথে সুলতানের রাজধানীতে। ফিরুজ তাঁর প্রাসাদ-শীর্ষে স্তম্ভটি স্থাপন করলেন। দিল্লির ফিরুজ শাহকোটলায় আজও এটি দেখা যায়। প্রাসাদের অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়, দেয়াল ভেঙে পড়েছে, গাঁথনি খসে গেছে—কিন্তু যে পালিশ দেখে ফিরুজ একদিন মোহিত হয়েছিলেন, সে পালিশ আজও মলিন হয়নি। মীরাট থেকে ফিরুজ এমন আর একটি স্তম্ভ দিল্লিতে এনেছিলেন এবং মৃগয়াবাস বা কুশক-ই-শিকার-এর অদূরে একটি পাহাড়ের উপর এটি স্থাপন করেন। এটি ভেঙে পাঁচ টুকরো হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬৭ সালে আবার ভাঙা টুকরোগুলি জুড়ে আগের জায়গায় খাড়া করা হয়েছে।

এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করে সুলতান স্তম্ভ দুটি দিল্লিতে আনলেন। কিন্তু এদের আসল পরিচয় তিনি আদৌ জানতে পারলেন না। আফিফ্ লিখেছেন যে, হিন্দু প্রজারা তাঁকে বলেছিল, স্তম্ভ দুটি পাণ্ডবদের আমল থেকে ঐস্থানে দাঁড়িয়েছিল এবং পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে শ্রেষ্ঠদেহী বীর ভীমসেন নাকি গরু চরাবার সময় স্তম্ভ-দুটিকে লাঠির মত ব্যবহার করতেন। মিনার-ই-জারিন বা সোনালি স্তম্ভের উপর খোদিত লিপি পাঠ করে দেবার জন্য ফিরুজ তাঁর দরবারে হিন্দু পণ্ডিতদের আহ্বান করেছিলেন। এঁরা নানা তর্কবিতর্ক করলেন, আকাশ জুড়ে নস্য উড়িয়ে পাণ্ডিত্যের বহর দেখালেন—কিন্তু শিলালিপির ভাষা পড়তে পারলেন না। অবশেষে বেগতিক দেখে সুলতানকে খুশি করার জন্য তাঁরা এমন কিছু উদ্ভট মনগড়া কথা বলে থাকবেন, যা ফিরুজের মত খোশামোদ-প্রিয় সুলতানও বিশ্বাস করতে পারেননি।



অশোককুমার সিংহ শাহ্ রোহিলা

ফিরুজের মৃত্যুর অব্যবহিতকাল পরেই তৈমুর ভারত আক্রমণ করলেন এবং এই আক্রমণের ফলে দিল্লির সুলতানি শাসনের অবসান ঘনিয়ে এল। দিল্লি অধিকার করার পর তৈমুর রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রত্নকীর্তিসমূহ দর্শন করেন। ফিরুজ-কর্তৃক স্থাপিত স্তম্ভদুটি বিশেষভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি এই দুটিকে অতি বিস্ময়কর নিদর্শনরূপে বর্ণনা করেন। তৈমুরের পর দীর্ঘ তিন শতাব্দী কাল স্তম্ভ সম্বন্ধে কেউ আর মাথা ঘামায়নি। বলা বাহুল্য, এগুলি যে অশোক-কর্তৃক নির্মিত, এ তথ্য মুসলমান রাজাদের কাছে চিরকালের জন্য অজ্ঞাত থেকে যায়। সপ্তদশ শতক থেকেই অশোকের কীর্তির দিকে ইউরোপীয় দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাদের উৎসাহ ও আগ্রহে কালক্রমে অশোকের কীর্তি ও ইতিহাস উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু তাদের এ বিষয়ে দীর্ঘকাল অন্ধকারে হাতড়াতে হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে কোয়েনট টম কোরিয়েট তোপরা থেকে আনা দিল্লির প্রস্তর স্তম্ভটিকে পিতলের তৈরি বলে ভুল করেছিলেন। স্তম্ভগাত্রের মসৃণতা ও চাকচিক্যই এই ভ্রান্তির কারণ। উনবিংশ শতকের গোড়াতে বিশপ হিবার এটিকে ঢালাই-করা ধাতুর তৈরি বলে বর্ণনা করেন। আসলে উনবিংশ শতক থেকে ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকরা অশোকের ইতিহাস উদ্ধারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। অন্তত ১৮০৪ সাল থেকে বর্তমান সময় অবধি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মহীশূর এবং ভারতের বাইরে কান্দাহার থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে পর্বত ও স্তম্ভগাত্রে কিংবা শিলাফলকে খোদিত অশোকের বহু লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। বহু প্রয়াসের পর ১৮৩৭ সালে ইংরাজ পণ্ডিত জেমস প্রিনসেপ শিলাগাত্রের মূকলিপি থেকে অশোকের বাণী উদ্ধার করতে সমর্থ হন।

উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ যুবক জেমস্ প্রিনসেপ্ (১৭৯৯-১৮৪০) কলকাতায় অবস্থিত মিন্টে অ্যাসিসট্যান্ট অ্যাসে-মাস্টারের পদে যোগ দেন। সেই সময়ে মিন্টের কাজে তাঁর উপরওয়ালা ছিলেন বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ হোরেস হেম্যান উইলসন। উইলসনই প্রিনসেপকে ভারতবিদ্যাচর্চায় দীক্ষাদান করেন। প্রিনসেপ ভারতের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অসবর সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকতেন। ফিরুজ শাহকোটলার স্তম্ভগাত্রে যেরকম অক্ষর খোদিত ছিল, ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সেই রকম অক্ষরে লেখা আরও অনেক উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান পাওয়া যায়। সাঁচীর প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রিনসেপ কতকগুলি ছোট ছোট লিপি দেখেছিলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন, এক-এক লাইনের এক-একটি লিপি। এগুলি কি কোন বড় শিলালিপির বিভিন্ন অংশ, না এক-একটি সম্পূর্ণ লিপি, তা তাঁর জানা ছিল না। তিনি ধরে নিলেন যে, সম্ভবত এক-এক লাইনেই এক-একটি শিলালিপি সমাপ্ত হয়েছে। তারপর তিনি লক্ষ করে দেখলেন যে, প্রত্যেক শিলালিপিরই শেষের দুই অক্ষর এক রকমের। এ দুটি অক্ষরের পরিচয় পেলে প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারের একটা উপায় হতে পারে। দুই অক্ষরে কিসের কথা

লেখা থাকতে পারে, দানের না মৃত্যুর? হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, ব্রহ্মদেশে এক-একটা বড় বৌদ্ধ মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভিন্ন-ভিন্ন লোক ছোট-ছোট চৈত্য নির্মাণ করে, ধ্বজা স্থাপন করে—আর ভগবান বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। ধ্বজায় ভক্ত দাতার নাম ও দানের কথা লেখা থাকে। এখানেও কি এরকম হওয়া সম্ভব? তা হলে শেষের দুই অক্ষর 'দ' ও 'ন'। এইভাবে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির দুটি অক্ষরের পরিচয় পাওয়া গেল। এরপর প্রিনসেপ অনুমান করে নিলেন শিলালিপির শেষদুটি অক্ষরের আগের অক্ষরটি 'স'। তিনটি অক্ষরের ধ্বনিগুণ জানা গেল এবং এদের সাহায্যে তিনি বাকি সব অক্ষর, স্বরবর্ণের চিহ্ন, যুক্তাক্ষর সমস্তই ঠিক ঠিক পড়ে ফেললেন। এইভাবে সাঁচীর দানলিপির পাঠোদ্ধার হল। এবার তিনি দিল্লি-তোপরার স্তম্ভলিপিও পড়ে ফেললেন। দেখা গেল, এই লিপির গোড়াতেই আছে 'দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী' নামক অজানা এক রাজার নাম। কাব্যে ও পুরাণে 'প্রিয়দর্শী' বলে কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। তাই ইনিই যে মৌর্যসম্রাট অশোক, তা সহজে প্রমাণ করা গেল না। কে এই রাজা, যিনি মগধের অধিপতি ছিলেন ও পাটলিপুত্র যাঁর রাজধানী ছিল? প্রিনসেপের জীবদ্দশায় এই প্রশ্নের সদুত্তর মেলেনি। মাত্র সেদিন, অর্থাৎ ১৯১৫ সালে মহীশূরের অন্তর্গত রায়চুর জেলার মস্‌কি গ্রামের অদূরে এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হল। এই লিপির প্রারম্ভেই 'দেবানাং প্রিয় অশোকস' এই পদ পাওয়া গেল। এই অনুশাসনটিই আমাদের সকল সন্দেহ নিরসন করে প্রমাণ করেছে যে, 'দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী' এবং 'দেবানাং প্রিয় অশোক' একই ব্যক্তি ছিলেন।

---

# পিরামিডের রহস্য ও পেট্রি

পুরাকালে এক গ্রিক পণ্ডিত পৃথিবীর সাতটি পরমাশ্চর্য বস্তুর এক তালিকা নির্মাণ করেন। তাঁর সেই তালিকায় প্রথম নামটিই ছিল মিশরের পিরামিড। খুব আশ্চর্যের কথা, আজ এই পিরামিড ছাড়া অপর ছ'টি বিস্ময় কালের অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে। পৃথিবীর প্রথম আশ্চর্য, পিরামিডই কেবল কালজয়ী স্থাপত্য-চিহ্ন হিসাবে আজও ধরাপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে আছে।

কায়রো শহরের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে গিজাতে যে তিনটি পিরামিড অবস্থিত, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সম্রাট খুফুর পিরামিড—গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস যার নামকরণ করেছিলেন, পিরামিড অব চিয়প্স্। তাঁর ভাষায় এটি ফ্যারাও-নির্মিত পাথরের পাহাড়—যার উচ্চতা প্রায় ৫০০ ফুট। এক লক্ষ ক্রীতদাস অমানুষিক পরিশ্রম করে ২০ বছরে এটি নির্মাণ করে। এই বিরাট ক্রীতদাস-বাহিনীকে কাজে লাগাতে ফ্যারাও-এর লোকেরা কঠোর নির্যাতনের সাহায্য নিয়েছিলেন। বিরাট বিরাট চাঁই ক্রেনের সাহায্য ছাড়াই, এরা পিরামিড পর্যন্ত বয়ে আনত এবং কাজে সামান্য শিথিলতা দেখালে রাজপরিদর্শকদের চাবুকের ঘায়ে তাদের পিঠের চামড়া জর্জরিত হত। তাই যত বিরাট ও বিস্ময়করই হোক না কেন, পিরামিড সৃষ্টির মর্মমূলে আছে হতভাগ্য দাস-শ্রেণীর রক্তধারা, স্বেদবিন্দু ও অশ্রুজল। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, হেরোডোটাসের এই বর্ণনা বাস্তবানুগ নয়। ৪র্থ রাজবংশের আমলে (খ্রিঃ পূঃ ২৬০০-২৫০০) ক্রীতদাস প্রথা হয়ত অজ্ঞাত ছিল না—কিন্তু ফ্যারাও-রা কখনই অত নিষ্ঠুর ছিলেন না। খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতকে গ্রিসে ক্রীতদাসদের প্রতি যে নির্দয় ব্যবহার করা হত হেরোডোটাস তারই প্রতিচ্ছবি দেখেছেন মিশরে, যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। অ্যাসিরীয় ভাস্কর্যে, আনুমানিক ৭০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দের একটি চিত্র আছে—যাতে দেখা যাচ্ছে বেত্রহস্তে রাজ-পরিদর্শক নির্মমভাবে ক্রীতদাসকে শাসন করছে। মিশরে কিন্তু এমন একটিও দেয়ালচিত্র নেই যেখানে অনুরূপ কোন অত্যাচারের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। বরং এই কথাই ঠিক যে, পিরামিড-নির্মাতা অসংখ্য কুলিমজুর সানন্দে দৈহিক ক্লেশকে মেনে নিয়েছিল, এবং আজও যেমন তারা করে থাকে—মনের আনন্দে গান গেয়ে ভারী ভারী পাথর টেনেছিল—কঠোর পরিশ্রমে শরীর নত হলেও, মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি। লেনার্ড কট্রেল-এর প্রশ্ন : কোন মহৎ সৃষ্টির মূলে যদি প্রাণের আনন্দই না থাকবে, তবে তা কালজয়ী শিল্পতীর্থে পরিণত হল কেমন করে? অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আরব লেখকরা পিরামিড সম্পর্কে অনেক খবর দিয়েছেন। তাঁদের বর্ণনা পড়ে জানা যায় যে, পিরামিডের অঙ্গে শ্বেতপাথরের একটি উজ্জ্বল আস্তরণ ছিল। মরুভূমির

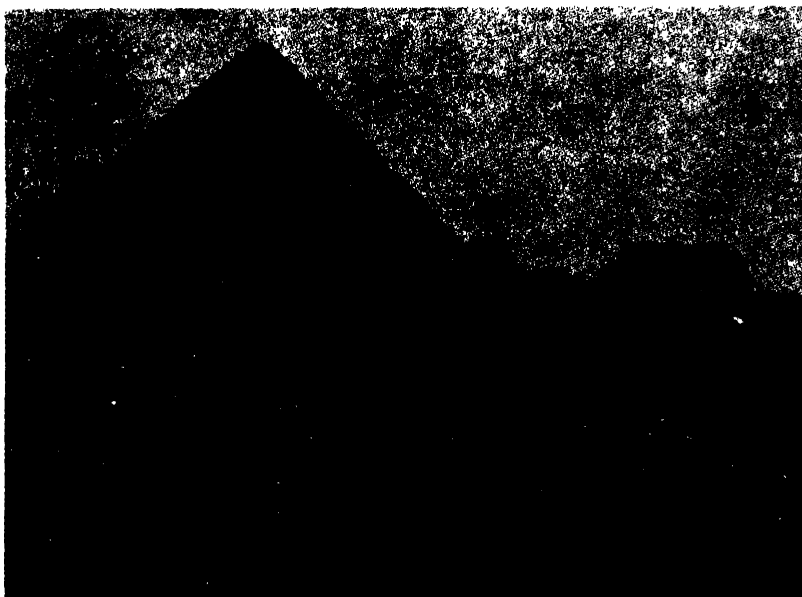
ব্রাহ্মীলিপির নমুনা—লুম্বিনী স্তম্ভে উৎকীর্ণ

ধূসর কার্পেটের ওপর ত্রিভূজাকৃতি পিরামিডের আয়নায় সূর্যালোক পড়লে বহুদূর পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হত সেই আলোকরশ্মি। শ্বেতপাথরের অঙ্গাবরণে অসংখ্য হাররোগ্লিফিক লিপি উৎকীর্ণ ছিল। আরব ঐতিহাসিক আবদুল লতিফ লিখেছেন, এত অসংখ্য চিত্রলেখ খাতায় তুলতে গেলে নিশ্চয়ই ছ'হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে যাবে। এটি অতিশয়োক্তি সন্দেহ নেই; কিন্তু হায়রোগ্লিফিক লিপির এই বিচিত্র সমারোহ—আজ যার কোন অস্তিত্ব নেই; কোন্ ঐতিহাসিকের মনকে না উতলা করে তোলে? কেমন করে এই দুর্মূল্য প্রস্তরাচ্ছাদনটি নষ্ট হল তার ইতিহাস বড় করুণ। লতিফ মিশর ত্যাগ করে যাবার কিছুদিনের মধ্যে কায়রো শহরে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়, যার ফলে অনেক অট্টালিকা-ইমারত, মসজিদ-মকতব ভেঙে পড়ে। আরব-অধিবাসীরা ভাঙা বাড়িগুলিকে পুনরায় সারিয়ে তোলার জন্য পিরামিডের প্রস্তরাচ্ছাদনটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে নিজেদের কাজে লাগায়। একই ব্যাপার ঘটেছিল, এথেন্সের পার্থেননের ক্ষেত্রে, যখন গ্রিক ও তুর্কিরা অপূর্ব শিল্পশোভামণ্ডিত শ্বেতপাথর ভেঙে নিয়ে যায় নিজেদের ঘরবাড়ি তৈরি করবে বলে। আরব লেখক আল্ মুরতাদির মতে, পিরামিডে ভূতপ্রেত, দৈত্যদানার বাস ছিল। এখানে প্রায়ই এক পরমাসুন্দরী রমণীকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত—যার এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, দেখামাত্র তাকে অনুসরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। বহু ঘোরাঘুরির পর অনুসরণকারী ব্যক্তি মরুভূমির মধ্যে প্রাণ হারাত। আরবদের আমলেই পিরামিডের চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ঘটে। খালিফ মামুন ভাবলেন, পিরামিডের অভ্যন্তরে পুরাকালের কোন রাজার গুপ্তধন লুকানো আছে। ভিতরের রহস্য জানবার জন্য তিনি পিরামিড গাত্রে একটি গর্ত করে বিরাট এক লৌহ-শলাকা চালিয়ে দেন। কিন্তু ধনরত্ন সোনাদানা কিছুই তাঁর হাতে এলো না, গর্তের মধ্যে পিরামিডে ঢুকে তাঁর লোকেরা শুধুই হয়রাণ হল।

আধুনিক যুগেও পিরামিড নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না। এক ফরাসি আর্কিটেক্ট্ (যিনি মিশর-অভিযানে নেপোলিয়নের সঙ্গী হয়েছিলেন) লিখেছেন, পিরামিড অব চিয়পস হচ্ছে এমন এক ফ্যারাও-এর সমাধি যিনি লোহিতসাগরে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারান। সমুদ্রে দেহটি বিলীন হওয়ায় দেশবাসী সম্রাটের মৃতদেহটির কোন সন্ধান পেল না। মৃতের সম্মানার্থে তারা এমন এক সমাধি-মন্দির নির্মাণ করল, যার গর্ভগৃহে শবাধারটি চিরদিনের মত শূন্য। কেউ আবার এমন কথাও বললেন, যাকে এতদিন রাজসমাধি মনে করা হয়েছে, সেটি আদৌ তা নয়। হয় শস্যভাণ্ডার, না হয় মানমন্দির। জর্জ টেইলর ও পিয়াজি স্মিথের মত পণ্ডিতরা আরও এক পা অগ্রসর হলেন। স্মিথ স্কটল্যান্ডের অধিবাসী, এডিনবরায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি নিজে বিজ্ঞানী হয়েও বললেন, পিরামিড নির্মাণের অন্তরালে এক বিরাট বিস্ময় লুকিয়ে আছে। প্রাচীন মিশরীয়েরা এর সূক্ষ্ম মাপজোখের মধ্যে এমন সব গূঢ় তত্ত্ব লুকিয়ে রেখে গেছে, যেগুলি জানতে পারলে পৃথিবীর ভূত-ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত অনেক রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। এমন কি বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে নক্ষত্রের অবস্থান, সূর্য-চন্দ্রের

গতি-প্রকৃতি সবই মানুষের জ্ঞানগোচর হবে। এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-প্রদত্ত এমন অতিপ্রাকৃত ব্যাখায় বহু লোকের মন আকৃষ্ট হল। এঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রত্নতাত্ত্বিক ফ্লিনডারস পেট্রির পিতা উইলিয়ম প্রেট্রি—যিনি ছিলেন সে যুগের এক নামকরা বৈজ্ঞানিক।

যিনি ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ প্রত্নবিদ হিসেবে পৃথিবীতে বরেণ্য হলেন, বাল্যকালে তিনি স্কুলে গিয়ে অন্যান্য ছেলেদের মত পড়াশুনার সুযোগ পাননি। ছোটবেলায় প্রায়ই নানা অসুখে ভুগতেন ফ্লিনডারস পেট্রি, দেখতেও ছিলেন ছোটখাট। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য বাড়িতেই বাবা-মার তত্ত্বাবধানে তাঁর পড়াশুনা শুরু হয়। এটা বিধাতার আশীর্বাদ। কেননা, পিতা যেমন পণ্ডিত, মাও তেমনি অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্না মহিলা। এঁরা তাঁদের আদরের পুত্রটিকে যে শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন, সে শিক্ষা ইংলন্ডের কোন পাবলিক স্কুলে পাওয়া যায় না। সাধারণত দেখা যায় যাঁরা প্রত্নতত্ত্বে অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেন, তাঁরা বিশেষ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যেমন, শাঁপলিয়ঁ বা স্লীম্যান। ফ্লিনডারস পেট্রিও এঁদের সমগোত্রীয় শিশু প্রডিজি। শৈশবে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁর অসাধারণ ঝোঁক দেখে অনেকেই বিস্মিত হতেন। অতি অল্প বয়সে অনেক দুরূহ অঙ্ক তিনি নির্ভুল কষে দিতে পারতেন। বিশেষ করে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যৌবনে পদার্পণ করে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হল। ক্ষীণকায় পড়ুয়া ছেলেটি সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী হয়েছিল। ইংলন্ডের দক্ষিণাঞ্চলে যত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অট্টালিকা ও চার্চ আছে সেগুলি পদব্রজে ঘুরে-ঘুরে দেখে আসেন—তাদের মাপজোক নিয়ে পড়াশুনা করেন। স্টোনহেনজে ব্রোঞ্জ যুগের যে প্রস্তর-বলয় আছে সে সম্পর্কে তিনি নিবন্ধও রচনা করেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম বই 'ইনডাকটিভ মেট্রোলজি' লেখেন। এই বই ছাপা হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ইংলন্ডের সুধী-সমাজ এই নবীন লেখকের পরিচয় জানার জন্য উদগ্রীব হল। বইটি হচ্ছে সেই জাতীয় বই যা প্রকাশিত হলে বিষয়বস্তুর আমূল পরিবর্তন ঘটে—প্রচলিত বহু ধারণার বজ্র-আঁটন শিথিল হয়। এতদিন ঐতিহাসিকদের কাছে একমাত্র মূল্যবান উপাদান ছিল লিখিত বিবরণ—পেট্রি ঐতিহাসিককে লিখিত বিবরণের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলেন। তিনি তাঁকে শেখালেন ভূ-পৃষ্ঠের স্তর থেকে কিভাবে অতীতের স্বাক্ষর চিনতে হয়। পিতা উইলিয়ম পেট্রি পিরামিড সম্পর্কে পিয়াজি স্মিথের মতামত পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা, পুত্র মিশরে গিয়ে ফ্যারাওদের এই সুমহান কীর্তি স্বচক্ষে দেখে আসুক এবং স্মিথের মতামতকে সমর্থন করুক। কিন্তু ফল হল উল্টো। কেননা ১৮৯১ সনে মিশরে পদার্পণ করে ফ্লিনডারস পেট্রির প্রথম কাজ হল সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেওয়া যে, স্মিথের ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এমন কি পিরামিডের মাপ সম্পর্কে তিনি যে সব হিসেব দেখিয়েছিলেন তাও ভ্রান্ত। পরবর্তীকালে পেট্রির ছাত্ররা পিরামিড সম্পর্কে যারা উদ্ভট ধারণা পোষণ করে তাদের নাম দিয়েছিল, পিরামিডিয়টস। পেট্রির বয়স তখন মাত্র ছাব্বিশ। কায়রো শহরের বিলাসবহুল ও ব্যয়সাধ্য



*গিজার পিরামিড*

বড় হোটেলে না থেকে তিনি সরাসরি চলে আসেন গিজা শহরের উপকণ্ঠে—যেখানে বাসস্থানের অভাবে তিনি একটি শূন্য সমাধি-মন্দিরে বসবাস শুরু করে দেন। বাস করেন একটানা চার মাস। পেট্রি নিজের চেষ্টায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক জগতে প্রবেশ করেছিলেন; সেখানে পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি কাউকেই পাননি। একক চেষ্টায় অসাধ্য সাধন করলেন তিনি। সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পিরামিডের জরিপ-কার্য তিনিই সমাধা করলেন। যে আমলে যন্ত্রপাতি উন্নত ধরনের ছিল না, সে আমলে এত নির্ভুল মাপজোক আমরা কল্পনাই করতে পারি না। শৌখীন প্রত্নতাত্ত্বিক ও কিউরিও ব্যবসায়ীরা যেভাবে যথেচ্ছাচার চালিয়েছিল তার ফলেই মিশরের প্রত্নক্ষেত্রে ঘোর দুর্দিন নেমে আসে। পেট্রি এসে দেখলেন, তাঁর অনুসন্ধান-কাজে যথেষ্ট বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এরা। কিউরিও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা যেখানে খুশি, যেমন খুশি কোদাল চালিয়েছিল। যখন যা পেয়েছে আত্মসাৎ করেছে—পণ্ডিতদের হাতে তুলে দেয়নি পরীক্ষার জন্য। বহু প্রাচীন নিদর্শন এমনিভাবে অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। এরা অত্যন্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, কোন্ ভূমিস্তরে প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তার কোন হিসেব রাখত না তারা। উপরন্তু বহু স্থান খুঁড়ে মাটি-পাথর সরিয়ে ভূস্তরের ক্রম ছিন্নভিন্ন ও ওলটপালট করে দিত। পেট্রি লিখেছেন, 'একবছর কাজ করে বুঝলাম, মিশরের প্রত্নভাণ্ডারে যে হারে চুরি-ডাকাতি শুরু হয়েছে, তাতে বছরখানেকের মধ্যেই এদেশের যাবতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন লোপ পেয়ে যাবে। এ এক অতি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। বাড়িতে যখন আগুন লাগে তখন কি গৃহস্থ মাথা ঠিক রাখতে পারেন? আমার তো মনে হয় মিশরে আগুন লেগেছে। যা পারা যায়, সামান্য টুকিটাকিও যদি আগুনের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচিয়ে আনতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতের কাছে আমাদের জবাবদিহি করার উপায় থাকবে।'

পেট্রি সম্বন্ধে নানা কাহিনী গড়ে উঠেছে যার জন্মদাতা হলেন তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ ছাত্ররা। তিনি অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। সপ্তাহ শেষে কুলিদের বেতন সংগ্রহ করতে নিয়মিত তিনি মরুভূমির মধ্য দিয়ে ১০/১২ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে শহরে গিয়ে উপস্থিত হতেন। কেউ কোনদিন শোনেনি তিনি ক্লান্ত হয়েছেন, অথবা অসুস্থ হয়েছেন দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে। তাঁর অধীনে যে অতি দরিদ্র ও অর্ধভুক্ত লোকেরা দিনের পর দিন মাটি কেটে চলেছে তাদের প্রতি তাঁর মায়া-মমতার শেষ ছিল না। মাঠে কাজ করতে নেমে পেট্রি কোনদিন বাড়ির আরাম প্রত্যাশা করেননি। যদিও এক সুযোগ্য ভৃত্য তাঁর নিত্য সহচর ছিল, তবু কোনদিন রান্নাবান্নার পাট রাখেননি তাঁর ক্যাম্পে। তাঁর টেবিলে নানা ধরনের টিন ফুড সাজানো থাকত—কাজের ফাঁকে-ফাঁকে যখন যেমন ইচ্ছা টিন খুলে কিছু খেয়ে নিতেন। কখনও-বা একটা টিনের খাদ্য দু'তিন দিন ধরে খেতেন। দারুণ গরমে ভোজ্যবস্তু যে নষ্ট হয়ে যাবে, বা খোলা টিনে পোকামাকড়-মাছি ইত্যাদি বসবে, এসব চিন্তা তাঁর মাথায় আসত না। একবার তাঁর দুই ছাত্র গুরুদেবকে

অনুকরণ করতে গিয়ে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে প্রায় মরতে বসেছিল। আত্মভোলা কাজপাগল প্রত্নতাত্ত্বিক কিভাবে কাজ করতেন, তার একটি চিত্র পাওযা যাবে তাঁর রোজনামচার একটি পাতা পড়লে।

'প্রত্যুষে প্রাতঃরাশ সেরে, প্রিয় ভৃত্য আলি গাবরির সঙ্গে আমি পিরামিড দর্শনে বেরুলাম। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। তাই দেখি, পিরামিডের পাদদেশে সিঁড়ির একধারে বেশ খানিকটা জল জমেছে। ভিতরে ঢুকে আমি রাজা ও রানীর কক্ষ, প্রশস্ত অলিন্দ সবই খুঁটিয়ে দেখলাম। তারপর শুরু হল মাপজোকের কাজ। পাথরের জয়েন্ট, অ্যান্টি চেমবার, গ্যালারির উত্তরের দেয়াল—কিছুই আমার নজর এড়াল না। এরই মধ্যে দেখি পালা করে তিন দল দর্শক এলো গেলো। নির্বোধ দর্শকরা অর্থহীন দৃষ্টি নিয়ে সবকিছু দেখতে চায়। ভিতরে যেখানে সূর্যালোক পৌঁছয় না সেখানে ঘোর অন্ধকার। তাই তারা মশাল জ্বালল। ধোঁয়ায় সালফারের গন্ধ—তাতে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। আমি দূরে সরে প্রাণ বাঁচালাম। কিন্তু বেচারি আলি কাশতে শুরু করল। এদিকে বেলা যতই গড়াচ্ছে, দিনের তাপমাত্রাও বেড়ে চলেছে। একদিকে বাদুড়-চামচিকের বাস। বিশ্রী গন্ধে বমি এসে যায় আর কি! ইতিমধ্যে আলি দুপুরের নমাজ পড়তে গেল। আমি অত্যন্ত গরম বোধ করছিলাম ভিতরের বদ্ধ আবহাওয়ায়। তাই প্রথমে ভারি কোটটা খুলে ফেললাম। তাতে শরীর সুস্থ হল—আরামও বোধ করলাম। এরপর একে একে অন্য পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হলাম এবং দ্বিগুণ দ্রুতগতিতে কাজ করে গেলাম। আলিকে বিদায় দিয়েছি। এবার নিরিবিলি একাই কাজ করি। কাজ চলে সারা রাত ধরে।'

মিশর-শাস্ত্রী পেট্রির প্রত্ন-গবেষণার সবচেয়ে বড় অবদান হল, ভাঙা মৃৎপাত্রের সাহায্যে মিশরের প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি সময়পঞ্জি নির্ধারণ করা। তিনি তাঁর নতুন পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন, 'সিকুয়েনস ডেটিং'। যে যুগে সঠিক সময় নিরূপণের জন্য 'কারবন ফোরটিন টেস্ট' অজ্ঞাত ছিল, সে যুগে পেট্রি-প্রদর্শিত রীতির অনুসরণ করে অনেক রহস্যের সমাধান হয়েছে। মেসোপটেমিয়ায় টেল বা ঢিবির স্তর পরীক্ষা করে সময়ের নির্দিষ্ট সীমারেখায় পৌঁছানো সম্ভব। মিশরে কিন্তু এ ধরনের কোন ঢিবির সন্ধান পাননি পেট্রি। তার পরিবর্তে তিনি পেলেন প্রায় সাতশটি অতি প্রাচীন কবর। এগুলির মধ্যে যে হাড়গোড় ছিল তা থেকে তিনি কোন সময়ের হিসেব পেলেন না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পেলেন অসংখ্য খোলামকুচি বা ভাঙা মৃৎপাত্রের টুকরো। এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য, এদের ধ্বংস নেই। ভেঙে যতই টুকরো টুকরো হোক না কেন, তারা নিঃশেষিত হয় না। নানা বর্ণের ও নানা আকৃতির মৃৎপাত্র পেট্রির পরীক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ৭০০টি সমাধি থেকে তিনি প্রধানত ৯ ধরনের মৃৎপাত্র পেয়েছিলেন। গঠন-প্রকৃতি, অঙ্গসৌষ্ঠব ও শিল্পরীতি অনুযায়ী তাদের কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করে আলাদা আলাদা সূচক-সংখ্যা বা ইনডেকস্ নম্বর বসিয়ে দিলেন—তারপর তুলনামূলক বিচারে দেখতে চেষ্টা করলেন,

কোনটি আগে বা পরে। পেট্রির মতে, প্রথম যুগে মানুষ এই পাত্রগুলিকে ব্যবহারের উপযোগী সাদামাটা ধরনের তৈরি করে নেয়। নকসা ও কারুকার্যের প্রশ্ন আসে অনেক পরে। নিছক কার্যকারিতাগুণ হারিয়ে পাত্রগুলি তখন শিল্পশোভায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দেয়। পেট্রি দেখলেন, মৃৎপাত্রগুলি আগে ছিল গোলাকৃতি, পরে হয়ে গেল সরু ও ছুঁচলো। ভাঙা পাত্র ও খোলামকুচির প্রেমে পড়েছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক। তিনি সর্বদা এগুলিকে মিলিয়ে দেখতেন, তুলনামূলক বিচারে পরীক্ষা করে দেখতেন তা থেকে অতীত সংস্কৃতির লুপ্ত ধারাটি সম্পর্কে কোন আলোকপাত হয় কিনা। কর্মরত অধ্যাপককে ছাত্ররা দেখেছে কি গভীর মনোযোগ সহকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা লম্বা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে এই কাজ করে যাচ্ছেন। টেবিলে অজস্র নিদর্শন ছড়ানো—তাতে নানা ধরনের নম্বর ও লেবেল আঁটা। পেট্রি কখনো টেবিলের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন নম্বর মিলিয়ে দেখছেন—আবার পরমুহূর্তে ছুটে আসছেন অন্য প্রান্তে, হাতে তাঁর অন্য একটা নম্বরের স্লিপ। এমন কাণ্ড দেখে মনে হত, সামনে চৌষট্টি ব্যঞ্জনের বিপুল আয়োজন ছড়ানো—ভোজনরসিক সব পাত্র থেকে একটু-একটু চেখে দেখছেন যেন। পেট্রি মিশরের প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে কাল নির্ণয় করেন, তাতে বিশেষ অব্দের কোন সন তারিখ নেই—আছে শুধু সংস্কৃতির পূর্বাপর বিচারের চেষ্টা।

এতদিন যে শাস্ত্রটি গুপ্তধন অন্বেষণের সামিল ছিল, পেট্রির চেষ্টায় তা বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করল। উৎখননের যে মূল নীতি তিনি অনুসরণ করেন, তা আজ পৃথিবীর সুধী-সমাজে একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নীলনদের ব-দ্বীপ থেকে নিউবিয়ার পাহাড়ি অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং পিরামিড ছাড়া ফাইয়ুম্, টেল-এল-আমার্না, নাকাদা, এবিডস্ প্রভৃতি স্থানে তাঁর কীর্তিস্তম্ভ প্রোথিত আছে। ১৮৯৩ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশর-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তারপর একাদিক্রমে ৪০ বছর অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁর লেখা পুস্তকের সংখ্যাই শতাধিক। তিনি এক হাতে পুরাবস্তুকে মাটি খুঁড়ে তুলেছেন—অন্য হাতে সেই বস্তুর পরিচয় ও ব্যাখ্যা লিখেছেন পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধে। ১৯৩৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেবার পর তিনি প্যালেস্টাইনে আসেন খননকার্য চালাবেন বলে। জেরুজালেম শহরে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে নব্বই বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

---

# মিশর দেশের কবর-চোরদের কথা

মৃত্যুতেই যে মানুষের সবকিছু শেষ হয়ে যায়, প্রাচীন মিশরীয়রা তা কোনদিনই বিশ্বাস করত না। তারা ভাবত যে, পশ্চিম দিগন্তের যেখানে প্রতিদিন সূর্যদেব অস্ত যান, সেখানে আছে মৃতের রাজ্য বা কিংডম অব দ্য ডেড। দিনের শেষে ক্লান্ত রবি যেমন অস্তাচলে নেমে আসেন বিশ্রামের আশায়, তেমনি মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা শান্তির নীড়, এই পরম ঈপ্সিত লোকে এসে পৌঁছয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের মত মিশরীয়রাও বিশ্বাস করত আত্মা অবিনাশী—এবং আত্মার একটি সঞ্জীবনী শক্তি আছে, যা তাকে সবরকম অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে। মৃত্যুর পর মুক্ত আত্মা (মিশরীয় ভাষায় 'বা') দেহপিঞ্জর থেকে ছাড়া পাবার পর মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তখনই সে চায় পুনরায় তার ত্যক্ত জীর্ণ দেহটির মধ্যে ঢুকে বিশ্রাম নিতে। মিশরীয়রা তাই আত্মার বিশ্রামের আধার দেহটিকে বিনষ্ট হতে না দিয়ে তাকে চিরন্তনভাবে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 'ম্যমি' তৈরি করেছিল এবং ম্যমিকে রক্ষা করার জন্য গড়ে তুলেছিল বিরাটাকার পিরামিড। যে স্থানে ম্যমিকে রাখা হত তার নিকটেই থাকত খাদ্য-পানীয়, তৈজসপত্র ও নানা প্রসাধন সামগ্রী—যা মৃতব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য ছিল। কেবলমাত্র রাজা-মহারাজা ও আমীর-ওমরাহরাই নতুন ঐশ্বর্য-ব্যয়ে ম্যমি ও মর্মর শবাধার নির্মাণ করাতে পারতেন। এত অর্থ ব্যয় করা সর্বসাধারণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল—তাই মৃত্যুর পর নীলনদের বালুকারাশিতে নিতান্ত অনাড়ম্বরভাবে তাদের সমাধি দেওয়া হত। সৌভাগ্যের বিষয়, নীলনদের বালি অপেক্ষাকৃত কম বীজাণুদুষ্ট হওয়াতে এবং শুষ্ক জলবায়ুর প্রভাবে এ ধরনের নিরাভরণ মৃতদেহ বালুকাশয্যায় দীর্ঘদিন টিকে থাকত।

অতুল ঐশ্বর্য-ব্যয়ে নির্মিত ও অপূর্ব কারুকার্যখচিত ফ্যারাওদের সমাধি-মন্দির চিরকাল মানুষের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। মৃত্যুর পর যাতে তাঁদের মরদেহের কোন ক্ষয়ক্ষতি বা অসম্মান না ঘটে, সে বিষয়ে প্রবল পরাক্রান্ত রাজারা সর্বদা সচেতন ছিলেন। তাই তাঁদের ম্যমির সঙ্গে সমাধিস্থ হত কুবেরের ঐশ্বর্য। বহুমূল্য রত্নময় অলঙ্কারাদি তাঁদের সঙ্গে শোভা পেত। মাথায় থাকত মণি-মুক্তাখচিত রাজমুকুট, হাতে সোনার ঢাল-তরোয়াল এবং সর্বোপরি পরলোকে অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাবিজ ও মাদুলি। সমাধি-মন্দিরের এই রত্নভাণ্ডার চিরকালই চোর-ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীদের প্রলুব্ধ করে এসেছে। এখানকার ধনদৌলতের সন্ধান পেয়ে তারা অবিরাম চেষ্টা চালিয়েছে, কি করে এগুলি অপহরণ করা যায়। তাদের বিচিত্র রহস্যঘন কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া গেছে ইতিহাসের প্রতি যুগেই।

মিশরের পার্বত্য অঞ্চলে নীলনদের পশ্চিম তীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত কারনাক ও লুকসর

মন্দিরের অদূরে থীবস-এর উপত্যকা। পাহাড়ে ঘেরা, জনমানবশূন্য ও দুর্গম এই উপত্যকাকে প্রত্নবিদরা নাম দিয়েছেন—'ভ্যালি অব কিংস'। পাহাড় কেটে, বিরাট বিরাট সমাধিকক্ষ তৈরি করে ফ্যারাওদের শেষ আশ্রয়স্থল এখানেই নির্মিত হয়েছিল। রাজারা হয়ত ভাবতেন, এমন নির্জন স্থানে কোন লোক তাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে আসবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে চোর-ডাকাতরা সম্পূর্ণভাবে তাদের শবাধার লুণ্ঠন করে নিয়েছে।

মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি প্রথম থুটমোস দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুর পর নিজের নশ্বর দেহটি কবর-চোরদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠবে এই ধারণা তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল। নিজের দেহটি রক্ষা করার জন্য তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। সমাধিক্ষেত্রের শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি একজন বিশ্বাসী রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর রাজ্যের প্রধান স্থপতি ও শিল্পী আইনেনিকে ডেকে তিনি দুটি নির্দেশ দেন। প্রথম, ফ্যারাওদের সমাধিসৌধ যতদূর সম্ভব আড়ম্বরহীন হবে—কেননা অধিক চাকচিক্য বা জাঁকজমক চোর-ডাকাতদের প্রলুব্ধ করে। দ্বিতীয়, শবাধার ও স্মৃতিসৌধ একই স্থানে অবস্থিত না হয়ে কিছু দূরে দূরে অবস্থিত হলে ফ্যারাওদের ম্যমি অনেকটা নিরাপদে থাকতে পারে। আইনেনির লেখা থেকে জানা যায় যে, থুটমোসের আদেশ অনুসারে তাঁর সমাধিকক্ষটি পর্বতশিখরে পাথর কেটে তিনি নিজেই নির্মাণ করেছেন। অন্য কেউ এই নির্মাণকার্য চোখে দেখেনি বা এর খবর কানে শোনেনি। বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নবিদ্ হাওয়ার্ড কারটার দীর্ঘদিন ভ্যালি অব কিংস-এ খননকার্য চালিয়েছেন। তাঁর মনে হয়, আইনেনি ছাড়াও থুটমোসের সমাধির নিশানা সম্ভবত আরও শতাধিক কুলি-মজুর জানত। এরা ছিল প্রধানত যুদ্ধবন্দী। মরদেহ পর্বতকন্দরে স্থাপিত হলে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রত্যক্ষদর্শী এই নিরীহ শ্রমিকদের হত্যা করা হয়। এটি অনুমান মাত্র—প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছু নেই।

নিজের মরদেহটি সম্বন্ধে থুটমোসের উৎকণ্ঠার ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল। অষ্টাদশ রাজবংশের সূচনাতেই দেখা যায়, 'ভ্যালি অব কিংস'-এ এমন একটিও রাজসমাধি নেই যেখানে চোর-ডাকাতরা হানা না দিয়েছে। তারা এ সময়ে দলবদ্ধভাবে তাদের দুষ্কার্য চালাতে থাকে। পাহারাদারদের সজাগ দৃষ্টি এড়াতে লুণ্ঠনকারীরা যেসব নিখুঁত ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করত তা দেখে আমরা বিস্মিত হই। অবশ্য তাদের কাজে যে মাঝে মধ্যে ভুলচুক ঘটত তারও প্রমাণ আছে। থুটমোসের প্রায় পাঁচশ বছর আগে মিশরের অধিপতি ছিলেন জের। তাঁর পত্নীর সমাধিমন্দিরটি বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল। এটি চোর-ডাকাতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং তারা একদিন সিঁদ কেটে ঢুকে এর ভিতরের অতুল ধনরাশি লুঠ করতে শুরু করে। সম্ভবত এই সময়ে কোনো পাহারাদার এসে পড়ে, যার ফলে কাজ শেষ না করেই এরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হয়। তাড়াহুড়োর

মধ্যে পালাবার সময় রানীর একটি কাটা হাত তারা শবাধারের পাশে একটা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রেখে পালায়। ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক পেট্রি যখন সেই ছিন্ন হস্তটি উদ্ধার করেন, তখনও তাতে বহুমূল্য একটি রত্নবলয় পরানো ছিল। এলরিকা নামক স্থানে দ্বাদশ রাজবংশের এক সমাধিসৌধ খুঁজতে গিয়ে এক দুর্ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। দেখা যায়, এক কবরচোর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে। যখন সে লুণ্ঠন-কাজে ব্যস্ত ছিল তখন তার মাথার উপর সমস্ত ছাদটাই ভেঙে পড়ে। তবে এরূপ দুর্ঘটনার দৃষ্টান্ত খুব বিরল। চোর-ডাকাতরা অসাধারণ ধূর্ত ও তৎপর ছিল—তারা অনায়াসে পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিতে পারত। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে রাজপুত্র নফ্রেমাতকে যেদিন সমাধিস্থ করা হয় সেইদিনই কবর-চোররা তার শবাধার উন্মোচন করে সমগ্র ধনরাশি লুণ্ঠন করে। টুটেনখামেনের মৃত্যুর পনেরো বছরের মধ্যেই তাঁর সমাধিমন্দিরে সিঁদেল চোররা ঢুকতে সক্ষম হয়েছিল—কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত যে কক্ষে তাঁর ম্যমি সজ্জিত ছিল—সেটির সন্ধান পায়নি। চতুর্থ থুটমোসের মৃত্যুর দু'একবছর পরই তাঁর মৃতদেহ অপবিত্র হয়। সমাধিমন্দিরের দেয়ালে কয়েকটি অশ্লীল কথা লিখে এবং শবাধারের গায়ে দু'একটি হিজিবিজি চিহ্ন বসিয়ে সিঁদেল চোররা তাদের 'ভিজিটিং কার্ড' রেখে গেছে—বিদেশের সংগ্রশালায় আজও তার সাক্ষ্য আমরা পাচ্ছি।

কবর-চোরদের কার্যকলাপ সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় পরবর্তী রামেসিসদের আমলে। প্রথম ও দ্বিতীয় রামেসিস এবং তাঁদের পর 'সেটি' গত হয়েছেন তখন। এঁদের বংশধররা ছিলেন নিতান্ত দুর্বল ও অপদার্থ। তাঁদের আমলে কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়ে—দেশ অরাজকতার বন্যায় ভেসে যায়। এই দুর্দিনে রাজকর্মচারীদের অসাধুতা ও নৈতিক অধঃপতন চরমে পৌঁছায়। এমন ঘটনা জানা গেছে যে, পশ্চিম থীবসের নগরপাল চোর-ডাকাতদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে অর্থের বিনিময়ে সমাধিক্ষেত্রের তথ্যাদি প্রকাশ করে দিয়েছেন। নবম রামেসিসের আমলের একটি দলিলে চোরদের দলপতিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তার উল্লেখ আছে। এর পূর্বে কবর-চোররা অজ্ঞাতনামা অপরাধকারী ও ঘোর অসামাজিক জীব বলে গণ্য হত। সরকারি দলিলে এখন তাদের নাম-ধাম-পেশার উল্লেখ থাকায় অনুমান হয় যে, এদের সামাজিক মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। এই সময়ে আরও আটজন কবর-চোর ধরা পড়ে। এদের পাঁচজনের নামের সঙ্গে পেশা বা জীবিকার উল্লেখ আছে এবং তা থেকে জানা যায়, এরা কেউ ছিল চাষী-মজুর, কেউ জলের ভারী, কেউবা পাথরকাটা কুলি অথবা সাধারণ ক্রীতদাস।

দ্বাদশ রাজবংশের সব রাজকর্মচারীরাই যে অসাধু ছিল এমন কথা মনে করা ভুল। সে যুগে এমন রাজভক্ত কর্মচারীও ছিল, যারা প্রাণের বিনিময়েও কবর-চোরদের ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করত। এরা পুরোহিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলত

এবং ফ্যারাওদের অন্তিমশয়ন যাতে নিরুপদ্রব হয় সেই উদ্দেশ্যে মশাল জ্বেলে গভীর রাত্রে সমাধিক্ষেত্র পাহারা দিত। তেমন প্রয়োজন উপস্থিত হলে পুরোহিতদের নির্দেশে এরা ফ্যারাওদের মর্মর শবাধার একস্থান থেকে অন্য আর কোন দুর্গম স্থানে রাতারাতি সরিয়ে ফেলত।

'ভ্যালি অব কিংস'-এর এক নির্জন প্রান্তে কয়েকজন ফ্যারাও প্রায় হাজার তিনেক বছর শান্তিতে নিদ্রা দিতে পেরেছিলেন। একবার বহু বছর পূর্বে কবর-চোরেরা এখানকার এক সমাধির প্রবেশপথ খুঁজে পায়। কিন্তু তারপরই সম্ভবত প্রবল বারিপাতের ফলে ঐ প্রবেশপথটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যায়—হাজার চেষ্টা করেও চোরেরা আর সেই পথের নিশানা খুঁজে পায়নি। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ঠিক যেভাবে ফ্যারওদের এই সমাধিক্ষেত্রটি পুনরায় আবিষ্কৃত হল তা এক রোমাঞ্চ-কাহিনী-বিশেষ। ১৮৮১ সালে এক ধনী আমেরিকান নীলনদের দেশে এসে পৌঁছান। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট ঝোঁক ছিল। মূল্যবান কোন নিদর্শন সংগ্রহের আশায় তিনি পকেটে প্রচুর টাকাপয়সা নিয়ে প্রতিদিন রাত্রে লুকসরের বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন এমনি ঘুরতে-ঘুরতে তিনি বাজারের অন্ধকার এক গলির মধ্যে ছোট একটি দোকানে এসে উপস্থিত হন। দোকানদার তাঁকে একটি পুরাতন প্যাপাইরাস দেখালো। এটি দেখে ভদ্রলোক বুঝেছিলেন, এটি জালবস্তু নয়—তাই বেশ চড়া দামে এটিকে কিনে নিলেন। তারপর কালক্রমে শুল্ক বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে ট্রাঙ্কের তলায় এই বহুমূল্য দলিলটি লুকিয়ে রেখে, তিনি ইউরোপে এসে পৌঁছান। বিশেষজ্ঞ-দ্বারা এই প্যাপাইরাস তিনি পরীক্ষা করিয়ে নিঃসন্দেহ হলেন, এটি সত্যি অতি প্রাচীন এক নিদর্শন। কয়েকজন ঐতিহাসিক এই দলিলটি তাঁর কাছে দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন। তিনি যখন সগর্বে তাঁর মিশরীয় অ্যাডভেনচারের কাহিনী সকলকে গল্প করে শোনাচ্ছিলেন, তখন একজন ঐতিহাসিক যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়ে, কায়রো মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ বিখ্যাত মিশর-শাস্ত্রী গ্যাস্টন ম্যাসপেরোকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত এক পত্র দেন। ম্যাসপেরো এই পত্র পেয়ে খুবই বিস্মিত হলেন। তিনি দেখলেন, গত বারো বছরের মধ্যে বিদেশী পর্যটকরা মিশরের চোরাবাজার থেকে এরকম মূল্যবান দলিল একাধিক বার সংগ্রহ করে মিশরের বাইরে নিয়ে গেছে। এর ফলে কায়রো মিউজিয়ামের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। সাম্প্রতিক এই ঘটনায় ম্যাসপেরোর মনে একটা আশারও সঞ্চার হয়েছিল। আধুনিক কবর-চোররা কি নূতন কোন সমাধিক্ষেত্রের হদিশ পেয়েছে? তিনি ভাবলেন, কালবিলম্ব না করেই এ সম্বন্ধে তাঁকে অনুসন্ধান করতে হবে। তিনি জানতেন মিশরীয় পুলিশ-বিভাগের কাছে কোন সাহায্য-প্রার্থনা বৃথা। তাই নিজস্ব সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এক তরুণ উৎসাহী কর্মীকে অনুসন্ধানের জন্য লুক্সরে পাঠিয়ে দিলেন। লুক্সরে এসে এই কর্মীটি সবচেয়ে দামি হোটেলে একটি ঘর ভাড়া নিলেন। পকেটভর্তি

স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বাজারে যেতেন তিনি এবং দু'হাতে পয়সা ওড়াতেন। সর্বদা ভান করতেন, তিনি যেন এক পয়সাওয়ালা খামখেয়ালি বিদেশী পর্যটক। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর যে বিন্দুমাত্র উৎসাহ আছে সেকথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে তিনি জানতে দেননি। অবশ্য পছন্দমত পুরাবস্তু পেলে তিনি পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করতেন না। তাঁর চালচলন লক্ষ করে কিউরিও ব্যবসায়ীরা তাঁর সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা চালাতে লাগল এবং তিনিও আশ্বাস দিলেন, মনের মত জিনিসের সন্ধান দিতে পারলে তিনি তাদের প্রচুর বকশিস দেবেন। একদিন এক দোকানদার তাঁকে আড়ালে ডেকে একটি ছোট মূর্তি দেখাল। মূর্তির গায়ে যে লিপিটি উৎকীর্ণ ছিল সেটি পড়ে কর্মচারীটি বুঝলেন, নিদর্শনটি তিন হাজার বছরের পুরাতন। কিন্তু বিস্ময় গোপন করে তিনি বারবার বলতে লাগলেন, এত ছোট একটি মূর্তি তাঁর ঠিক মনের মত হচ্ছে না—তিনি চান আরও বড় এবং আরও সুন্দর কোন নিদর্শন। এত ছোট মূর্তির আশায় তিনি এত দূর দেশে আসেননি। এই ঘটনার পরদিনই সেই দোকানদার তাঁকে এক লম্বা জোয়ান আরব ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এর নাম আবদেল রসুল। এর সঙ্গে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে তরুণ কর্মীটি তার কাছে বহু পুরাতন ঐতিহাসিক নিদর্শনের সন্ধান পেলেন। অবশেষে সঠিক কবর-চোরটির সন্ধান পাওয়া গেছে মনে করে তিনি পুলিশে খবর দিয়ে আবদেল রসুলকে গ্রেপ্তার করালেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা দায়ুদ পাশার আদালতে এই মামলার শুনানি চলল। কিন্তু যে সব গ্রামবাসী সাক্ষ্য দিতে এলে তারা একবাক্যে বলল, আবদেল রসুল তাদের গ্রামের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি—এমন লোককে অকারণ অভিযুক্ত করা ঘোরতর অন্যায়। শেষে দেখা গেল, রসুলের বিরুদ্ধে মামলাটি সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে টিকছেই না। এদিকে কায়রো মিউজিয়ামের উৎসাহী কর্মচারীটি তখন টেলিগ্রামে ম্যাসপেরোকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আসল চোর ধরা পড়েছে। যখন আবদেল রসুলকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না, তখন তরুণ কর্মীটির যে কি শোচনীয় অবস্থা হল তা সহজেই অনুমেয়। তিনি দায়ুদ পাশাকে প্রকৃত অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন যাতে আসামি ছাড়া না পায়। কিন্তু তার উত্তরে দায়ুদ পাশা তাঁকে নীরবে ধৈর্য ধরতে বললেন। মানসিক উত্তেজনা, সংশয় ও অনিশ্চয়তার ফলস্বরূপ কর্মচারীটি গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়লেন—প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি হোটেলের ঘরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রইলেন। দায়ুদ পাশা তখনও হাল ছাড়েননি। তিনি সে আমলের এক দুর্ধর্ষ শাসক—তাঁর নির্দয়তা-নিষ্ঠুরতার কাহিনী দেশব্যাপী প্রচলিত ছিল। লোকে বলত, অন্তর্যামীকে প্রতারণা করা যদি বা সম্ভব, দায়ুদ পাশার দৃষ্টিকে কেউ কখনো ফাঁকি দিতে পারে না। এক্ষেত্রে দেখা গেল, আবদেল রসুল ছাড়া পাবার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তার আত্মীয়-বন্ধু ও সাকরেদরা এক চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি করে গেল—যার থেকে প্রমাণিত হল যে, যে গ্রামে আবদেল রসুলের বাস সেটা সবটাই কবর-চোর

অধ্যুষিত। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বংশানুক্রমিকভাবে দুষ্কৃতকারীরা এই চোরা-কারবার চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে।

দিয়ের-এল-বাহরির সমাধিক্ষেত্রের আবিষ্কার আবদেল রসুল ও তার সাকরেদদের সবচেয়ে বড় কীর্তি। ভ্যালি অব কিংস-এর অনতিদূরে এক অতি দুর্গম পর্বতগাত্রে তারা এই সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশ-পথটি খুঁজে পায়। পাথরে-চাপা এক গর্তের সুড়ঙ্গপথে নেমে আবদেল রসুল দেখল, তার সামনে অনেকগুলি ম্যমি সারি-সারি সাজানো আছে। সে বুঝে নিল যে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে সে এক গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে—যার দৌলতে কয়েক পুরুষ তারা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিতে পারবে। তার কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, কি করে এই আবিষ্কারটিকে গোপন রাখা যায়। দীর্ঘদিন সে গোপনীয়তা রক্ষা করেছিল—কিন্তু অবশেষে সে অত্যধিক লোভের বশবর্তী হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল। কায়রো থেকে আগত তরুণ কর্মীটি তার সাধের পরিকল্পনা ভেস্তে দিল। দায়ুদ পাশার নির্যাতনের ভয়ে বাধ্য হয়েই সে সমাধিক্ষেত্রের গোপন নিশানা বলে দিল। যথাসময়ে দিয়ের-এল-বাহরির খনন-কার্য চালাবার জন্য কায়রো মিউজিয়াম থেকে একদল প্রত্নতাত্ত্বিক লুকসর অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তাঁদের নেতৃত্ব করলেন বিখ্যাত প্রত্নবিদ এমিল বে। লুকসর থেকে এই দলটি ভ্যালি অব কিংস-এর দিকে এগিয়ে চলল। প্রত্নবিদদের সঙ্গে পথপ্রদর্শক হিসেবে চলল কবর-চোর আবদেল রসুল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। খাড়া পাহাড়ের চড়াই ভেঙে রসুল বড় পাথরে চাপা দেওয়া একটি গর্ত দেখাল। খোলা চোখে সামানাসামনি তাকালে এ গর্ত কারও নজরে আসে না। রসুল একটা লম্বা দড়ি গর্তের মধ্যে ফেলে সুড়ঙ্গপথে এমিল বে-কে নিচে নামিয়ে দিল। সুড়ঙ্গটি ৩৫ ফুট গভীর। নিচে নেমে শক্ত জমিতে পা দিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক টর্চ জ্বাললেন। উজ্জ্বল আলোকে কয়েক গজ দূরেই একটি বিরাট প্রস্তর-নির্মিত শবাধার তাঁর চোখে পড়ল। শবাধারে উৎকীর্ণ লিপিটি পাঠ করে তিনি বুঝলেন, এর মধ্যে সম্রাট প্রথম 'সেটির' ম্যমি রক্ষিত আছে। ১৮১৭ সালে ইটালিয়ান প্রত্নবিদ্ বেলজোনি থীবস উপত্যকায় সেটির আসল সমাধিমন্দিরটি খুঁজে পান। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি সেটির ম্যমির কোন সন্ধান পাননি। এতদিনে এটির সন্ধান মিলল। টর্চের আলোতে এমিল বে দেখলেন, মৃত ফ্যারাওদের খুঁটিনাটি অনেক আসবাবপত্র তখনও এদিক-ওদিক ছড়ানো। সবগুলি শবাধারের ডালা তখনও খোলা হয়নি—সবেমাত্র দু-একটি খোলা হয়েছিল। অযত্নে সেগুলি স্তূপীকৃত করে রাখা। প্রাচীন মিশরের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের দেহাবশেষ ও সেই সঙ্গে তাদের ঐশ্বর্য ও বৈভব দেখতে-দেখতে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন প্রত্নতাত্ত্বিক। কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে-হতে ফ্যারাওদের পরিচয় নিতে লাগলেন তিনি। তিনি সাক্ষাৎ পেলেন প্রথম আমোসের—যিনি পবিত্র নীলনদের দেশ থেকে হিকসস্ দস্যুদের তাড়িয়ে যোদ্ধা হিসাবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আরও দেখা পেলেন, মিশরের বীরকেশরী

তৃতীয় থুটমোস ও দ্বিতীয় রামেসিসের—যোদ্ধা ও সাম্রাজ্যস্রষ্টা হিসাবে যাঁদের নাম সুবিদিত। মর্মর শবাধারের উৎকীর্ণ লিপি পড়তে-পড়তে নির্জন পর্বতগাত্রের গভীর তলদেশের এই সমাধি-মন্দিরটির ইতিহাস রচনা করতে লাগলেন এমিল বে। তিনি মানসচক্ষে দেখতে পেলেন, মিশরের পুরোহিত-সম্প্রদায় কিভাবে রাতের পর রাত ফ্যারাওদের নশ্বর দেহকে চোর-ডাকাতদের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। তিনি দেখতে পেলেন, কি অসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠা-সহকারে এরা নিরাপত্তার জন্য ফ্যারাওদের আসল সমাধিক্ষেত্র থেকে তাঁদের ম্যমিকে আরও গোপন নির্জন স্থানে টেনে এনেছে। এই পর্বতকন্দরে সবসুদ্ধ চল্লিশটি শবদেহের সন্ধান পেয়েছিলেন এমিল বে। এঁরা সকলেই পরাক্রান্ত ফ্যারাও—ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ ও মিশরের ভাগ্যবিধাতা।

---

# টুটেনখামেনের রত্নভাণ্ডার

১৯২২ সালে যে বছর ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় সিন্ধু সভ্যতার সন্ধান পান, সে বছরই ইংরেজ প্রত্নবিদ হাওয়ার্ড কার্টার মিশরে টুটেনখামেনের সমাধি-মন্দিরটি আবিষ্কার করেন। বিংশ শতকের প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে দুটি কীর্তিকেই যুগান্তকারী আখ্যা দেওয়া যায়। ১৮১৫ সালে ইটালিয়ান প্রত্নতাত্ত্বিক বেলজোনি ভ্যালি অব কিংস-এ খননকার্য চালিয়ে একাধিক মর্মর শবাধার উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন আরও কয়েকজন ইউরোপীয় প্রত্নবিদ—যাঁরা মিশরে প্রত্নানুসন্ধান করতে এসে অল্পবিস্তর সফলতা অর্জন করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান পুরাতত্ত্ববিদ থিওডর ডেভিস দীর্ঘ সময় ভ্যালি অব কিংস-এ খননকার্য চালান। তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান করার পর তিনি যখন গৃহে প্রত্যাগমন করছেন তখন স্পষ্ট ভাষায় এই অভিমত দেন যে, এই উপত্যকায় ফ্যারাওদের সমাধিক্ষেত্র এতবার চষা হয়ে গেছে যে, ভবিষ্যতে কোন খননকারী এখানে এলে উল্লেখযোগ্য কিছু পাবেন বলে মনে হয় না। ভ্যালি অব কিংস নিঃশেষিত—এই রায় কিন্তু ইংলন্ডের লর্ড কারনারভন মেনে নিতে পারেননি। থিওডর ডেভিস চলে যাবার পরই তিনি এই উপত্যকায় খননকার্য চালাবার জন্য মিশর সরকারের কাছে আবেদনপত্র দাখিল করলেন। লর্ড কারনারভন ইংলন্ডের বনেদি পরিবারের ছেলে—তার উপর ট্রিনিটি কলেজ, কেমব্রিজের কৃতী ছাত্র। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর নানা ধরনের শখ—ছবি আঁকা, সাঁতার কাটা, তীর-ধনুক ছোঁড়া, মোটরগাড়ি হাঁকানো ও সর্বোপরি কিউরিও বা পুরাবস্তু সংগ্রহ করা। এক মোটর-দুর্ঘটনার ফলে স্থায়িভাবে তাঁর ফুসফুস দুর্বল হয়। ডাক্তার বললেন, সুস্থ শরীরে বাঁচতে হলে কিছুকাল তাঁকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বসবাস করতে হবে। স্বাস্থ্যের কারণেই তাঁর আগমন মিশর দেশে এবং এ দেশের মাটিতে পা দিয়েই তিনি প্রত্নতত্ত্বে বিশেষ আকৃষ্ট হলেন। প্রখ্যাত মিশরশাস্ত্রী ম্যাসপেরো সাহেবের সঙ্গে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান সম্পর্কে কথাবার্তা বলেন এবং তাঁরই উপদেশ অনুসারে মিশরে খননকার্য চালাবার জন্য এক সুযোগ্য সাহায্যকারী হাওয়ার্ড কার্টারকে নিজের দলে নিযুক্ত করেন। কার্টার-কারনারভনের যৌথ প্রচেষ্টা সফলকাম হয়েছিল। সাফল্যের নানা কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে, তাঁরা সব বিষয়ে একজন ছিলেন অপরজনের পরিপূরক। পুঁথিগত বিদ্যার অভাব ছিল না কারনারভনের—অভাব ছিল উৎখননের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার। সেই অভাব মোচন করেন কার্টার—যিনি পেট্রি ও ডেভিসের সঙ্গে কাজ করে যথেষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। বেলজোনির আমলে প্রত্নতত্ত্ব ছিল গুপ্তধন অন্বেষণের শামিল। কিন্তু বিংশ শতকের সূচনায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খননকার্য চলতে থাকে।

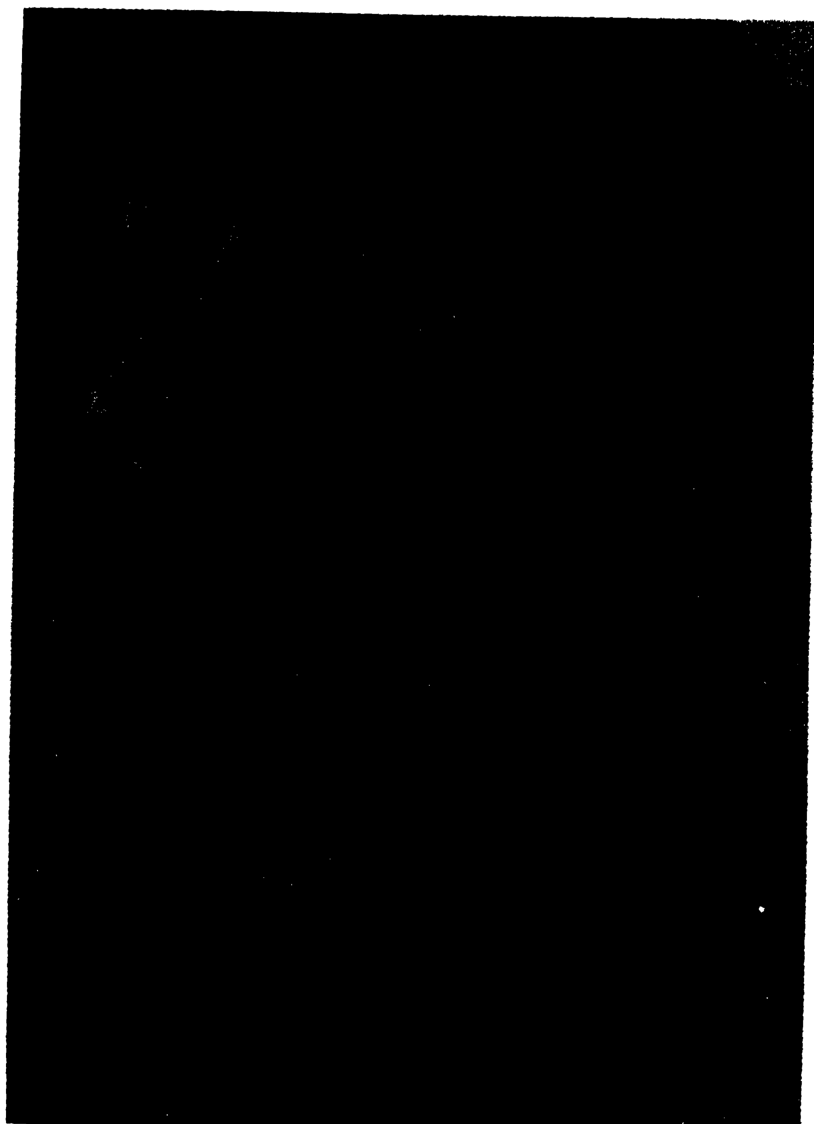
মিশরের প্রত্নতত্ত্বে ফ্লিনডারস পেট্রি যে বৈজ্ঞানিক রীতির প্রচলন করেন তারই সার্থক রূপায়ণ হাওয়ার্ড কার্টারের কীর্তিতে। পেশাগতভাবে কার্টার ছিলেন একজন ড্রাফটসম্যান—যিনি নকশা আঁকার কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের এই অভিজ্ঞতাকে তিনি পুরোপুরি কাজে লাগালেন। ভ্যালি অব কিংস-এর ঢালাও জমিকে কয়েকটি বর্গক্ষেত্রে ভাগ করে সুবৃহৎ এক নকশা আঁকলেন তিনি। ঠিক করলেন, প্রতি বর্গক্ষেত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। দশ বছর কঠোর পরিশ্রম চালিয়েও যখন কোন আলোর সন্ধান মিলল না, তখন স্বভাবতই তিনি একটু দমে গিয়েছিলেন। কিন্তু এত সহজে হার স্বীকার করতে রাজি হলেন না তিনি। নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হচ্ছিল। ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ লেগে যাওয়ায় দেশ থেকে টাকাকড়িও ঠিকমত আসছিল না। কারনারভন একসময়ে স্পষ্ট ভাষায় কার্টারকে জানিয়ে দিলেন যে, এতদিনে যখন কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন বৃথা আর টাকা নষ্ট না করে কর্মে বিরতি দেওয়াই শ্রেয়। কার্টার কিন্তু কাজ বন্ধ করার পক্ষপাতী নন। অদম্য আশাবাদী তিনি। বিনীতভাবে কারনারভনকে তিনি জানালেন যে, তাঁর নকশার মাত্র এক বর্গক্ষেত্র জমি পরীক্ষা করা বাকি—এটুকুর শেষ না দেখে তিনি কাজ বন্ধ করতে ইচ্ছুক নন। অন্তত আর একটা মাস দেখা যাক। এর মধ্যে কিছু না পাওয়া গেলে অবশ্যই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন কারনারভন। এরপর ঘটনাবলী অত্যন্ত চমকপ্রদ। যে বর্গক্ষেত্রটি তখনও পরীক্ষা করা বাকি, তারই মধ্যে ছিল কুলি-মজুরদের কয়েকটি কুঁড়েঘর। পাঁচ বছর পূর্বে কার্টার একবার ভেবেছিলেন, জায়গাটিতে খননকার্য শুরু করবেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি হঠাৎ মত পরিবর্তন করে অন্যত্র খুঁড়তে আরম্ভ করেন। একটি সুবর্ণসুযোগও নষ্ট হল। এবার কিন্তু তাঁর কাজে কোন ভুল নেই—ঈশ্বর-নির্দিষ্ট স্থির লক্ষ্যের দিকে তিনি ধীরপদে এগিয়ে চলেছেন। এবার তিনি কুলিদের কুঁড়েঘর ভেঙে দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করলেন প্রথমে। তারপর শুরু হল তন্ন-তন্ন করে খোঁজা। দুদিন ইটপাটকেল আবর্জনা সরাবার পরই নজরে পড়ল একটি সুড়ঙ্গপথ। মাটি কাটতে-কাটতে তিনি দেখলেন সিঁড়ির ধাপ পর-পর নিচে নেমে গেছে। খুব আশ্চর্যের বিষয়—থিওডর ডেভিস দু'বার সুড়ঙ্গপথের খুব কাছে এসেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিলেন। সারাদিন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কাজ করে সন্ধ্যায় কার্টার ভূগর্ভে একটি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দরজার উপর প্লাস্টার করা শিল। শিলের উপর কার নাম আঁকা সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তা পড়া গেল না। কিন্তু ভাঙা প্লাস্টারের মধ্যে টর্চ ঢুকিয়ে ভিতরটা ভাল করে দেখে নিলেন কার্টার। ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত রাজ্যের আবর্জনা ঠাসা। এমন একটি ঘরে কোনদিন হয়ত কবর-চোর হানা দেয়নি। বিরাট এক আবিষ্কারের সম্ভাবনায় প্রত্নতাত্ত্বিকের মন আনন্দে নেচে উঠল। সেই রাত্রেই তিনি সমস্ত ঘটনা তার করে জানিয়ে দিলেন লর্ড কারনারভনকে। তারবার্তা পেয়ে কারনারভন ও

তাঁর কন্যা সেই দিনই মিশর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। পৌঁছুলেন নভেম্বরের শেষাশেষি। ততদিনে নিচে নামার সোপানগুলি পরিষ্কার করিয়েছেন কার্টার। দরজার উপর শিলটি ভাল করে পরীক্ষা করে জানা গেছে, এটি সম্রাট টুটেনখামেনের। কিন্তু কার্টারের সন্দেহ হচ্ছে, পূর্বের একপ্রস্থ প্লাস্টারের উপর যেন আর এক প্রস্থ লেপে দেওয়া হয়েছে। অন্তত একবার কবর-চোরেরা যে এর মধ্যে ঢুকেছিল এটি তারই প্রমাণ। তারপর হয়ত রক্ষী-দলের তৎপরতায় চোরদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং তারা প্রাণ নিয়ে পালায়। যাতে ভবিষ্যতে কখনও এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য হয়ত রক্ষীরা ঘরটিতে জঞ্জাল আবর্জনা পুরে দরজা বন্ধ করে দেয়। জঞ্জাল সরিয়ে ঘরটিকে ভদ্রস্থ করতে কার্টারের একটা পুরোদিনই লেগে গেল। কাজ যখন প্রায় শেষ তখন তাঁর নজরে পড়ল, ঘরের কোণে আর-একটি যেন শিল আঁটা দরজা। কৌতূহল দমন করা অসম্ভব হল। দরজার কোণে একখণ্ড প্লাস্টার সরিয়ে একটু গর্ত করে নিলেন কার্টার। তারপর অতিকষ্টে হমাগুড়ি দিয়ে ঐ গর্তের সামনে পৌঁছে একটি মোমবাতি বাড়িয়ে দিলেন ভিতরের জমাট বাঁধা অন্ধকারের দিকে। সেই ঘরে দেখলেন, টুটেনখামেনের ব্যবহার করা বিরাট বিরাট আসবাবপত্র, যার পায়ে ও হাতলে অদ্ভুত জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই করা—একটি স্বর্ণময় সিংহাসন এবং বৃহদাকার রথ, যার বড়-বড় চাকাগুলি দেয়ালের পাশে দাঁড় করানো ছিল। এর মধ্যে ফ্যারাও-এর মর্মর শবাধারটি নেই। তবে কি তা চোর-ডাকাত কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছে? কিন্তু একটু পরেই কার্টার বুঝলেন যে, যে ঘরে সম্রাটের ম্যমিটি রক্ষিত, সমাধিমন্দিরের সেই গর্ভগৃহে তাঁরা এখনও প্রবেশ করেননি—প্রবেশ করেছেন তারই সংলগ্ন অপর একটি কক্ষে—যেখানে ফ্যারও-এর ব্যবহার্য নানা জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘরের দেয়ালেও একটা বড় গর্ত পাওয়া গেল—যার মধ্য দিয়ে সংলগ্ন আর একটি কক্ষে চলে যাওয়া যায়। এই গর্তের মধ্যে টর্চ জ্বালিয়ে কার্টার যে দৃশ্য দেখলেন, তাতে কবর-চোরদের আগমন সম্বন্ধে তাঁর আর সন্দেহ থাকল না। বাক্স-প্যাটরা সব ওল্টানো, স্তূপীকৃত জিনিস মাটিতে যত্রতত্র ছড়ানো। পরের দিন এই ঘরে নানাবিধ জিনিসের মধ্যে ঝাড়ন-জড়ানো অনেকগুলি সোনার আংটি পেয়ে কার্টার বুঝলেন, সহজে বহনযোগ্য এই দামি জিনিসগুলি চোররা এক জায়গায় বেঁধে রেখেছিল, সুবিধামত নিয়ে পালাবে বলে। কিন্তু পাহারাদারের তাড়া খেয়ে জিনিসপত্র ফেলেই তারা চম্পট দেয়। এই ঘরটির পিছনেই যখন আর-একটি ঘর আবিষ্কৃত হল তখন কার্টার অনুমান করলেন, এবার নিশ্চয়ই তিনি মর্মর শবাধারটি দেখতে পাবেন। প্রথম ঘরটিতে যেমন ছিল, এ ঘরেও তেমন একটি শিল করা দরজা। সেই মুহূর্তে কার্টারের প্রবল বাসনা হচ্ছিল শিল ভেঙে তাড়াতাড়ি ঐ কক্ষে ঢুকে পড়েন। কিন্তু জানতেন হঠকারিতা বিপদ ডেকে আনে। বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর না হলে মহামূল্য প্রাচীন নিদর্শনগুলির ক্ষতি হতে পারে। এবং এগুলি একবার নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় তাদের সারিয়ে পূর্বের

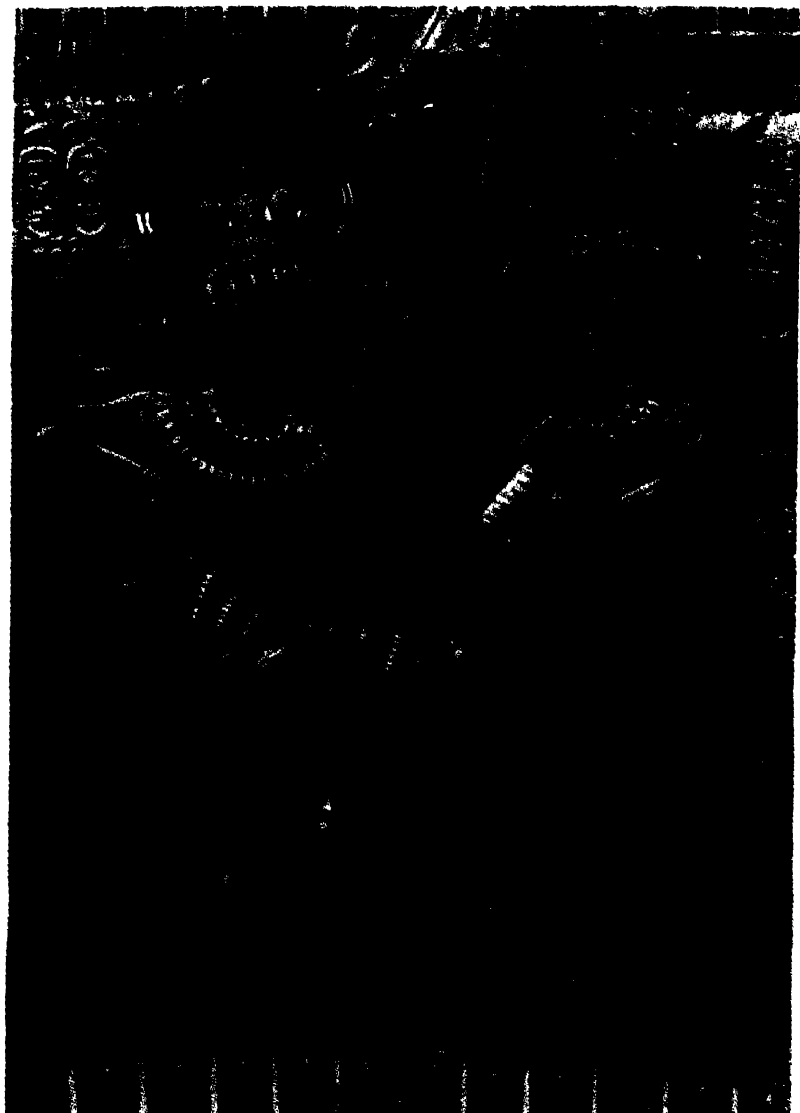
আকারে নিয়ে যাওয়া যায় না। প্রত্নতত্ত্বের সাধনায় গবেষককে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়—ধৈর্য ধারণ করতে হয়। পণ্ডিতপ্রবর পেট্রির কাছে তিনি এই শিক্ষাই পেয়েছিলেন। সুদূর অতীতের অমূল্য নিদর্শনগুলি যাতে অটুট অবস্থায় সকল প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণ-সমেত, ঐতিহাসিকের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন কার্টার। একবার তিনি মৃত রাজার নানাবিধ শৌখিন জিনিসের মধ্যে রঙবেরঙের পুঁতি দিয়ে গাঁথা একজোড়া চটির সন্ধান পেলেন। কিন্তু যেই তিনি সেটা হাতে নিয়েছেন, অমনি সব ভেঙে-চুরে একাকার। এরপর থেকে যে নিদর্শনগুলিকে তাঁর ভঙ্গুর মনে হত, সেগুলি আগেই গলানো মোমের বাক্সে পুরে ফেলতেন—অথবা তাদের উপর সেলুলয়েড জাতীয় একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দিতেন। কাছেই ছিল এক শূন্য সমাধিক্ষেত্র—সেটিকে কার্টার বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পরিণত করেন।

ভ্যালি অব কিংস-এ টুটেনখামেনের সমাধি-মন্দিরের আবিষ্কার-কাহিনী সারা বিশ্বে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। মিশরে দলে দলে ট্যুরিস্ট আসতে শুরু করল তাদের ব্যক্তিগত কৌতূহল চরিতার্থ করার আশায়। তার উপর ছিল ভি-আই-পি-দের দৌরাত্ম্য। তাঁরা এসে দাবি করতেন, মাটি থেকে কি-কি বার হল তা তাঁরাই প্রথম দেখবার অধিকারী। কার্টার লিখেছেন, তিনি যখন কোন দুরূহ প্রত্নতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই হয়ত কাজ বন্ধ রেখে ভি-আই-পি অতিথিদের সঙ্গদান করতে হত—এমন কি গাইড হিসাবেও ঘুরতে হত তাঁদের সঙ্গে। মহামান্য অতিথিরা যে সকলেই ইতিহাস বা পুরাতত্ত্ব-প্রেমী ছিলেন তা নয়। অনেকে আসতেন নিছক হুজুগের বশে। দু-একজন প্রকাশ্যে এমন কথাও বলে বসতেন যে, কষ্ট করে এতদূর চলে এলাম, কিন্তু কিই বা এমন আছে দেখার মত। এসব শুনে কার্টার বিরক্ত হতেন—তাঁর মাথায় খুন চেপে যেত। তিনিও অনেক অপ্রিয় কথা শুনিয়ে দিতেন, যা নিয়ে পরে অশান্তি হত। মিশর সরকারের কাছে অনেকে অনুযোগ করেছিল যে, কার্টার অতিশয় অভদ্র ব্যক্তি; গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলা উচিত তা তিনি জানেন না। কাগজেও নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশিত হল। কাগজওয়ালাদের উষ্মার একটি বড় কারণ এই যে, সকলেই চাইত টুটেনখামেন সংক্রান্ত সব সংবাদ তার কাগজেই প্রথম ছাপা হোক। কারনারভন বা কার্টার সব সময়ে তাদের আবদার মেনে নিতে পারতেন না। শেষে গোলমাল ও অশান্তি এড়ানোর জন্যই সমাধি-মন্দিরের যাবতীয় সংবাদ ও চিত্রের একচেটিয়া অধিকার কারনারভন লন্ডনের টাইমস পত্রিকাকে বিক্রি করে দেন। মিশরের কাগজগুলি তাতে আরও ক্ষেপে গিয়ে কুৎসা ও গুজব রটাতে শুরু করল।

ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ পর্যন্ত অ্যান্টিচেম্বারে প্রাপ্ত পুরাবস্তুর উদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা চলল। ১৭ ফেব্রুয়ারি কার্টার আনুষ্ঠানিকভাবে শিল-করা কক্ষের দ্বারোদঘাটনের আয়োজন করেন। সারি-সারি কুড়িখানি চেয়ার সাজানো হল ঘরের সামনে। তাতে বসলেন বিশেষ



শবাধারে প্রাপ্ত টুটেনখামেনের প্রতিকৃতি



*সিংহাসনে উপবিষ্ট টুটেনখামেন, সম্মুখে তাঁর নারী*

নিমন্ত্রিত কয়েকজন অতিথি—বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ, সরকারি কর্মচারী, লর্ড কারনারভন ও তাঁর কন্যা এবং টাইমস-এর প্রতিনিধি। কারনারভন নিজের হাতে বেলা ২টার সময় শিল ভাঙলেন। দেয়ালে একটি বড় গর্ত করা হল। তার মধ্যে যেই টর্চের আলো জ্বালা হয়েছে অমনি চারিদিকে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতে থাকল। ভিতরের দেয়াল সোনার পাতে মোড়া। একটির পর একটি পাথর সরিয়ে ভিতরে প্রবেশপথ করে নিলেন কার্টার। এতদিন তাঁর আশঙ্কা ছিল, কবর-চোররা ফ্যারাও-এর শবাধার সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এবার ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, স্বর্ণময় মন্দিরের মধ্যে টুটেনখামেন অনন্ত শয়নে শায়িত। তাঁর দুশ্চিন্তা দূর হল—শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। কিন্তু সমাধি-কক্ষের দ্বারোদঘাটনের সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কাজ বন্ধ করে দিতে হল। শীতকাল শেষ হয়েছে তখন—গ্রীষ্মের আগমনে ঐ অঞ্চলে প্রত্নানুসন্ধান চলে না। তার উপর কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বেরও শেষ ছিল না। মিশরীয় কাগজগুলি সমানভাবে তখনও কারনারভন ও কার্টারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে যাচ্ছিল। এক সাংবাদিক মন্তব্য করলেন যে, কারনারভন ভেবেছেন টুটেনখামেনের সমাধি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি, তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হচ্ছে—তিনি যেন ওয়েলস পাহাড়ে নিজের পূর্বপুরুষদের সমাধি খুঁড়তে এসেছেন। কারনারভন অবশ্য সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলেন না। সেই বছরই তিনি যখন আবিষ্কৃত ধনরত্নের একাংশ নিজস্ব সম্পত্তি বলে দাবি করলেন, তখন কার্টারের সঙ্গে তাঁর হাতাহাতি হবার উপক্রম হল। বন্ধু বিচ্ছেদ হল—উভয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন কেউ কারও মুখ দেখবেন না। এরপর সামান্য এক মশার কামড়ে লর্ড কারনারভনের আকস্মিক মৃত্যু ঘটল। প্রায় এক বছর কর্মবিরতির পর কার্টার আবার কাজ শুরু করলেন ১৯২৪-এ। চারটি সোনায় মোড়া বাক্স ভেদ করে একটি মর্মর শবাধার পাওয়া গেল। ঢাকনা তার এক টনের বেশি ভারী। কপিকলের সাহায্যে ঢাকনা খোলা হল। তার মধ্যে পর পর তিনটি কফিন। তৃতীয় ও শেষটি অন্য দুটির চেয়ে অনেক বেশি ভারী। পরে দেখা গেল এটির সবটাই কাঁচা সোনায় তৈরি—তার উপর বহুমূল্য রঙিন পাথর বসানো। এটির মধ্যেই ছিল মৃত ফ্যারাও-এর ম্যমি—তেত্রিশ শ' বছর ধরে যা টিকে আছে। ম্য'মির মুখ ও তার স্বর্ণময় বহিরাবরণ দেখে অনুমান করা যায়, তরুণ রাজা টুটেনখামেন সুপুরুষ ছিলেন। তরুণ মুখ, আয়ত নয়ন, নিবিড় ভুরু। শিরস্ত্রাণের জন্য চুল বা কপাল দেখা যায় না। ঋজু ক্ষীণ নাসিকার নিচে ওষ্ঠাধর মৃদু ও স্পর্শকাতর।

কে এই ফ্যারাও টুটেনখামেন? যদিও এত ঐশ্বর্য ও বৈভবের মধ্যে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল, তবু টুটেনখামেন মিশরের নাম করা ফ্যারাওদের মধ্যে পড়েন না। থুটমোস, রামেসিস বা সেটির পাশে তিনি নিতান্ত অনুজ্জ্বল। তাঁর রাজত্বকালের কোন বিখ্যাত ঘটনার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। শুধুমাত্র জানা যায়, তিনি বিখ্যাত সম্রাট ইখনাটনের জামাতা ছিলেন। ইখনাটনের আমলে মিশরে অ্যাটন পূজা বা সূর্যোপাসনা প্রবর্তিত হয়।

তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরই মিশরে ধর্মবিপ্লব ঘটে যায়। অ্যাটন নির্বাসিত হলেন; তাঁর স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলেন এমেন। টুটেনখামেনের নামের দ্বিতীয়াংশে এই ধর্মবিপ্লবের জয় ঘোষিত হচ্ছে। আগে সম্ভবত এঁর নাম ছিল টুটেনখাটেন। এখন এমেনের নাম অনুযায়ী টুটেনখামেন। ঐতিহাসিক বলেন মাত্র ৯ বছর (খ্রিঃ পূঃ ১৩৫২—১৩৪৩) ইনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কি অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে, সে কথা কেউ জানে না। শরীরশাস্ত্রবিদ্ ডাঃ ডেরী ম্যমির আবরণ উন্মোচন করেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মৃত্যুকালে ফ্যারাও-এর বয়স ১৭/১৮ বছরের বেশি ছিল না।

# টুটেনখামেনের অভিশাপ

নিছক বিস্ময় ও কৌতূহল ছাড়াও টুটেনখামেনের রত্নভাণ্ডারের সঙ্গে জড়িত ছিল এক রহস্যময় ঘটনা, যা সহজেই মনকে রোমাঞ্চিত করে। সমাধি-মন্দিরটি আবিষ্কৃত হবার অল্পকাল পরই ফ্যারাও-এর অভিশাপ নাম দিয়ে একটি কাহিনী গড়ে ওঠে। টুটেনখামেনের সমাধির উপর নাকি এক সতর্কবাণী উৎকীর্ণ ছিল—'এই কবর কেউ স্পর্শ করো না। স্পর্শ করলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।' সর্বদেশে ও সর্বকালে এ ধরনের কাহিনী বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তার উপর যখন কিছু-সংখ্যক সাংবাদিক বেশ রঙচঙ দিয়ে এ-রকম কাহিনী কাগজে ছাপতে থাকেন, তখন সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, টুটেনখামেনের অভিশাপের নিশ্চয়ই কোন বাস্তব ভিত্তি আছে। ধারণা তাদের আরও বদ্ধমূল হল যেদিন সামান্য এক মশার কামড়ে তিন সপ্তাহ জ্বরে ভুগে কারনারভন রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন। কাগজে ছাপা হল : 'টুটেনখামেনের আক্রোশের প্রথম শিকার হলেন কর্ড কারনারভন'। এঁর মৃত্যুরহস্য আরও ঘণীভূত হল যখন পরবর্তীকালে কারনারভনের পুত্র পিতার মৃত্যু সম্পর্কে দুটি অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করেন। যে রাত্রে কারনারভন মারা যান সে রাত্রে কোন অজ্ঞাত কারণে কায়রো শহরের সব বিজলী বাতি নিভে যায়। পাওয়ার হাউসের সাহেব ইঞ্জিনিয়ার হঠাৎ এই ব্ল্যাকআউটের কোন কারণ নির্ধারণ করতে পারেননি। কোন যান্ত্রিক গোলযোগে বাতি নেভেনি বলেই তাঁর বিশ্বাস। দ্বিতীয় ঘটনা আরও রহস্যজনক। কারনারভনের এক পোষা কুকুর ছিল লন্ডনে। প্রভুভক্ত কুকুরটি প্রভু-বিহনে খুবই মনমরা হয়ে গিয়েছিল। শোনা যায়, যেদিন কারনারভন কায়রো শহরে পরলোকগমন করেন, সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ কুকুরটি বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে এবং কিছু সময় পর মারা যায়। উপরোক্ত ঘটনা দুটির কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারনারভনের পর ওয়েস্টবেরীর পালা। ইনি খননকার্যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। তবে টুটেনখামেনের সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজখবর রাখতেন—বয়স তাঁর ৭৮। ইনি একদিন তাঁর লন্ডনের বাড়ির সাততলার জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেন। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর আত্মহত্যার কি কারণ তা কেউ জানে না। কিছুদিন পূর্বে তাঁর জোয়ান ছেলে (যে কার্টারের সেক্রেটারির কাজ করত) হঠাৎ মারা যায়। স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ যুবক, একদিনের জন্যও সে জীবনে অসুস্থ হয়নি। তার মৃত্যুরও কোন কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। ডগলাস রিড নামক এক ইংরাজ প্রত্নবিদ একটি ম্যমির দেহে এক্স-রে করবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর হৃদযন্ত্রটি বিকল হল। এঁর সঙ্গে টুটেনখামেনের কোন

প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। তবু পর পর কয়েকটি রহস্যজনক মৃত্যু ঘটাতে অনেকের মুখেই শোনা গেল টুটেনখামেনের অভিশাপ ফলতে শুরু করেছে। কার্টারের সহকর্মী ছিলেন এ সি মেস। তিনি দীর্ঘদিন রোগে ভুগে স্বাভাবিক অবস্থাতেই মারা গেলেন। তখনও কিন্তু লোকে একই কথা বলল। মেস যে অনেক দিন রোগশয্যায় শুয়েছিলেন এবং ডাক্তাররা তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, একথা কারও মনে থাকল না। তারপর এক মজার ব্যাপার হল। যুক্তরাষ্ট্রে এক ব্যক্তি মারা গেল—নাম তার কার্টার। লোকটি কে· কি তার পেশা, কি কারণে সে মরেছে—এসব অনুসন্ধান না করেই একদল লোক গুজব রটিয়ে দিল, এত দিনে টুটেনখামেনের ক্ষুধিত আত্মা শান্ত হবে—কেন না তার সবচেয়ে বড় শত্রু ঘায়েল হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক কার্টার শেষে কাগজে বিবৃতি দেন, তাঁর মৃত্যুর খবর সর্বৈব মিথ্যা এবং তিনি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। কার্টার আরও দেখিয়ে দেন, সমাধির উপর যে সতর্কবাণী নিয়ে এত হৈচৈ আসলে তার কোন অস্তিত্বই নেই। ফ্যারাও-এর দেহকে সব রকম ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শবাধারের উপর যে কটি মন্ত্র উৎকীর্ণ আছে—তাকে অনেক বিকৃত করলেও সেই সতর্কবাণীর ধারকাছ দিয়েও যাবে না। ১৯৩৩ সালের জার্মান প্রত্নবিদ স্টাইনডর্ফ মানুষের মন থেকে টুটেনখামেন সম্পর্কে সব রকম কুসংস্কার দূর করার জন্য একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু ভুল ধারণা এখনও দূর হয়নি। কেন না ১৯৬৪ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক অ্যালান গার্ডিনার যখন পরিণত বয়সে পরলোকগমন করলেন তখন আবার টুটেনখামেনের অভিশাপের কথা কাগজে ছাপা হয়েছিল। ভুল ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়ে বসে গেলে তাকে তাড়ানো বড়ই শক্ত। ইংরেজি প্রবাদ বাক্যে আছে, মার্জার মহাশয়ার নয়টি প্রাণ। কিন্তু ঐতিহাসিক গুজব বা মিথ্যার আছে সহস্রটি প্রাণ এবং অযুতবর্ষের পরমায়ু।

---

# ইতিহাসের এক অসুখী রাজকন্যা

১৯২২ সালে যেদিন প্রত্নতাত্ত্বিক হাওয়ার্ড কার্টার মিশরে 'ভ্যালি অব কিংস' থেকে টুটেনখামেনের সমাধি-সৌধটি একেবারে অটুট অবস্থায় উদ্ধার করলেন, সেদিন থেকেই এই বালক-রাজার নামডাক। এতদিন পর্যন্ত তাঁর নাম প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। মিশরের প্রথম শ্রেণীর ফ্যারাওদের মধ্যে টুটেনখামেন পড়েন না। দিগ্বিজয়ী বীর বলে তিনি পরিচিত নন—আবার রাজ্য-শাসন-বিষয়ক কোন কৃতিত্বের সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িত নয়। ফ্যারাওদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল হলেও, টুটেনখামেন এক বিষয়ে ভাগ্যবান। থুটমোস, সেটি বা রামেসিস-এর সমাধিমন্দির যুগ-যুগ ধরে দস্যু-তস্কর দ্বারা লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হলেও, দৈবকৃপায় তাঁরটিই কেবল রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল অদ্ভুতভাবে। নেহাৎ বালক বয়সে টুটেনখামেনের মৃত্যু হয়। ম্যমি পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা বলেছেন, মৃত্যুকালে টুটেনখামেনের বয়স ১৭/১৮-র বেশি ছিল না। বালক রাজা অনন্ত পথের যাত্রী হলেন—রেখে গেলেন তাঁরই সমবয়সী এক বালিকা-বধূকে। নাম তাঁর আঁখেসোনামুন। দুঃখের বিষয় এঁদের কোন সন্তানাদি ছিল না। উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে মিশরের ভাবী শাসক হলেন সামন্ত-রাজ 'আই'। উচ্চাকাঙক্ষী, ক্ষমতালোভী ও কুচক্রী হিসাবে যিনি ইতিপূর্বে রাজদরবারে যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ষাট বছবের পলিতকেশ এই বৃদ্ধ যখন মিশরীয় রীতি অনুযায়ী বালিকাবধূ আঁখেসোনামুনকে তাঁর ভাবী পত্নী বলে দাবি করে বসলেন, তখন কচি বয়সের মেয়েটি সত্যি বিপদে পড়ল। কাজটি নীতি-বিগর্হিত নয়—কেননা দেশের রীতি এই যে, নূতন রাজা পূর্বতন রাজার বিধবা স্ত্রী-র পাণিগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু আঁখেসোনামুন বেঁকে দাঁড়ালেন। সদ্য স্বামীকে হারিয়ে এমনি তাঁর মনটা ছিল বিষাদে ভরা—তারপর যেদিন শুনলেন বৃদ্ধ আই তাঁকে বিয়ে করতে বদ্ধপরিকর, সেদিন থেকে তাঁর নিদ্রা ঘুচে গেল। সর্বদেশ ও সর্বকালে তরুণীরা যৌবন-দৃপ্ত রূপবান স্বামী পছন্দ করে এসেছে এবং আঁখেসোনামুন বোধহয় তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই এই বিপদের হাত থেকে মুক্তির আশায় তিনি শেষ-পর্যন্ত একটা বড় রকমের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ফেললেন। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি এক বিদেশী রাজার কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। ইনি হিত্তীরাজ সুবিলুলিমা—পশ্চিম এশিয়ায় যিনি এক ক্ষমতাশালী নৃপতি বলে সম্মানিত।

বিপন্না রাজকুমারী হিত্তী রাজার কাছে দু'খানি পত্র লেখেন। এই পত্র দু'খানির সন্ধান পাওয়া গেছে ১৯০৭ সালে তুরস্কের অন্তর্গত বোঘাজ কোই গ্রামে এক খননকার্যের ফলে। সে বছর জার্মান প্রত্নবিদ হুগো ভিঙক্লের সেখানে তাঁর খননকার্য পরিচালনা

করেন। ভিঙক্লের ভাগ্যবান ব্যক্তি। খনন কাজ শুরু করার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি হিত্তীদের রাজধানী হাট্টুসাসের সন্ধান পেয়ে যান। সন্ধান পেলেন হিত্তীদের সবচেয়ে বড় মন্দিরটির—যার প্রাঙ্গণে নিত্য সমবেত হত হাজার-হাজার দর্শনপ্রার্থী। কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে, দশ হাজার পোড়া মাটির ট্যাবলেট, যা এক-সময়ে রাজ দপ্তরে সযত্নে রক্ষিত থাকত। এগুলি সবই ছিল বাণমুখলিপিতে উৎকীর্ণ। নানা ধরনের সরকারি নথিপত্রের মধ্যে কোন এক অজ্ঞাত মিশরীয় রানীর লেখা দুটি পত্র তাঁর কৌতূহল জাগ্রত করল। প্রথম চিঠিতে আছে এক করুণ আবেদন—'আমি পতিহীনা এক নিঃসহায় রমণী। আমার সন্তানাদি নেই। আপনি যদি আপনার কোন এক পুত্রকে মিশরে পাঠিয়ে দেন, তাহলে আমি তাকে বিবাহ করতে পারি। সে হবে মিশরের রাজা।' এই বিধবা রাজকন্যাটি যে টুটেনখামেনের স্ত্রী আঁখেসোনামুন তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন জার্মান প্রত্নবিদ হেরইডেল। মিশরের রাজধানী থীবস্ থেকে হিত্তী রাজধানী হাট্টুসাসের দূরত্ব সাতশ মাইলের বেশি। কি উপায়ে রাজকুমারী চিঠিটি অত দূরদেশে পাঠিয়েছিলেন তা আজ আর জানার উপায় নেই। তবে বুঝতে পারা যায়, কাজটি খুব গোপনে সারতে হয়েছিল তাঁকে। টুটেনখামেনের মৃত্যুর পর ৭০ দিন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শোক পালন করা হয়। এই সময়ে মরদেহকে নানা রাসায়নিক দ্রব্যে চর্চিত করে একটি বড় হলঘরে রাখা হয়। মুখ্য পুরোহিতের নির্দেশ-মত সেখানে রানীকে মৃতের কল্যাণকামনায় নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হত। শোকে মুহ্যমানা আঁখেসোনামুন নীরবে নতমস্তকে সব রকম অশৌচবিধি পালন করে যাচ্ছিলেন। মনে তাঁর এতটুকু শান্তি ছিল না। মৃত স্বামীর জন্য শোকের চেয়ে আরও বেশি ভয়াবহ মনে হচ্ছিল সেই আশঙ্কা, যা তাঁকে আই-এর অঙ্কশায়িনী হতে অচিরে বাধ্য করবে। আই-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার সত্যি কি কোন পথ নেই? আঁখেসোনামুন জানতেন, ৭০ দিনের অশৌচ পালনকালে কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে আসবে না। তাই দুঃসাহসে ভর করে তিনি দূত মারফৎ গোপনে একটি চিঠি পাঠি দিলেন হিত্তীরাজ সুবিলুলিমার কাছে। তাঁর মনে খুব আশা, বিপদের কথা শুনলে সৎ রাজা সুবিলুলিমা নিশ্চয়ই সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু সে যুগটা শিভালরির যুগ নয়—আর সুবিলুলিমাও এমন নির্বোধ ছিলেন না যে, মিথ্যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন। চিঠি পড়ে তিনি তো বিস্ময়ে হতবাক। কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় বিবাহ-প্রস্তাব দিয়ে এমন চিঠি লিখতে পারে এতো তাঁর ধারণার অতীত! মিশরের রানী হিত্তীরাজকে ধোঁকা দেবার জন্যই এমন একটি বিশ্রী রসিকতা করেননি তো? সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্রিসভার জরুরি অধিবেশন ডাকা হল। সকলেই একমত যে, ব্যাপারটি দস্তুরমত অভিনব এবং ইতিহাসে এর নজির আছে কিনা সন্দেহ। মিশরে কি বিবাহ-যোগ্য রাজপুত্রের এতই অভাব হয়েছে যে, সিংহাসনে বসাবার উপযুক্ত লোক জুটছে না!

তখন তখনই দূতকে ডেকে আদেশ দেওয়া হল, মিশরে গিয়ে ভালমত খোঁজ নিয়ে

এসো ব্যাপারটি আদৌ সত্যি কিনা। কিছুদিন পরে দূত ফিরে এলো রানীর দ্বিতীয় চিঠিটি নিয়ে। হিত্তীরাজকে উদ্দেশ্য করে মর্মস্পর্শী ভাষায় এখানে লেখা হয়েছে—'আপনি কেন ভাবছেন, আপনাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছি আমি? একটি পুত্র-সন্তান থাকলে কোন সমস্যাই ছিল না আমার—বিদেশী রাজার কাছে নিজেকে এত খেলো করতে হত না। কিন্তু অধীনস্থ কোন ক্রীতদাসকে যদি আমি বিবাহ করতে বাধ্য হই তবে তা হবে আমার পক্ষে আরও শতগুণ অপমানকর। আমি সেই কারণেই শরণাপন্ন হচ্ছি আপনার। আমি শুনেছি, আপনার একাধিক সুপুত্র বর্তমান—তাদের মধ্যে একটিকে আপনি আমাকে ভিক্ষা দিন। তাঁকে আমি পতিত্বে বরণ করব, সে হবে মিশরের ভাগ্যবিধাতা।' এই চিঠি পড়ে সংশয় দূর হল হিত্তীরাজ সুবিলুলিমার। সত্বর তিনি তাঁর এক ছেলেকে মিশরে পাঠিয়েছিলেন। রাজপুত্রটি কিন্তু কোনদিনই আঁখেসোনামুনের কাছে পৌঁছুতে পারেন নি।

রাজ-অন্তঃপুর থেকে বিদেশী রাজার কাছে যে চিঠি চালাচালি হচ্ছে, সে খবর এই নাটকের খলনায়ক আই-এর কাছে পূর্বেই পৌঁছেছিল। প্রতিশোধের একটি হিংস্র উপায়ও তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন। সীমান্ত প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যখন হিত্তীরাজকুমার মিশরের মাটিতে পা দিলেন, সেই মুহূর্তেই তাঁকে বন্দী করা হল। কয়েকদিন পর নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় তাঁকে। কেউ কেউ বলেন আই নয়, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে যাঁর হাত সবচেয়ে সক্রিয় ছিল তিনি হলেন সেনাপতি হোরেমহাব—লৌহমানব বলে মিশরে যাঁর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ ছিল। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে সুবিলুলিমা তখন তখনই মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন শুরু করার আদেশ দিলেন। অন্যদিকে অন্তঃপুরচারিণী আঁখেসোনামুন নীরবে অশ্রুপাত করলেন। শাস্ত্রবাক্য সত্য প্রমাণিত হল, ললাট-লিপিকে খণ্ডন করা যায় না—নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে। মহাসমারোহে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করলেন পলিতকেশ, লোলচর্ম, বৃদ্ধ রাজা আই।

তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল কিনা সে কথা কোন পাথর বা প্যাপাইরাসে লেখা নেই। ইতিহাসের পাতা থেকে অসুখী রাজকন্যা চিরবিদায় নিলেন; কেবল কয়েক বিন্দু অশ্রুজল ধরা থাকল তিন হাজার বছর পূর্বে ব্যবিলনিয়ান কিউনিফর্মে লেখা তাঁর দু'খানি পত্রে—যা হুগো ভিঙ্ক্লেরে বোঘাজ কোই থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

---

# প্রাচীন নিনিভের আবিষ্কারক বোটা

মেসোপটেমিয়ায় তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা অঞ্চলে যে সুপ্রাচীন মানব-সভ্যতার জন্ম হয়েছিল, তার ইতিকথা ইউরোপের শিক্ষিত লোকেরা ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভেও ভাল করে জানত না। ওই শতকের মাঝামাঝি সময়ে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও প্রাচীন লিপিমালার পাঠোদ্ধারের মধ্য দিয়েই জানা গেল, এদেশের উর্বরা মৃত্তিকাতেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যবিলনীয়া ও অ্যাসিরীয়ার উৎপত্তি ঘটেছিল। নদী বিধৌত এই অঞ্চলকে ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ বলা হয়েছে 'আরাম-নাহারাইম' বা দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। শব্দটি হিব্রু, যার গ্রিক অনুবাদ হচ্ছে মেসোপটেমিয়া। অ্যাসিরীয়া ছিল উত্তরে; দক্ষিণে সুমের ও আক্কাদ—সম্মিলিতভাবে যার নাম ব্যবিলনীয়া। এখানকার বর্তমান অধিবাসী, বেদুই ন ও কুর্দরা, বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও তাদের দেশের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সম্পর্কে কোনই খোঁজ-খবর রাখত না। প্রাচীন রাজাদের নাম জিজ্ঞাসা করলে তারা একমাত্র হারুন-আল-রশিদের নামটা কোনক্রমে বলতে পারত। স্মরণশক্তির সীমানা তাদের ওই পর্যন্তই—আরও অতীতে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে ছিল একান্ত দুঃসাধ্য।

মেসোপটেমিয়ার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ইউরোপীয় পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রথমটি হচ্ছে, ছোট বড় নানা আকারের মাটির ঢিবি—যে কোন দিগন্তবিস্তৃত মাঠে যার দু-একটিকে দেখা বিচিত্র ছিল না। ঢিবিগুলির গড়নও অদ্ভুত ধরনের। তাদের শীর্ষদেশ চেপ্টা এবং গাত্রাবরণে প্রচুর ফাটল। বাসি দুধ গরমে ফেটে গেলে যেমন আকার ধারণ করে অনেকটা সেইরকমের। আরও মজার কথা, ঢিবির কাছে-পিঠেই পাওয়া যায় ইট-পাটকেল, খোলামকুচি—যেগুলির গায়ে অনেক সময় সাঙ্কেতিক চিহ্ন বসানো থাকে। ভিজে বালির ওপর পাখি হেঁটে গেলে যেমন আঁচড় ফোটে চিহ্নগুলি অনেকটা সেইরকমের। এগুলি কারা লিখেছে, কেন লিখেছে, কি তাদের অর্থ—এসব জানা না-গেলেও বিদেশী পর্যটক এগুলি দেখে বিস্ময় বোধ করতেন। দু-একজন এগুলির রহস্যভেদ করতে চেষ্টা করেও কৃতকার্য হননি। তবে তাঁরা সকলেই জানতেন, এই সাঙ্কেতিক চিহ্নের অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে এমন কোনো রহস্য যার সমাধান হলে প্রাচীন জগতের অনেক অজ্ঞাত তথ্যই মানুষের জ্ঞানগোচর হবে।

ফরাসি যুবক পল এমিলি বোটা ছিলেন এমন এক সন্ধিৎসু পর্যটক। অল্প বয়সেই ভূ-পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন তিনি। অসাধারণ কর্তব্যপরায়ণ ও কর্মঠ এই যুবকের ছিল অপরিসীম সাহস ও শক্তিমত্তা। বিধাতাপুরুষ বোধহয় এমন বীরের হাতেই ভুবন জয়ের

ভার দিয়ে থাকেন। স্বদেশে থাকতে বোটা চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে পাঠ নিয়েছিলেন। তিনি অল্প বয়সে দেশ ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে কনস্টানটিনোপল শহরে এসে উপস্থিত হন। তুরস্কের শাসক মহম্মদ আলির প্রয়োজন ছিল একজন ইউরোপীয় চিকিৎসকের। ১৮৩০ সালে ভাগ্যক্রমে এই লোভনীয় পদটি বোটা পেয়ে যান। কিছুকালের মধ্যেই মহম্মদ আলির সুনজরে আসেন তিনি এবং দরবারে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। ফরাসি সরকার তাঁর গুণের পরিচয় পেয়ে তাঁকে স্থায়ীভাবে ফরাসি কূটনৈতিক বিভাগে চাকরি দেন। বোটা প্রথমে ফরাসি কনসাল হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়াতে আসেন—কিছুদিন পর সেখান থেকে মসুলে। কূটনীতির জগতে কয়েক বছর বিচরণ করে বোটা প্রাচ্য দেশের রাজনীতি—সুলতানের মতিগতি, দরবারের হালচাল, সভাসদদের চরিত্র ও রুচি—ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। মসুলে বদলি হওয়াটা বোটার জীবনে এক শুভ লগ্নের সূচনা করল। এখানেই তিনি রাজনীতি ও কূটনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়ে প্রত্নতত্ত্বে মন দেবার সুযোগ ও অবসর লাভ করেছিলেন। প্রায়ই সমস্ত দিনের কাজের শেষে বোটা ঘোড়া ছুটিয়ে দিতেন গ্রামাঞ্চলের দিকে। যেখানে শহরের কোলাহলের বাইরে সন্ধ্যায় প্রকৃতির শান্ত-সমাহিত রূপটি গভীরভাবে তাঁর হৃদয়কে নাড়া দিত। কখনও কোন বিরাট প্রান্তরে এসে ঘোড়া থেকে নামতেন—সামনেই তাঁর কোন ঢিবি বা স্তূপ। প্রকৃতিপ্রেমিক বিদেশী যুবা বিস্মিতনয়নে তাকিয়ে থাকতেন সেদিকে। জানতে চাইতেন, স্তূপের ভিতর কোন রহস্য লুকিয়ে আছে কিনা। বোটা নিজে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনো করেছিলেন ; এই ক'বছর কূটনৈতিক বিভাগে চাকরি করার ফলে রাজনীতিতেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করেছিলেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের মত দুরূহ বিষয়ে তাঁর অধিকার থাকবে কেমন করে ? যদিও স্কুল-কলেজে তিনি প্রত্নতত্ত্ব বা ইতিহাসের পাঠ নেননি—তবু এ বিষয়ে তাঁর এক সহজাত আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল এবং একজন ভাল প্রত্নবিদ হতে হলে যেসব গুণ থাকা দরকার সেগুলি তাঁর মধ্যে ছিল প্রচুর পরিমাণে। তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা জানতেন এবং তাদের সঙ্গে সোজাসুজি কথাবার্তা চালাতে পারতেন। আরব দেশের বিভিন্ন ভাষা, উপ-ভাষাতে তাঁর দখল ছিল যথেষ্ট। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে না পারলে এই অঞ্চলে খননকার্য চালানো খুব কষ্টকর হত। দ্বিতীয়ত, তাঁর ছিল অসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যবসায় এবং সেই সঙ্গে সুঠাম দৈহিক গঠন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন বলে তিনি সহসা ক্লান্ত হতেন না—সমস্ত দিন প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে খননকার্য পরিদর্শন করতে পারতেন। প্রয়োজন হলে যে কোনো ভারী কাজও অক্লেশে করতেন। দীর্ঘদিন ইয়েমেনের জলাভূমি অঞ্চলে থেকেও তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেনি একটুও। কোন-কোন দিন অফিসের দরজা বন্ধ করেই বোটা মসুলের আশেপাশের গ্রামগুলিতে বেড়াতে আসতেন। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পুরাবস্তুর সন্ধান করা তাঁর একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গ্রামের চাষীদের জিজ্ঞাসা করতেন, তারা



নিনিভে প্রাপ্ত সিংহ শিকারের দৃশ্য

কোন প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান দিতে পারে কিনা। প্রতিদিনই তিনি কিছু না কিছু পুরাতন জিনিস—ভাঙা ফুলদানি, ভাঙা মৃৎপাত্র বা মূর্তি—সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরতেন। যেদিন কিছু জুটত না সেদিন দুঃখিত হতেন। এইভাবেই চলত সান্ধ্যভ্রমণের সঙ্গে প্রত্নবস্তুর অনুসন্ধান। অনেক সময়ে গ্রামের চাষীদের এমন প্রশ্নও করতেন, তুমি যে তোমার বাড়িটি বানিয়েছ তার ইট এলো কোথা থেকে? অথবা, ঐ যে পোড়ামাটির ইট দেখা যায়, যার ওপর নক্সা আঁকা—এটি তুমি পেলে কোন জায়গায়? দুঃখের বিষয়, অজ্ঞ চাষী তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারত না। শুধু বলত, করুণাময় আল্লার মেহেরবাণিতে এমন ইট তো ছড়ানো আছে সারা দেশে, কেবল কষ্ট করে সংগ্রহ করলেই হল। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে যখন সুনির্দিষ্ট কোন ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পাওয়া গেল না তখন বোটা ঠিক করেন, জিজ্ঞাসাবাদে আর কাজ নেই—এবার সোজাসুজি কোদাল চালানোই ভাল। কিছু দূরেই কুয়িনজিকের স্তূপ—সেখানেই প্রথম খননকার্য শুরু হয়। খুব চমকপ্রদ ফল হাতে-হাতে পেলেন না তিনি। কয়েক সপ্তাহ মাটি খুঁড়ে কেবল অজ্ঞাত অক্ষর-অঙ্কিত কয়েক সহস্র পোড়ামাটির ইট পাওয়া গেল। ক্বচিৎ কখনও তিনি সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্মশ্রু-বিশিষ্ট মানুষের মূর্তিও পান। আরও নতুন কিছু নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে এই আশায় প্রত্নতাত্ত্বিকের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বেশ কিছুদিন এইভাবে কাজ চলে। কিন্তু বোটার আশা অপূর্ণ থেকে যায়। পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি যখন ভাবতে শুরু করেছেন, এবার কাজ বন্ধ করার সময় হয়েছে, আর খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে লাভ নেই তখনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এক সন্ধ্যায় দীর্ঘদেহী এক আরব অভিবাদন করে তাঁর সামনে দাঁড়ায়। হেসে জিজ্ঞেস করে, সাহেব কি নক্‌সা-আঁকা ইট খুঁজছেন? তা চলুন না আমার গ্রামে—এমন ইট সেখানে প্রচুর। গাঁয়ের লোকরা সেখানে এই ইটেই উনুন পাতে, দেয়াল তোলে, ছাদ সারাই করে। আরবটির কথা মন দিয়ে শোনেন বোটা। এর নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই—কিন্তু নাম-না-জানা অজ্ঞাত এই লোকটির আগ্রহাতিশয্যেই সম্ভব হয়েছিল সে যুগের এক মহৎ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। যে গ্রামটির কথা সে বলেছিল, সেটি বেশি দূরে নয়। কাছেই সেই গ্রামে—খোর-শাবাদে বোটা দুজন অনুচর পাঠিয়ে দিলেন। তারা আগে দেখে আসুক, খবরটা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য। ক'দিনের মধ্যে ঘুরে এসে তারা যে সংবাদ দিল তাতে বোটা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করলেন। তিনি বুঝলেন এতদিনে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হতে চলেছে—তিনি কোন প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পেয়ে গেছেন। তিনি সদলবলে খোরাশাবাদে এসে খননকার্য শুরু করে দিলেন। সুফল পেলেন হাতে-হাতেই। মাটি কাটা শুরু করে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ল বৃহৎ দেয়ালের একটি অংশের ওপর। বিচিত্র কারুকার্যখচিত সেই দেয়াল, মাঝে-মাঝে যার বিরাট স্তম্ভ। মাটি কাটার সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত সব নিদর্শন উঠে আসতে থাকল—ডানাযুক্ত জন্তুজানোয়ার, দীর্ঘশ্মশ্রু-বিশিষ্ট মানুষ—বেগবান অশ্বে আরূঢ় যোদ্ধা—ইত্যাদি, এমন সব নিদর্শন যা

ইতিপূর্বে কোথাও পাওয়া যায়নি। আসলে বোটা যেখানে খনন শুরু করেছিলেন সেখানেই ছিল অ্যাসিরীয় রাজা সারগনের রাজপ্রাসাদটি। সমগ্র নিনিভের আবরণ উন্মোচন তখনও সম্ভব হয়নি—সবেমাত্র কিয়দংশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীকালে অ্যাসিরীয়া-ব্যবিলনের লুপ্ত জগৎকে উদ্ধার করতে অনেক প্রত্নবিদ এগিয়ে এসেছিলেন—এবং বোটার আরব্ধ কাজকে তাঁরা সুসম্পন্ন করে গেছেন, তবে পথিকৃতের প্রাপ্য সম্মান থেকে বোটাকে বঞ্চিত করা যাবে না।

এই আবিষ্কারের কাহিনী বোটা গোপন রাখেননি। তিনি স্বদেশে তারবার্তা পাঠিয়ে সবিশেষ জানিয়ে দেন; বন্ধুদের লেখেন, তাঁর এই আবিষ্কারের কাহিনী যেন বড় বড় হরফে সংবাদপত্রে ছাপা হয়। ফ্রান্সে এই কাহিনী প্রচারিত হওয়া-মাত্র জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগে ; তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বোটাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য পাঠিয়ে দেন। এযাবৎ সকলেই জানত, মিশর হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার পীঠস্থান। মেসোপটেমিয়ার খবর কেউ জানত না। দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের সভ্যতার কথা বাইবেলে বর্ণিত হলেও বাইবেলকে নানা কথা-উপকথার সংগ্রহ-মাত্র বলে ভাবা হত। তার মধ্যে খাঁটি ইতিহাস যেটুকু আছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। গ্রিক লেখকদের রচনায় এ দেশের উল্লেখ থাকলেও সেখানে এত আপাতবিরোধী উক্তি ছিল যে, ঐ অঞ্চলের প্রকৃত চিত্রটি সম্বন্ধে কারও কোন ধারণা হয়নি। বোটার আবিষ্কার খ্রিস্টের জন্মের সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বেকার এক অতি সুমহান সভ্যতার পরিচয় দিল। কিন্তু যে মুহূর্তে বোটা সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উঠেছেন সেই মুহূর্তে অবিবেচক ও দুনীর্তিগ্রস্ত তুরস্ক সরকার তাঁর কাজে নানাবিধ বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের কোন কৌতূহল ছিল না। উপরন্তু স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিরা বলে বেড়াতে লাগলেন যে, সাহেবরা যে খোরশাবাদে এত পয়সা ঢেলে খননকার্য চালাচ্ছেন তার আসল উদ্দেশ্য হল, মাটির নিচে কোথাও সোনা পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখা। সোনার লোভেই এরা নাকি খোঁড়াখুঁড়ি করছে—ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব সবই লোক-ভোলানো কথা। তুর্কি শাসকের উপাধি হল পাশা। এই পাশা অতি সাংঘাতিক কুচক্রী। বিনা কারণে খননকার্যে অংশগ্রহণকারী কুলি-মজুরদের ধরে নিয়ে তিনি জেলে পুরলেন। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য চলল অন্যায় পীড়ন। অদ্ভুত তাঁর প্রশ্ন—এযাবৎ কত সোনা সাহেবের জন্য তুলেছে তারা? কত সোনা সাহেব পাচার করেছেন দেশে? এত পীড়নেও কোন লাভ হল না। অশিক্ষিত কুলিমজুর—তারা যা দেখেছে তাই বলল। যে জিনিস ঘটেনি তা তারা বানিয়ে বলবে কেমন করে? কার্যসিদ্ধি না হওয়ায় পাশা আরও ক্ষিপ্ত হলেন। রাজধানীতে খবর গেল, 'খেরেস্তানরা' ষড়যন্ত্র করতে উদ্যত—খোরশাবাদে তারা এক কেল্লা বানাতে চায়, সেইজন্যই মাটি খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। এই মুহূর্তে তাদের না আটকালে, দেশের

স্বাধীনতা বিপন্ন হতে বাধ্য। এরপর গুপ্তচরে সারা খোরশাবাদ ছেয়ে গেল। কুলিমজুররা ভয়ে কাজ করতে চায় না। বোটা এক মহা-সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন। তবে তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি এদেশের হালচাল ভাল-রকমই জানতেন। তাই তিনি ভাল মানুষের মত চুপচাপ না থেকে ষড়যন্ত্র দিয়েই ষড়যন্ত্র রুখতে উদ্যত হলেন। রাজধানীতে তাঁর প্রভাব বড় কম ছিল না। কিছুকাল আগেও তিনি সেখানে সুলতানের মুখ্য চিকিৎসকের কাজ করে এসেছেন। এই ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির বলেই তিনি কুচক্রী পাশার হীন ষড়যন্ত্র বানচাল করতে উদ্যত হলেন। পাশার চেষ্টা ছিল, কি করে খোরশাবাদে খননকার্য চালাবার অনুমতিপত্রটি নাকচ করা যায়। সে অপচেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হলেন। কিন্তু ক্ষতি যেটুকু করলেন সেটুকু কম নয়। তাঁর ভয়ে কুলি-মজুরদের একটা বৃহৎ অংশ কাজ ছেড়ে দিল। নির্ভীক বোটা পাশার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। যে অল্প-সংখ্যক অনুচর তখনও তাঁর হাতে ছিল তাদের দিয়েই অসাধ্য সাধন করলেন। অ্যাসিরীয়ার রাজা সারগনের (৭২২-৭০৫ খ্রিঃ পূঃ) প্রাসাদটি তিনি মাটি খুঁড়ে বার করলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, প্রাচীন নিনিভের উপকণ্ঠে অবস্থিত এই প্রাসাদটি রাজাদের গ্রীষ্মাবাস-রূপে ব্যবহৃত হত। বোটার মনে হল, এটি যেন অ্যাসিরীয়াদের ভের্সাই প্রাসাদ-গঠননৈপুণ্য ও শিল্প শোভায় প্রাসাদটি অতুলনীয়। বিরাট কক্ষ, প্রশস্ত চত্বর ও অলিন্দ, অসংখ্য স্তম্ভযুক্ত সুদৃশ্য দেয়াল—এসবই অ্যাসিরীয় স্থাপত্যশিল্পের বিরাট মহিমা প্রচার করছে। রাজপ্রাসাদে অবস্থিত এমন অনেক পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, যেগুলি ভঙ্গুর। পুরাতন-জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বলে হাত লাগলেই সেগুলি ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। এই ভঙ্গুর নিদর্শনগুলির নকসা এঁকে রাখবার জন্য ফরাসি সরকার এক নামকরা ড্রাফটসম্যান-ফ্লাদাকে খোরশাবাদে পাঠিয়ে দিলেন। ফ্লাদা সযত্নে তাঁর কাজটি করেছিলেন। তাঁর আঁকা ছবিগুলি এখন প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান।

এরপর, ঐতিহাসিক নির্দশনগুলি কিভাবে দেশে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে ভাবতে শুরু করলেন বোটা। যতক্ষণ এগুলি ইউরোপে না পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ মনে শান্তি ছিল না তাঁর। পাঠাবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলেন তিনি। তাইগ্রিস নদীর ওপরের পার্বত্য অংশটি খরস্রোতা। এখানে তিনি একটি বড় ভেলায় পাথরের কিছু নিদর্শন জড়ো করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড স্রোতে লাট্টুর মত ঘুরপাক খেতে-খেতে ভেলাটি নিমেষের মধ্যে জলে নিমজ্জিত হল। এতকাল মাটির নিচের অন্ধকারে যে নিদর্শনগুলি আত্মগোপন করেছিল—তারা আবার জলের অতলে বিলীন হয়ে গেল। এরপর আরও সাবধান হলেন বোটা। আরও দক্ষিণে—নদী যেখানে অনেকটা শান্ত—সেখানে পুরাবস্তুগুলিকে বড় নৌকায় চাপানো হল। এবার আর কোন অঘটন ঘটল না। ধীরে-ধীরে নৌকাটি নদী-মোহনায় পৌঁছে গেল। সেখানে অপেক্ষা করছিল

একটি সাগর পারাপারের বড় জাহাজ। নিদর্শনগুলি তোলা হল সেখানে। কয়েক মাস সমুদ্রে পাড়ি দেবার পর এই প্রত্নসম্পদ নিয়ে জাহাজটি নির্বিঘ্নে ফরাসি বন্দরে পৌঁছে গেল। তারপর, এক শুভদিনে বিখ্যাত ল্যুভের মিউজিয়ামে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল—সেখানে সর্বপ্রথম ফ্রান্সের লোক অ্যাসিরীয়ান রাজপ্রাসাদের প্রত্নসম্পদ দেখবার সুযোগ লাভ করল। সকল শ্রেণীর লোক মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ জানালেন বোটার প্রচেষ্টাকে। তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছিল এমন একটি যুগান্তকারী প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। বোটার সঙ্গে মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা বেলজোনির তুলনা করা চলে। তাঁরা উভয়ে কেউ বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন না—তাঁরা ছিলেন মুখ্যত সংগ্রহকারক। অর্থাৎ অতীতের অন্ধকার থেকে পুরাবস্তুকে আলোকে নিয়ে আসাই তাঁদের প্রধান কাজ ছিল এবং সেই কাজই তাঁরা করে গেছেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে।

---

# নিমরুদের খননকার্য ও লেয়ার্ড

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডে ক্রিস্টাল প্যালেসের এগজিবিশনে একটি বিশেষ প্রদর্শনী-মঞ্চ হাজার-হাজার দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এটি হচ্ছে, সেই সিরিয়ান কক্ষ যেখানে মেসোপটেমিয়া থেকে আনীত প্রত্নসম্পদ সর্বপ্রথম জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করা হয়। বাইবেলে যে প্রাচীন শহরগুলিকে বিলাস-ব্যসনের কেন্দ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের ঐশ্বর্য-সম্পদ যে নিছক কবি-কল্পনা নয়, ঐতিহাসিক সত্যও বটে, একথা ইংলন্ডের লোকেরা প্রথম জানতে পারল। প্রদর্শনীর কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়েছিল অ্যাসিরীয়ান আদলে তৈরি বিরাট এক সিংহদ্বার। ভিতরের দুটি কক্ষে রাখা হয়েছিল অ্যাসিরীয়া-ব্যবিলনের যা কিছু মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার-হাজার লোক ভিড় করে দেখতে এল—ডানাযুক্ত নরসিংহ মূর্তি, দীর্ঘশ্মশ্রুযুক্ত বলিষ্ঠ যোদ্ধা, মৃগয়া-নিযুক্ত অ্যাসিরীয়ান নৃপতির তেজদৃপ্ত ভঙ্গি এবং সর্বোপরি মোজেইক-করা টালির উপর সাদা অক্ষরের বিচিত্র কিউনিফর্ম লিপিগুলি।

যাঁর জীবন-ভোর সাধনায় প্রদর্শনীতে এই প্রাচীন নিদর্শনগুলি দেখানো সম্ভব হল, তাঁর নাম অস্টিন হেনরি লেয়ার্ড। স্লীম্যান ও রলিনসনের মত অতিঅল্প বয়সে তিনি প্রত্নতত্ত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এক অবস্থাপন্ন বিত্তশালী পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন সিলোন সিভিল সারভিসেস-এর সদস্য। লেয়ার্ড-এর জন্ম প্যারিস শহরে ১৮১৭ সালে। তাঁর বাল্যকাল কাটে ফ্রান্স ও ইটালিতে। স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে পিতা-মাতা যখন তাঁকে ইংল্যান্ড আনলেন তখন তাঁর বয়স চোদ্দ বছর। পিতার ইচ্ছা ছেলে আইনজ্ঞ হোক—তাই আইন শিখতে তাঁকে এক কলেজে পাঠালেন। কিন্তু বেশিদিন পড়াশুনো ভাল লাগল না লেয়ার্ডের। একদিন পিতার উচ্চাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে গৃহের নিশ্চিন্ত আরাম ত্যাগ করে লেয়ার্ড ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়লেন। রক্তে যাঁর অ্যাডভেনচারের নেশা, ঘরের আরাম তাঁর ভাল লাগবে কেন? ছোটবেলায় রূপকথার গল্প মন দিয়ে শুনতেন লেয়ার্ড। একটু বড় হয়ে নিজেই পড়েছিলেন স্কটের উপন্যাস ও অ্যারিবিয়ান নাইটস। স্কটের চেয়ে আরব্যোপন্যাসই তাঁর মনকে বেশি নাড়া দিয়েছিল। রূপকথা ও ম্যাজিকের রাজ্য আরব দেশে যাবার জন্য তিনি মনে-মনে এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেন। অবশেষে, প্রাচ্য দেশে যাবার এক সুযোগও উপস্থিত হয়। এক আত্মীয়ের সুপারিশে সিংহলের চা-বাগানে এক চাকরির ব্যবস্থা করে ফেলেন তিনি। সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হল বন্ধু মিটফোরড—যে ঐ বাগানেই আর একটি চাকরি পাবে বলে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। উভয়ে একসঙ্গে দেশত্যাগী হবেন ঠিক করেন তাঁরা। ইউরোপ

থেকে এশিয়া যাবেন হাঁটা-পথে। লেয়ার্ডের পকেটে মাত্র দুশ পাউন্ড, মিটফোরডের আরও কম। এত কম অর্থে তো আমির ওমরাহ্‌র চালে যাওয়া যাবে না—যেতে হবে দীন-তীর্থযাত্রীর মত। ঠিক হল, কনস্টানটিনোপল, বাগদাদ, বসরা পেরিয়ে তাঁরা পৌঁছবেন পারস্য-সাগর উপকূলে—সেখান থেকে সমুদ্রপথে রওনা হবেন সিংহলের রাজধানী কলম্বোর উদ্দেশ্যে। একটু-আধটু আরবি-ফারসি শিখে নিয়েছিলেন লেয়ার্ড, কিন্তু সঙ্গীটি ইংরেজি ছাড়া কোন ভাষাতেই কথা বলতে পারত না। যাত্রা শুরু করে প্রথম বাধা এল, পূর্ব ইউরোপে বুলগেরিয়াতে। মারাত্মক পেটের ব্যামোতে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন লেয়ার্ড। এক আর্মেনিয়ান ডাক্তার ডেকে আনা হল। পেটের খানিকটা অংশ কালি দিয়ে দাগ টেনে দিলেন তিনি। তারপর সেটুকু জায়গায় জোঁক বসানো হল। ডাক্তারের মতে দূষিত রক্ত বেরিয়ে গেলেই যন্ত্রণার উপশম হবে। ডাক্তারের সুচিকিৎসায় কিনা জানা নেই—ব্যথা কমল। তবে রক্ত-ক্ষরণজনিত দুর্বলতায় তিনি নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারালেন। কাজেই কয়েক সপ্তাহ তাঁকে শুয়েই থাকতে হল। এদিকে হাতে যে সামান্য টাকা ছিল তা তো ফুরিয়ে গেল। বুলগেরিয়া থেকে জেরুজালেমে পৌঁছতে দেরি হল অনেকটা। কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ নেই। জেরুজালেম থেকে এবার সোজা রাস্তায় অ্যালোপ্পোতে পৌঁছে লেয়ার্ড কয়েক দিন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখে বেড়ালেন। ততদিনে তাঁর পূর্ব-স্বাস্থ্য ফিরে এসেছে—ঘোরাঘুরি করতে তেমন কষ্ট হয় না আর। কিন্তু বন্ধু মিটফোরড কেবলই তাড়া দেন—ভয় দেখান, ঠিক সময়ে গন্তব্যস্থলে না পৌঁছতে পারলে চা-বাগানের চাকরি হাতছাড়া হবে। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের রহস্যময় জগতে যতই লেয়ার্ড বিচরণ করছেন, ততই তাঁর মন থেকে চা-বাগানের মোহ কেটে যাচ্ছে। অবশেষে, তিনি একদিন মিটফোরডকে বিদায় দিলেন। তাঁকে বললেন, মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্তি খুঁজে বার করার জন্য তিনি এই অঞ্চলেই থেকে যাবেন। চাকরির কোন প্রয়োজন নেই তাঁর—তাড়া নেই বাড়ি ফেরার। ট্রয়নগরীর আবিষ্কারক স্লীম্যান হোমার পড়ে ট্রয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। তবে তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন না করা পর্যন্ত, খননকার্যে হাত দেননি। আগে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনকুবের হলেন—তারপর অর্থোপার্জনের সব ধান্দা ছেড়ে দিয়ে, সারাজীবন প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে মেতে রইলেন। এজন্য তিনি স্ত্রীকেও ছেড়েছিলেন। লেয়ার্ডের কিন্তু এত দেরি সইছিল না। বড়লোক হতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়—তাতে অনেক সময় নষ্ট হবে। তাই কোন প্রস্তুতির অপেক্ষা না রেখে, ভাগ্যতাড়িত ভবঘুরে যুবক প্রায় ঝড়ের মতই মেসোপটেমিয়ার প্রত্নক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। কেবল অ্যাডভেনচারের নেশা, বুকভরা সাহস ও আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে তিনি এগিয়ে চললেন বিধিনির্দিষ্ট পথে। প্রথম দু'বছর লেয়ার্ড মেসোপটেমিয়ার নানা অঞ্চল দেখে বেড়ালেন। রাস্তাঘাটের পরিচয় নিলেন, খবর নিলেন কোথায় কোন্ খননযোগ্য টিবি আছে। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ওদের বন্ধুস্থানীয় হয়ে

উঠলেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় ভাষাও বেশ রপ্ত হল তাঁর—সকলের সঙ্গেই বেশ মনখোলা আলাপ করতে পারতেন। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লেয়ার্ড লিখেছিলেন নিনিভে সংক্রান্ত তাঁর পুস্তকে। বিদেশী যুবক মাইলের পর মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতেন দূরদূরান্তে, কোনদিন সন্ধ্যায় সহৃদয় কোন শেখ তাঁকে আশ্রয় দিত নিজগৃহে—আন্তরিকতাপূর্ণ আতিথ্যে দূর হত পথের ক্লান্তি। আবার এমন দিনও এসেছে, যেদিন পথে বেদুইয়ন দস্যুদের কবলে পড়ে সর্বস্ব খুইয়েছেন তিনি।

যে স্তূপটি লেয়ার্ডকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল, সেটি মসুলের কিছু উত্তরে অবস্থিত—নিমরুদের ঢিবি। প্রথম থেকেই তাঁর লক্ষ্য, এটি খনন করে দেখবেন কোনো প্রত্নসম্পদ উদ্ধার হয় কি না। কিন্তু হাতে প্রচুর অর্থ না থাকায় তাঁর ইচ্ছা পূরণ হচ্ছিল না। তা ছাড়া তাঁর লোকবলই বা কোথায়? শেষে সাহায্যের জন্য তিনি কনস্টান্টিনোপল-এর ইংরেজ রাষ্ট্রদূত স্যার স্ট্রাটফোরড ক্যানিং-এর দ্বারস্থ হন। তাঁকে খুলে বলেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। রাষ্ট্রদূত ইংরেজ যুবকের আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু তখন-তখনই কি করে তাঁকে সাহায্য করবেন ভেবে পেলেন না। লেয়ার্ডকে তিনি ইংরেজ দূতাবাসে কিছুকালের জন্য একটি চাকরি জোগাড় করে দেন। এতে সাময়িকভাবে তাঁর আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের পরিকল্পনাটি আদৌ ফলপ্রসূ হল না। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল ফরাসি যুবক-বোটার সাফল্যের কথা। বোটার দাবি, তিনি প্রাচীন নিনিভের সন্ধান পেয়েছেন। এই খবর শুনে লেয়ার্ড উৎফুল্ল হননি। তিনি বিমর্ষচিত্তে ভাবলেন, এক সুবর্ণ সুযোগ হাত-ছাড়া হল। যে আবিষ্কার তাঁর দ্বারা সম্ভব হতে পারত, তা সম্ভব করলেন একজন ফরাসি পর্যটক। অথচ দেশীয় সরকার অনুকূলে থাকলে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে আশানুরূপ অর্থসাহায্য পেলে তিনিও অসাধ্যসাধন করতে পারতেন। আর কেউ না বুঝুক, তাঁর মনের দুঃখ বুঝেছিলেন স্ট্রাটফোরড ক্যানিং। তিনি লেয়ার্ডকে স্থায়ীভাবে চাকরি দিয়ে ইংরেজ দূতাবাসে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সুপারিশ ইংরেজ সরকার গ্রহণ করেননি। এখানে যখন তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিককে সাহায্য করা গেল না, তখন ক্যানিং ঠিক করলেন, সাময়িকভাবে হলেও নিজের পকেট থেকেই খননকার্য চালাবার খরচ জোগাবেন। মাত্র ৬০ পাউন্ড সাহায্যস্বরূপ লেয়ার্ডের হাতে তিনি তুলে দেন। এই অত্যল্প অর্থ নিয়েই খনন শুরু করেন লেয়ার্ড। ক্যানিং জানতেন, খননকার্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সংবাদ পাওয়া গেলেই ইংলন্ডের লোকেরা স্বতঃপ্রণোদিত-ভাবে প্রত্নতাত্ত্বিককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। তাঁর আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি।

মাত্র ৬০ পাউন্ড পকেটে নিয়ে লেয়ার্ড মসুলে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলেন, নিমরুদে খননকার্য চালাবার অভিপ্রায়টি গোপন রাখবেন। এমন ভাণ করলেন যে, তিনি এক বিদেশী শিকারি—বন্য-বরাহ শিকার করবেন বলে তাইগ্রিসের তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নিমরুদ অভিমুখে যেদিন তিনি যাত্রা করেন সেদিন শিকারের সরঞ্জাম ছাড়া

তাঁর সঙ্গে চলল মাটি খোঁড়ার শাবল-গাঁইতি-কোদাল। লেয়ার্ডের এই সতর্কতার কারণ আছে। তিনি জানতেন, মসুলের শাসনকর্তা মহম্মদ পাশা এক অতি জঘন্য চরিত্রের ব্যক্তি। যেমন তাঁর চেহারা, তেমনই চরিত্র। সারা মুখে বসন্তের দাগ, এক চোখে দেখেন না এবং এক কানও কাটা। কুটিল, কুচক্রী, অসৎ ও অত্যাচারী বলে তাঁর খুব দুর্নাম। পাছে এমন লোক হঠাৎ তাঁর কাজে বাধা দিয়ে বসেন সেই আশঙ্কায় লেয়ার্ড তাঁর সঙ্কল্পের কথা গোপন রেখেছিলেন। পাশা কি ধরনের খামখেয়ালি ও অত্যাচারী ছিলেন তাঁর একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট। প্রজাদের কাছ থেকে পাশা জোর করে এক ধরনের কর আদায় করতেন—'দন্ত-শুল্ক' বা টুথ-ট্যাকস—যার অর্থ হচ্ছে, খেতে গিয়ে নিরন্তর চিবুতে হয় এবং চিবুতে চিবুতে পাশার দাঁত ক্ষয়ে যাচ্ছে—অতএব অনুচররা ট্যাকস জোগাবে এই ক্ষতিপূরণের জন্য। এ ধরনের পাগলামি কেবল আরব্য উপন্যাসের জগতেই সম্ভব।

মসুল থেকে যাত্রা শুরু করে লেয়ার্ড নিমরুদে এসে পৌঁছলেন। পৃথিবীর সভ্যসমাজ থেকে অনেক দূরে নিমরুদ ছোট্ট একটি ঘুমন্ত গ্রাম। গ্রামের অদূরে এই নামেরই স্তূপটি বরাবরই প্রত্নতাত্ত্বিকদের কৌতূহল জাগাত। অতি দরিদ্র বেদুইন-জাতীয় লোকদের বসবাস এখানে। ছোট-ছোট কুঁড়েঘরে কায়ক্লেশে দিন কাটায় তারা। জীবিকার জন্য চুরি-ডাকাতিও করে। লেয়ার্ড বুদ্ধি করে প্রথমেই গাঁয়ের মোড়ল শেখ আওয়াদের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে ফেললেন। এই শেখের বাড়িতেই রাত্রে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। দরিদ্র হলেও এরা অতিথিকে সেবা করতে জানে। সে রাত্রে খড়ের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে লেয়ার্ড স্বপ্ন দেখলেন, মাটির নিচে বিরাট এক রাজপ্রসাদ, এক দৈত্য তার সিংহদ্বারটি আগলে আছে। প্রাসাদের গায়ে অসংখ্য চিত্র খোদিত। লেয়ার্ড বার-বার চেষ্টা করলেন ঐ প্রাসাদে ঢুকতে—কিন্তু দৈত্যের ভয়ে খানিকটা গিয়েও পিছিয়ে আসেন। সকালের সূর্যালোক গায়ে পড়ে, ঘুম ভেঙে যায় বিদেশী পর্যটকের। সমস্ত দিনের কঠিন পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত হন তিনি। শেখ আওয়াদ আগেই ছ'জন কুলি ঠিক করে রেখেছিল খননকার্যে লেয়ার্ডকে সাহায্য করবে বলে। শক্তসমর্থ আরব-কুলি, বলিষ্ঠ তাদের দেহের গঠন। লেয়ার্ড সন্তুষ্ট হন তাদের দেখে। এবার কাজ শুরু করার পালা। শেখকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে তিনি নিমরুদ পরিক্রমণ করে এলেন। ঢিবির ঠিক শীর্ষে একটুকরো পাথর মাথা উঁচু করে আছে। শেখের কথামত এখানেই প্রথম কোদালের কোপটি পড়ল। খুব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মাত্র ছ'জন কুলি নিয়ে কাজ আরম্ভ করে প্রথম দিনেই লেয়ার্ড দুটি অ্যাসিরীয়ান রাজপ্রাসাদের সন্ধান জেনে গেলেন। কুলিদের দু'ভাগে ভাগ করে দুই সারিতে কাজ করাচ্ছিলেন লেয়ার্ড। প্রথম দলটি ঘণ্টাখানেক কাজ চলার পরই একটি কারুকার্যখচিত দেয়ালের অংশ খুঁজে পেল। দেয়ালের উপর একটি রণক্ষেত্রের দৃশ্য খোদিত। তিনজন অ্যাসিরীয় যোদ্ধা একটি রথে আরুঢ়। দুজনের মুখাবয়ব দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত। কিন্তু মধ্যবর্তী তৃতীয়জন শ্মশ্রুবিহীন, হয়ত খোজা। যোদ্ধা আপাদমস্তক বর্মে আবৃত,

তিনি আকর্ণ ধনুকের জ্যা আকর্ষণ করে রেখেছেন। এখনই বুঝি বাণটি ছেড়ে দেবেন শত্রুর দিকে। যোদ্ধার পেশী স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বেগবান অশ্বের চলার ভঙ্গিটিও কি তেজদৃপ্ত। শিল্পীর কলানৈপুণ্যে সমস্ত চিত্রটি অতি-জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। লেয়ার্ড ভাল ছবি আঁকতে পারতেন—তাই অবসর সময়ে বহু কষ্টস্বীকার করে দেয়ালের ছবিগুলি নিজের খাতায় তুলে নিয়েছিলেন।

নিমরুদের খননকার্যে সমস্ত মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন লেয়ার্ড। তাঁর এই উন্মাদনার ভুল ব্যাখ্যা করল অশিক্ষিত স্থানীয় অধিবাসীরা। একদিন শেখ আওয়াদ লেয়ার্ডকে এক পাশে ডেকে এনে বলল, বুঝতেই তো পারছি, সাহেব কিসের আশায় এমন খরচপত্র করে দিনের পর দিন খোঁড়াখুঁড়ি করছেন। তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে যদি কোন দিন সত্যি মাটি থেকে সোনা উঠে আসে, তখন যেন শেখের উচিত প্রাপ্য অংশের কথা সাহেব ভুলে না যান। লেয়ার্ড বুঝলেন, এমন অজ্ঞ লোককে যতই বোঝান কিছুতেই সে বুঝবে না, বিশ্বাসও করবে না। অতএব এক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই ভাল। কিন্তু চুপ করে তিনি বেশিদিন থাকতে পারলেন না। কারণ, যদিও বা অশিক্ষিত শেখের হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় ছিল, কুচক্রী পাশার হাত থেকে বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই রইল না। পাশা তাঁর গুপ্তচর মারফত লেয়ার্ডের খননকার্যের বিবরণ সংগ্রহ করছিলেন। একদিন পাশার এক অফিসার লেয়ার্ডকে এসে বললেন যে, তাঁদের কাছে খবর গেছে যে, নিমরুদ থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা তুলেছেন সাহেব। পাশার ইচ্ছা নয় যে, এ জাতীয় খোঁড়াখুঁড়ি তাঁর এলাকায় আর একদিনও চলে। লেয়ার্ড তখনই ছুটে এলেন মসুলে। ভাবলেন, পাশাকে সব ব্যাপারটা খুলে বললে তিনি হয়ত বুঝবেন। পাশা যেন বিনয় ও ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। সব কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনে তিনি বললেন, সাহেবের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করার কোন ইচ্ছা আদৌ তাঁর নেই। তবে একটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। নিমরুদের যে অঞ্চলে খনন শুরু করেছেন সাহেব, তারই পাশে আছে মুসলমানদের পবিত্র গোরস্থান। খননের ফলে এই কবরগুলি অপবিত্র হয়েছে বলে একদল লোক তাঁর কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। এই অশিক্ষিত লোকেরা যদি কোনদিন ক্ষেপে গিয়ে সাহেবকে আক্রমণ করে বসে তাহলে পাশা কোনমতেই তাঁকে বাঁচাতে পারবেন না। সেইজন্য তাঁকে অনুরোধ করা হচ্ছে, সময়মত সাবধান হোন। লেয়ার্ড দেখলেন, কথাগুলি যুক্তিযুক্ত এবং জনসাধারণের আপত্তিরও ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে। বিমর্ষচিত্তে তিনি ফিরে আসেন নিমরুদে। সন্ধ্যায় তিনি নিজেই যাচাই করে দেখতে চান, সত্যি মুসলমানদের কবর অপবিত্র হয়েছে কি না। তিনি দেখলেন, পাশার কথাই ঠিক। নিমরুদে যেখানে কুলিরা খাদ কাটতে শুরু করেছে সেখানে নানা আকৃতির কবরের পাথর এদিক-ওদিক ছড়ানো। লেয়ার্ড ভাবলেন, সময়মত এগুলি কেন তাঁর নজরে এলো না। প্রথম থেকেই এ বিষয়ে সতর্ক হলে কোন বাধাবিপত্তি ঘটত না। লেয়ার্ডের হিসাবে কিন্তু বড়রকমের একটা ভুল থেকে যাচ্ছিল।

গত দু'রাত্রি ধরে নিমরুদের খাদের ধারে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল সে সম্বন্ধে অবহিত থাকলে, তাঁর মনে এমন ক্ষোভ আসত না। খাদের ধারে নৈশ-প্রহরার ব্যবস্থা থাকলে পাহারাদাররা নিশ্চয়ই দেখত গভীর রাত্রে কিছু লোক খাদের কাছে-পিঠে বড় বড় পাথরের চাঁই এনে ফেলছে। কি তাদের উদ্দেশ্য কেউ জানত না। একটানা কয়েকদিন কাজ বন্ধ। মনে-মনে খুব অশান্তি ভোগ করছেন লেয়ার্ড। শেষে তিনি চলে আসেন পাশার সেই অফিসারটির কাছে, অমায়িক মিষ্ট ব্যবহারে জয় করেন তাঁর মন। কোন কারণে অফিসারটির সঙ্গে পাশার বনিবনা হচ্ছিল না, তাই তিনি অকপটে জানান, পাশার কারসাজির কথা। পাশার হুকুমেই গত দু'রাত্রি তিনি তাঁর দলবল নিয়ে কাছে-পিঠে যত কবর আছে, সেগুলি খুঁড়ে পাথরের চাঁই এনে জড় করেছেন নিমরুদের টিবির কাছে। মিথ্যে-কবর দেখাতে গিয়ে তাঁরা সত্যিকারের অনেক কবর অপবিত্র করেছেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এরপর এমন একটি ঘটনা ঘটল, যার ফলে লেয়ার্ডের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বহুদিন ধরে স্থানীয় লোকেরা পাশার অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। এবার তাদের এক অভ্যুত্থানের ফলে পাশা ক্ষমতাচ্যুত হলেন। পরবর্তী শাসক যিনি মসুলে ক্ষমতাসীন হলেন তিনি অত্যন্ত ভালমানুষ—লেয়ার্ডের কাজে বাধা সৃষ্টি করবেন এমন কোন দুরভিসন্ধি তাঁর ছিল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার কাজে মন দিলেন লেয়ার্ড।

একদিন সকালে লেয়ার্ড গিয়েছিলেন গ্রামের দু-একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি যখন বেশ খোশ-মেজাজে গল্প জমিয়েছেন তখন দেখেন দু'জন লোক ছুটতে-ছুটতে তাঁর দিকে আসছে। একজন তাঁকে উত্তেজিতভাবে জানাল, শিগগির চলুন খাদে, সকলে বলছে দেবতা নিমরুদ নাকি মাটি থেকে উঠে এসেছেন। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন লেয়ার্ড—কি ব্যাপার স্বচক্ষে দেখতে। এসে দেখেন, উত্তেজিত কুলিরা খানিক দূরে জটলা করছে, তাদের শাবল-গাঁইতি সব একপাশে পড়ে আছে। খাদের মধ্যে বিরাট এক মনুষ্য-মূর্তি। শরীরের অন্যান্য অংশ যার তখনও মাটিতে ঢাকা। কিছু-কিছু মাটি সরিয়ে লেয়ার্ড দেখলেন মূর্তির মাথাটি মানুষের হলেও, দেহ একটি ডানাযুক্ত বৃষের। পরে জানা গেছে, এই মূর্তি হচ্ছে এ্যাসিরীয়ার প্রাচীন দেবতা মারডুকের। আড়াই হাজার বছর মৃত্তিকার গভীরে সুখনিদ্রার পর এতদিনে দেবতার ঘুম ভাঙল। কিন্তু মুশকিল হল কুলিদের নিয়ে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন তাদের। তারা ভাবল, এটি নিশ্চয়ই কোন দৈত্য-দানার মূর্তি। তখনই ছুটে পালাল কেউ কেউ। অনেক বুঝিয়েও তাদের কাজে ফিরিয়ে আনা গেল না। মসুল শহরে গুজব রটে গেল মাটি থেকে দেবতা নিমরুদ উঠে এসেছেন। অজ্ঞ কুলিদের কথা ছেড়েই দেওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষিত মোল্লারাও যা করলেন তা আরও অদ্ভুত। মসুলের ইমাম সাহেব ফতোয়া দিলেন যে, দেবতার ঘুম ভাঙানো অতি গর্হিত কাজ, অশাস্ত্রীয়ও বটে। পবিত্র ইসলাম কখনই এ জাতীয় খননকার্য সমর্থন করে না। নতুন পাশা যতই ভালমানুষ হোন, ইমামের ফতোয়া অমান্য করার দুঃসাহস তাঁর ছিল

না। কাজেই পুনরায় কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন লেয়ার্ড। এবার তিনি কনস্টানটিনোপল শহরে গিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ক্যানিং সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ইতিমধ্যে ক্যানিং-এর সাহায্যেই তাঁর অর্থকষ্ট দূর হয়েছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছ থেকে অর্থসাহায্য পেয়েছিলেন খননকার্য চালিয়ে যাবার জন্য। এবারও ক্যানিং প্রত্নতাত্ত্বিকের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি নিজে সুলতানের সঙ্গে দেখা করে লেয়ার্ডের জন্য এক অনুমতিপত্র আদায় করে আনলেন। ভবিষ্যতে আর কোন বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা রইল না। বার-বার কাজে বাধা পড়া সত্ত্বেও নিজ-সংকল্পে অবিচলিত ছিলেন লেয়ার্ড। নিমরুদে ফিরে এসে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে যান তিনি। এবারকার উদ্যম তাঁর চরম সাফল্য লাভ করল। তিনি একটির পর একটি অসংখ্য কালজয়ী স্থাপত্যকীর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন। নিমরুদে সবসুদ্ধ তেরো জোড়া নরসিংহের মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেল। এখানকার যে প্রাসাদটি তিনি খুঁড়ে বার করলেন, ঐতিহাসিকদের মতে, তা রাজা আসুরবনিপালের। রাজধানী আসুর ত্যাগ করে ক্যালা বা নিমরুদে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন মনস্থ করেছিলেন রাজা আসুরবনিপাল। বাইবেলে আছে, ক্যালার প্রতিষ্ঠাতা নিমরুদ ছিলেন এক প্রখ্যাত শিকারি। সেজন্য এখানকার প্রাসাদগাত্রে যত চিত্র খোদিত আছে, তার মধ্যে মৃগয়ার দৃশ্যের এত বাহুল্য। মৃগয়া ছিল অ্যাসিরীয় রাজাদের প্রধান ব্যসন। শিকারের অভিপ্রায়ে অনেকগুলি সংরক্ষিত বন ছিল—যেখানে প্রতিপালিত হত হিংস্র জন্তু-জানোয়ার। মৃগয়ার সময় জঙ্গল খেদিয়ে হিংস্র সিংহের দলকে প্রকাশ্য-স্থানে বার করে তীর ও বর্শা-বিদ্ধ করে হত্যা করা হত।

নিমরুদের মূর্তিগুলি ইংলন্ডে পাঠানো এক সমস্যা হল লেয়ার্ডের। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছে তিনি চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, উল্লেখযোগ্য কোন নিদর্শন হাতে এলেই তিনি তা লন্ডনে পাঠিয়ে দেবেন। কয়েক শ' টন ভারী এক-একটা পাথরের মূর্তি ক্রেনের সাহায্য ছাড়া জাহাজে ওঠানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু ক্রেন পাবেন কোথায়? প্রথমে লেয়ার্ড বুদ্ধি করে একটা লম্বা খাদ কেটে মূর্তিগুলিকে টেনে ওপর-জমিতে তুললেন। তারপর কুলিদের সাহায্যে বিশেষভাবে তৈরি এক-ধরনের ঠেলাগাড়িতে তোলা হল সেগুলিকে। এই গাড়ি ঠেলতে সহস্র কুলির দরকার হল। তারা কোনরকমে ঠেলতে-ঠেলতে তাইগ্রিসের তীরে এই প্রত্নসম্পদ পৌঁছে দিল। পথে বেদুইন ডাকাতরা আক্রমণও করেছিল, তবে লেয়ার্ডের হাতে ছিল আগ্নেয় অস্ত্র। তাই বিশেষ কোন ক্ষতি তারা করতে পারেনি। কিন্তু তার চেয়ে বড় বিপদ—দু'বার গাড়ির চাকা মাটিতে বসে গিয়েছিল। অতিকষ্টে লোকজনের সাহায্যে চাকা তুলে আবার যাত্রা শুরু হল। নদীতীরে পৌঁছে লেয়ার্ড দেখেন—তাঁদের জন্য এক জাহাজ, পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী অপেক্ষা করে আছে। সেই অপেক্ষমাণ জাহাজে নিদর্শনগুলি তুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন প্রত্নতাত্ত্বিক।

---

# নিনিভের মহাকাব্য ও লেয়ার্ড

স্লীম্যান যেমন হিসারলিকে ট্রয় অনুসন্ধান শেষ করে মাইকেনিতে এসেছিলেন, লেয়ার্ড তেমনি নিমরুদের কাজ শেষ করে চলে আসেন কুয়ুনজিকে। দূরত্ব বেশি নয়। মসুল-এর বিপরীত দিকে, ফেরি বোটে তাইগ্রিস পার হলেই এই স্তূপটি চোখে পড়ে। ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা যে কাজেই হাত দেন, তাতেই তাঁদের সফলতা আসে। লেয়ার্ড এমন এক ভাগ্যবান ব্যক্তি। কুয়ুনজিকে তাঁর নতুন অনুসন্ধান ব্যর্থ হল না। মাত্র ৪ সপ্তাহ খোঁড়ার পরই তিনি রাজা সেনাচেরিবের বিরাট প্রাসাদটির সন্ধান পান। খ্রিস্টজন্মের পূর্বে এমন বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ বোধহয় মধ্যপ্রাচ্যে আর কোথাও ছিল না। অপরূপ শিল্পকলায় সমৃদ্ধ এই প্রাসাদটি অ্যাসিরীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অনুপম নিদর্শন। একপ্রকার বিশেষ ধরনের পালিশ করা চকচকে ইট, এটির নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিউনিফর্ম লিপি-চিহ্নিত অনেক পোড়া ইটের ট্যাবলেটের সঙ্গে কয়েকটি গাঢ় নীল রঙের মোজেইক করা টালি ছিল, যার কিউনিফর্ম লিপিগুলিতে সাদা রঙের ব্যবহার লক্ষ করা গেল। এই প্রাসাদের রূপসজ্জায় প্রধানত কালো হলদে বা গাঢ় নীল রঙ ব্যবহার করেছেন শিল্পীরা। প্রাসাদের দেয়ালে একটি মৃগয়ার চিত্র লেয়ার্ডকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। এই ছবির নাম দেওয়া যেতে পারে—'মুমূর্ষু সিংহীর শেষ আর্তনাদ'। সিংহী বাণ ও বর্শাবিদ্ধ—তার পিছনের পা ও কোমর ভূমিলুণ্ঠিত। কোনমতে সামনের পায়ে ভর দিয়ে সিংহী শেষবারের মত গর্জন করে তার নালিশ জানাচ্ছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর হিংস্র প্রাণীর করুণ আর্তনাদ বহু যুগের দূরত্ব ভেদ করেও আমাদের কানে পরিষ্কার পৌঁছে যায়।

মেসোপটেমিয়ার দেবী নিন-এর নাম থেকে নিনিভে শহরের নামকরণ। এই প্রাচীন শহরটির উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল তার কোন বিস্তারিত বিবরণ নেই। শোনা যায়, শহরের কেন্দ্রে ছিল দেবী ইশটারের মন্দির। তাঁকে ঘিরেই গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ এক জনপদ। রাজধানী হিসাবে নিনিভের স্বীকৃতিলাভ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। অ্যাসিরীয়ার দুটি প্রাচীন রাজধানী—আসুর ও ক্যালা। বিজয়ী রাজা সেনাচেরিব নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে নতুন এক রাজধানী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেন। তাঁরই আদেশে রাজধানী স্থানান্তরিত হল নিনিভে-তে। পুরাকালের এক শ্রেষ্ঠ সুরম্য নগরী এই নিনিভে। বিদেশী পর্যটক এর ঐশ্বর্য-বৈভব দেখে চমৎকৃত হতেন। সেনাচেরিবের সময়েই নিনিভের চরম উন্নতি সাধিত হয়েছিল। রাজার আদেশে নির্মিত হয় প্রশস্ত রাজপথ, বিরাট-বিরাট অট্টালিকা ও মন্দির। প্রাসাদের তোরণশীর্ষে স্থাপিত ছিল অতিকায় এক নরসিংহ-মূর্তি—

যার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠত তাইগ্রিসের স্বচ্ছ জলে। দুটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর শহরটিকে বেষ্টন করে থাকত এবং শত্রুসৈন্যের সাধ্য ছিল না এই বেষ্টনী ভেদ করে নগরের মধ্যে প্রবেশ করে। সবশুদ্ধ পনেরোটি সুরক্ষিত প্রবেশ-দ্বার ছিল। এই প্রাসাদে যে অসংখ্য প্রকোষ্ঠ ছিল, তার মাত্র নয়টির আবরণ উন্মোচন করেন লেয়ার্ড। তাঁর অনুমান, এই নটির মধ্যবর্তী বড় হলঘরটিতে নৃত্যগীতের আসর বসত—আয়োজন হত ভোজ-সভারও। লেয়ার্ডের উল্লেখযোগ্য কীর্তি—এই প্রাসাদের দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট কুঠরি থেকে তিরিশ হাজার কিউনিফর্ম ট্যাবলেটের আবিষ্কার। তাঁর অনুমান, ঘর-দুটি প্রাসাদের লাইব্রেরিরূপে ব্যবহৃত হত। সেনাচেরিবের পৌত্র আসুরবনিপাল এই লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা। রাজার আদেশে এখানে বই লেখার কাজ চলত। বহু লেখক নিযুক্ত হতেন বই লেখা বা কপি করার কাজে। ব্যবিলনের সংস্কৃতি আরও প্রাচীন, বিদ্যাচর্চার প্রচলনও সেখানে অধিক—তাই সেখানে কর্মচারীদের পাঠিয়ে বই সংগ্রহ করতেন অ্যাসিরীয়ার রাজারা। আসুরবনিপালের গ্রন্থাগারে নানা ধরনের বই ছিল—তার মধ্যে ঈশ্বর ও আত্মাসম্বন্ধীয় বই-ই প্রচুর। যে বইটি আধুনিক পণ্ডিতদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগল, সেটি একটি অভিধান যা স্কুলের ছেলেদের কিউনিফর্ম শেখাবার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই বইটিতে যে চাবিকাঠি পাওয়া গিয়েছিল, তার সাহায্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ব্যবিলনীয়ান কিউনিফর্মের পাঠোদ্ধার করতে পারলেন।

আসুরবনিপালের গ্রন্থাগারটির আবিষ্কার লেয়ার্ডের জীবনে এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সফলতার উচ্চতম সোপানে উঠে তিনি অনুসন্ধানের মশালটি অন্য হাতে তুলে দিয়ে প্রত্নতত্ত্বের জগৎ থেকে অবসর নিলেন। বহুবার ইংরেজ সরকার তাঁকে কূটনৈতিক বিভাগে প্রবেশ করবার অনুমতি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন—এখন আর তাঁকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। ১৮৫২ সালে বৈদেশিক দপ্তরে তিনি আন্ডার-সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হলেন। পরে তিনি পার্লামেন্টের সদস্যও হন। তাঁর কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। প্রত্নক্ষেত্রে আরও কটা দিন কাটাতে পারলে লেয়ার্ড পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য—'গিলগামিশ গাথার' আবিষ্কারক হতে পারতেন। নিনিভের খননকার্যে লেয়ার্ডের সহকারী ছিলেন হরমুজড রাসাম নামে উচ্চশিক্ষিত এক খ্রিস্টান যুবক—ইনিই সেই মহাকাব্যের সন্ধান দেন। রাসাম অক্সফোর্ডের স্নাতক—ধীর, স্থির, স্বল্পভাষী। তিনি বৈদেশিক দপ্তরের এক বড় চাকরি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে আসেন। তারপর নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর মেসোপটেমিয়ায় আগমন ও লেয়ার্ডের দলে যোগদান। নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও প্রত্নতত্ত্বের জগতে রাসাম বিশেষ পরিচিত নন। পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও, নিজের অভিজ্ঞতাকে তিনি লেয়ার্ডের মত সুললিত ভাষায় লিখে যেতে পারেননি। ধরা যাক, লেয়ার্ড যদি রাসামের মত নিমরুদের অদূরে সুবৃহৎ একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেতেন, তাহলে কি সুন্দর ভাষাতেই না এই কাহিনী বর্ণনা করে

শোনাতেন তিনি। অথবা রাসামের সময় বালাওয়াতে যে কুলি-বিদ্রোহ হয়েছিল সে কাহিনী লেয়ার্ডের কলমে কত জীবন্ত হয়েই না ফুটে উঠত। কিন্তু রাসাম আত্মপ্রচারে পরাঙ্মুখ, নীরব কর্মী, তার ওপর সুলেখক নন বলে পৃথিবীর লোক তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী পড়বার সুযোগ পেল না। গিলগামিশ গাথার তিনিই প্রথম সন্ধানদাতা। সবসুদ্ধ ১২টি ট্যাবলেটে এই গাথাটি উৎকীর্ণ আছে। প্রথমে সাতটির সন্ধান পাওয়া যায়—বাকি অন্যগুলির সন্ধান দেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্মী ও বিশেষজ্ঞ জর্জ স্মিথ। গিলগামিশ গাথা মানবসভ্যতার জন্মলগ্নে রচিত। স্মিথ এই ট্যাবলেটগুলি সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা ও অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, কাহিনীটি অসম্পূর্ণ এবং উপসংহারও অজ্ঞাত। তিনি অনুমান করেন যে, নিশ্চয়ই আরও কয়েকটি অনুরূপ ট্যাবলেট এখনও অনাবিষ্কৃত আছে—যেগুলির অভাবে গিলগামিশের কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। ইংলন্ডের জনসাধারণ এই ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী হয়ে ওঠে। তাদের এই উৎসাহ লক্ষ করে 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকা স্মিথকে হাজার গিনি অগ্রিম দিয়ে মেসোপটেমিয়ায় পাঠাতে চাইল—যাতে স্বয়ং তিনি সেখানে গিয়ে ইচ্ছামত অনুসন্ধান চালাতে পারেন। স্মিথ এই অর্থ গ্রহণ করে সোজা মেসোপটেমিয়ায় চলে আসেন। অনুসন্ধান শুরু হয়। কয়েক সপ্তাহ নিরন্তর খুঁজে বেড়ান তিনি। খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মত অতি দুঃসাধ্য এই কাজ। প্রতিটি ধ্বংসস্তূপে এসে, তন্ন তন্ন করে ইট-পাটকেল, আবর্জনা সরিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন, কোথাও যদি মহাকাব্যের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়। শেষে সত্যি একদিন তাঁর পরিশ্রম সার্থক হল—ধ্বংসস্তূপের আবর্জনারাশির মধ্যে পাওয়া গেল প্রয়োজনীয় ট্যাবলেটগুলি। প্রাচীনতম মহাকাব্যের বিষয়বস্তুটি কি? জর্জ স্মিথ ইংলন্ডের লোকদের জানান সেই কাহিনী। গিলগামিশ ইরেক দেশের রাজা। প্রজারা কোন কারণে তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বধ করবার সঙ্কল্প করে। তারা সাহায্য চায় অরণ্যদেবতা এনকিডুর কাছে। উভয়ের মধ্যে শীঘ্রই এক যুদ্ধ বাধে। কিন্তু কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারে না। তাই অবশেষে তীব্র বিদ্বেষ পরিণত হয় গভীর প্রেমে। বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। এবার দুই বন্ধু মিলে সেডার বনের রাজা খুমবাবাকে পরাজিত করে আসেন। যুদ্ধে গিলগামিশের বীরত্বে স্বর্গের দেবী ইশটার মোহিত হন। অবশেষে প্রেমে পড়েন তাঁর। কিন্তু গিলগামিশ জানেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণী—এই প্রেম গ্রহণ করলে তাঁর বিনাশ অনিবার্য। তাই প্রত্যাখ্যাত হল দেবীর প্রেম। প্রতিহিংসার অনলে জ্বলে উঠলেন দেবী ইশটার। গিলগামিশ-নিধনে পাঠিয়ে দেন এক বৃষ-রাক্ষসকে। কিন্তু দেবীর আশা পূর্ণ হল না। এনকিডুর সাহায্যে সেই রাক্ষস বধ করলেন বীর গিলগামিশ। এর পর মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে এনকিডুর মৃত্যু হয়। বন্ধুবিয়োগে শোকে-দুঃখে পাগলপ্রায় হলেন গিলগামিশ। সংসার ত্যাগ করে তিনি বেরিয়ে পড়েন অমরত্বের সন্ধানে। প্রব্রজ্যাকালে তিনি দর্শন পান মানবজাতির স্রষ্টা, উতানাপিসতিমের। ঈশ্বর যেদিন পাপ ও অনাচারক্লিষ্ট

পৃথিবীকে মহাপ্লাবনে ভাসিয়ে দেন, সেদিন কেবল রক্ষা পেয়েছিল সাধু উতানাপিসতিম ও তাঁর পরিবারবর্গ। একটি বিরাট নৌকায় তাঁরা আশ্রয় নেন। ছ'দিন ও ছ'রাত্রি প্রবল বর্ষণ হয়, ঝড় ওঠে প্রচণ্ড বেগে—সৃষ্টি যায় রসাতলে। কিন্তু সব নিশ্চিহ্ন হলেও ঈশ্বরের আশীর্বাদে বেঁচে থাকে শুদ্ধমনা নৌকা-আরোহীরা। বাইবেলে বর্ণিত মহাপ্লাবন ও মহামতি নোয়ার উপাখ্যানের সঙ্গে এই কাহিনীর হুবহু মিল আছে। কোন-কোন পণ্ডিত এমন মত প্রকাশ করলেন যে, মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে যে সব প্রাচীন গাথা ও উপগাথা প্রচলিত ছিল সেগুলি বাইবেলে একত্রে সংকলিত হয়েছে। বাইবেলের কবি এই সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লোকসাহিত্যের উপাদানকে চিরন্তন সাহিত্য-মর্যাদায় মণ্ডিত করে ধর্মশাস্ত্রেব অঙ্গীভূত করে গেছেন। এই নবাবিষ্কৃত তথ্য বাইবেল-পূজারী রক্ষণশীল ভিক্টোরিয় সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বছর পর ইরাকে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা নিমরুদে নতুন করে খননকার্য চালায়। এই অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল, লেয়ার্ডের মাপজোকগুলি নতুন করে পরীক্ষা করে দেখা এবং সময় সম্বন্ধে আরও সঠিক সিদ্ধান্তে আসা। এঁদের চেষ্টা সফল হয়েছিল। এঁরা অনেক নতুন মাটির ট্যাবলেট সংগ্রহ করেন, যার ফলে অ্যাসিরীয় রাজাদের কৃষিব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্য করনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আলোকসম্পাত হয়। লেয়ার্ড যখন খননকার্য শুরু করেন, কিউনিফর্ম লিপি সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে তখনও কোন সুস্পষ্ট ধারণা হয়নি। লেয়ার্ড নিজেই একসময়ে কিউনিফর্ম-চিহ্নিত মাটির ট্যাবলেটগুলিকে নকশাকাটা ইট বলে মনে করতেন। নিমরুদের খননকার্য চলার সময় তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্রধানত বড়-বড় মূর্তিগুলির উপর। মাটির ট্যাবলেটের উপর তিনি কোন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি। তাই মাত্র তিনটি মাটির ট্যাবলেট তিনি নিমরুদ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। নেবু-মন্দিরে পুরোহিতদের লাইব্রেরিতে অসংখ্য ট্যাবলেট থাকা সম্ভব। কিন্তু এগুলিকে তিনি সাধারণ আবর্জনা মনে করে রক্ষা করার কোন চেষ্টা করেননি। পরে হয়ত লেয়ার্ড নিজের ভুল বুঝেছিলেন। তাই তিনি যখন কুয়ুনজিকে অসুরবনিপালের লাইব্রেরির সন্ধান পান তখন তিরিশ হাজার ট্যাবলেটের একটিকেও নষ্ট হতে দেননি।

গজদন্তনির্মিত সূক্ষ্ম শিল্পনিদর্শন মাত্র কয়েকটিই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। শিল্পকলার ছাত্রদের কাছে উপাদান হিসাবে এগুলি অমূল্য। অতীব ভঙ্গুর এই নিদর্শনগুলিকে কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে আস্ত রাখা হয়েছিল। ১৯৪৯-এ খননকারীরা এ ধরনের শৌখিন নিদর্শন আরও সংগ্রহ করেন। বৈদেশিক আক্রমণে এর বেশিরভাগই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ভাঙাচোরা নিদর্শনগুলিকে বৈজ্ঞানিক গবেষকরা আধুনিক প্রক্রিয়ায় অতি যত্নে জোড়া দিয়ে তাদের পূর্বাকৃতিতে ফিরিয়ে এনেছেন। হাতির দাঁতের তৈরি একটি ছোট নিদর্শন—অপূর্ব মহিলা মূর্তি, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হয়েছে। এটির নাম দেওয়া

হয়েছে, নিমরুদের মোনালিসা। প্রাসাদ-সংলগ্ন একটি কূপের ভিতর এটি পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, শত্রুসৈন্যরা যখন প্রাসাদ আক্রমণ করে তখন অন্তঃপুরচারিণীরা তাদের অলঙ্কার ও শৌখিন দ্রব্যগুলি এই কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। অধিকাংশই আজ নষ্ট হয়ে ধুলোয় মিশে গেছে—কিন্তু ব্যতিক্রম এইটিই। বহু শতাব্দী পরেও মোনালিসার মূর্তিটিকে ঠিকই চেনা যাচ্ছে; তার মুখাবয়ব ক্ষতবিক্ষত—কিন্তু হাসিটি আজও অমলিন।

লেয়ার্ড যে সময় শাবল-গাঁইতি হাতে নিয়ে মেসোপটেমিয়ায় আসেন, সে সময় প্রত্নতত্ত্বের শৈশবাবস্থা চলছে। প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে তখন গুপ্তধন অন্বেষণের কোনই তফাত ছিল না। বোটা ও বেলজোনির সমগোত্রীয় ছিলেন লেয়ার্ড। তাঁরা কেউই পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ নন। মুখ্যত তাঁরা সংগ্রহকারক-মাত্র। মাটি খুঁড়ে যা পাওয়া যায় তাই সংরক্ষণ-করা এঁদের কাজ ছিল এবং বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সেই কাজ তাঁরা করে গেছেন। কিন্তু ভূমিস্তরের পারম্পর্য পরীক্ষা করা, বা তা থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ করা অথবা স্তরবিন্যাসের সাহায্যে সঠিক সময় নিরূপণ করা—এ সবই তাঁদের অজ্ঞাত ছিল। তবু অ্যাসিরীয়ার প্রত্নক্ষেত্রে লেয়ার্ড যে সম্পদ আহরণ করেন, তার মূল্য অপরিসীম। নিমরুদের খননকার্য তাঁকে অমর করে রাখবে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ঊনবিংশ শতকে অ্যাসিরীয়শাস্ত্রের যে ভিত স্থাপিত হয়েছিল তার মূলে আছে লেয়ার্ডের আজীবন সাধনা।

---

# উর-নগরীর সমাধিক্ষেত্র

বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ে লেখা আছে যে, মহামতি এব্রাহাম জন্ম নিয়েছিলেন প্রাচীন উর-নগরীতে। সুমের-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র, বাইবেলবর্ণিত এই উর-অব-দ্য কাল্‌ডিজ্‌-এর সঠিক অবস্থান কোথায় ছিল বহুকাল আমরা জানতাম না। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে দক্ষিণ-ইরাকের ইউফ্রেটিস অববাহিকা অঞ্চলে ব্যাপক খননকার্যের ফলে প্রাচীন উরের সন্ধান পাওয়া গেছে। রাজধানী বাগদাদ থেকে দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত প্রসারিত—তারই ঠিক মধ্যভাগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই সুরম্য নগরী অবস্থিত ছিল। এককালে শহরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে ইউফ্রেটিস প্রবাহিত হত। অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য উর প্রাচীনকালে একটি বিরাট বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হবার ফলে শহরটি ধীরে-ধীরে নদী থেকে দূরে সরে যায় এবং কালক্রমে মরুভূমির তপ্ত বালুকারাশি তাকে গ্রাস করে নেয়। উরের বর্তমান নাম মুকায়ির—বাগদাদ রেলপথের উর জংশন থেকে এর ধ্বংসস্তূপ মাত্র দু'মাইল দূরে অবস্থিত। আনুমানিক চতুর্থ-সহস্রকে যখন ইউফ্রেটিস উপত্যকার জলাভূমি শুকোতে আরম্ভ করে তখন এক আদিম কৃষিজীবী সম্প্রদায় এখানে বসবাস করতে আসে। এরা পশুপালন জানত এবং মাটির বাড়িতে বসবাস করত। পরবর্তীকালে এক প্রলয়ঙ্করী বন্যায় এখানকার জনপদগুলি নিশ্চিহ্ন হয়। বন্যার জল সরে গেলে উত্তর দিক থেকে আবার একদল লোক এখানে বসবাস করতে আসে। এরা সুমেরীয়দের পূর্বপুরুষ। আগন্তুকদল উন্নত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল এবং তামার ব্যবহারও জানত। সুমেরীয় রাজবংশের অধীনে অঞ্চলটি সমৃদ্ধিশালী হল—উর হয়ে উঠল বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের রাজধানী, সমগ্র মেসোপটেমিয়ার প্রাণকেন্দ্র। সম্ভবত চারশ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকেই উর ক্রমে-ক্রমে ভূগর্ভে বিলুপ্ত হতে থাকে।

বহুদিন ধরে প্রত্নবিদরা এখানকার উঁচু-নিচু, ছোট-বড় স্তূপগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। যেটি সবচেয়ে বড় তার নাম টেল-এল-মুকায়ির। ১৮৫৪ সালে এটির আবরণ উন্মোচন করতে যত্নশীল হলেন বসরার ইংরেজ কনসাল—টেলর সাহেব। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এখানে হয়ত কোন প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে। এলোপাতাড়ি অনুসন্ধানের ফলে উর-নগরীর নামাঙ্কিত কয়েকটি মৃৎ-ফলক পাওয়া গেল। কিন্তু দুই শীত ঋতুর অধিককাল টেলরের পক্ষে খনন চালানো সম্ভব হয়নি। একে টাকা-পয়সার টানাটানি, তার উপর দস্যু-তস্করদের উপদ্রব; সব মিলিয়ে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাঁর। প্রায় অর্ধশতাব্দী বাদে পেনসিলভানিয়া থেকে একদল বিশেষজ্ঞ এসে

স্থানটি পরিদর্শন করেন। তাঁরা অবশ্য উল্লেখযোগ্য কোন কাজ এখানে করে যেতে পারেননি। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে মেসোপটেমিয়ার রণাঙ্গনে প্রেরিত একদল ইংরেজ সৈনিক অবসর সময়ে প্রত্নকার্য চালাতে উদ্যোগী হল। এই দলে ছিলেন ক্যামবেল জনসনের মত নামী এক ব্রিটিশ প্রত্নবিদ। ব্রিটিশ মিউজিয়াম এঁদের কাজ দেখে উৎসাহিত হয়ে প্রথমে লেনার্ড কিং ও পরে হলকে উরের খননকার্য পরিচালনা করতে পাঠান। কিন্তু অর্থাভাব এক প্রবল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে ১৯২২-এ আমেরিকার পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সাহায্যকল্পে এগিয়ে আসে। পারস্পরিক আলোচনায় স্থির হয়, যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালিত হবে। এর নেতৃত্ব করেন বিখ্যাত প্রত্নবিদ লেনার্ড উলী (১৮৯০-১৯৬০)—তাঁর নেতৃত্বে ১৯২২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত মেসোপটেমিয়ায় এক সুদীর্ঘ খননকার্য চালানো হয়। উরের এই খননকার্য লেনার্ড উলীর নামকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। অক্সফোর্ডের কৃতী ছাত্র উলী ১৯০৫-৭-এ অক্সফোর্ডের অ্যাসমোলীয়ান মিউজিয়ামের 'কীপার' নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর অন্যতম সুহৃদ হয়ে উঠেছিলেন টি-ই লরেন্স—যিনি 'লরেন্স অব অ্যারেবিয়া' নামেই বেশি পরিচিত। এঁর প্রভাবে পড়ে উলী মধ্যপ্রাচ্যের খননকার্যে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। লরেন্স ও উলী উভয়ে তুরস্কের অন্তর্গত হিত্তীদের কারকেমিশ শহরে প্রত্নানুসন্ধান চালান। তাঁদের কাজ বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। যে যুগে উৎখননের যন্ত্রপাতি খুব উঁচুদরের ছিল না সে যুগে তাঁরা যেটুকু করতে পেরেছিলেন তা যথেষ্ট মূল্যবান ছিল বলতে হবে। কেবল প্রত্নবিদ হিসাবেই নয়, একজন সুলেখক হিসাবেও লেনার্ড উলী প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। সুললিত গদ্যে তিনি তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সমূহের ধারাবাহিক বিবরণ রেখে গেছেন, যা পড়ে প্রত্নবিষয়ে অজ্ঞ অতি সাধারণ পাঠকও রসগ্রহণ করতে পারে। একাধারে বিজ্ঞান-সাধক ও সার্থক কথাশিল্পী হিসাবে উলীর খ্যাতি চিরকাল সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে—প্রত্নবিজ্ঞানীদের মধ্যে এমন গুণের সমাবেশ সচরাচর চোখে পড়ে না।

উলী মনে মনে উর-নগরীর একটি প্ল্যান খাড়া করে ফেলেছিলেন। শহরের বহিঃসীমায় তাঁর প্রথম খনন শুরু হয়। প্রাচীন শহরগুলি সাধারণত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকত এবং প্রাচীরের বাইরে কোন এক স্থানে শহরের আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা ছিল। উরের ক্ষেত্রে শহরের বাইরে এই আবর্জনা জমতে-জমতে বিরাট স্তূপে পরিণত হয়—যার গভীরতা প্রায় ৪০ ফুট। এই আবর্জনা স্তূপ খুঁড়তে খুঁড়তে উলী একাধিক সমাধির সন্ধান পেলেন। শহরের বাইরে নিতান্ত অনাদরে যে ব্যক্তিদের সমাধি দেওয়া হয়েছিল তাঁরা কেউ অর্থবান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি নন। এঁরা ছিলেন উর-নগরীর ইতরজন—যাঁদের মরদেহ চাটাই বা মাদুরে মোড়া থাকত। একটু অবস্থাপন্ন হলে ভাগ্যে জুটত কাঠের কফিন। মরদেহের আশেপাশের যে টুকিটাকি জিনিসপত্র পাওয়া গেল তা নিতান্তই খেলো ধরনের।



*সুমেরীয় রানী সুবাদ*

কিছুদিনের মধ্যে উলী রাজারাজড়াদের যে সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিলেন তা থেকে এমন সব মূল্যবান নিদর্শনাদি পাওয়া গিয়েছিল, তুলনামূলক বিচারে যা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯২৬-২৭এ মাটি কাটতে-কাটতে তিনি একটি বৃহৎ খাদের সন্ধান পেলেন যেটি খুব হালকাভাবে মাটি ও আবর্জনা দিয়ে ভরাট করা ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, খাদের তলদেশ বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে কংক্রীট করা। ব্যাপারটি কৌতূহলোদ্দীপক। ইউফ্রেটিস উপত্যকার নিম্নাংশে কোথাও পাথরের সন্ধান মেলে না। উত্তরে, তিরিশ মাইল দূরে, পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে তবে এই পাথর সংগ্রহ করতে হয়। বলা বাহুল্য, কাজটি অর্থবহুল ও শ্রমসাপেক্ষ। একটি খাদের তলকে পাকাপোক্তভাবে গড়তে কেন এত খরচপত্র করা হল, তার কোন সদুত্তর পেলেন না উলী। গ্রীষ্মকাল এসে পড়ায় কাজ বন্ধ রাখতে হল তাঁকে। যে প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছিল সারা অবকাশটা, তিনি তা নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন রইলেন। শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, পাথরের গাঁথনিটি আসলে কোন কিছুর তল নয়, এটি ভূগর্ভস্থ কোন কুঠরির ছাদ। বলা বাহুল্য, টুটেনখামেনের রত্নভাণ্ডারের অনুরূপ কোন বৃহৎ আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখছিলেন উলী। পরের শীত ঋতুতে যখন পুনরায় কাজ শুরু হল তখন উলী দেখলেন, তাঁর অনুমান নির্ভুল। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর প্রতি সদয় ছিলেন না, কেননা দেখা গেল রুদ্ধদ্বারকক্ষের দ্বার ভেঙে অনেক পূর্বেই সিঁধেল-চোররা এখানে হানা দিয়ে গেছে। রাজমুকুটের ভাঙা এক অংশ ও দু-একটি স্বল্পমূল্যের তামার বাসন ছাড়া এঘরে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। প্রাচীন সুমেরীয়দের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কিছু রীতি উলীর জ্ঞানগোচর হল বটে—কিন্তু কয়েক মাসের হাড়ভাঙা খাটুনি ও প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রতিদানে এই লাভটুকু খুবই অকিঞ্চিৎকর। নূতন আশায় বুক বেঁধে আবার এক স্থানে কাজ শুরু করলেন উলী। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এখান থেকেই তিনি এমন এক আনকোরা সমাধিকক্ষ খুঁজে বার করবেন, যার উপর চোর-ডাকাতের হাত পড়েনি কখনো। এবার এক খাদের ঢালু জমির সামনেই পাঁচজন সশস্ত্র ব্যক্তির কঙ্কাল খুঁড়ে বার করা হল। এরা সকলেই সৈনিক। তারই দশ-বারো হাত দূরে সারবন্দী এক ডজন কঙ্কাল পাওয়া গেল—বিশেষজ্ঞদের মতে যেগুলি সবই মহিলাদের। মহিলাদের শিরোভূষণ ছাড়া এখান থেকে মূল্যবান আর কিছু পাওয়া যায়নি। সমাধির মধ্যে সাধারণত যে সব বাসনপত্র বা টুকিটাকি জিনিসপত্র পাওয়া যায়—এখানে সে সব কিছুই ছিল না। অবশ্য একটি হার্প জাতীয় বাদ্যযন্ত্র পাওয়া গিয়েছিল—যা একটি অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। কোন সুর-সাধিকা কি মৃত্যুকালে এমন বাসনা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর দেহের সঙ্গে তাঁর বাদ্যযন্ত্রটিও সমহিত হবে? অথবা এমনভাবে বাদ্যযন্ত্র স্থাপন করাটা কি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অঙ্গীভূত কোন প্রথা? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। মহিলাদের দেহাবশেষ যেখানে পাওয়া গেল—তার এক পাশে অন্য একটি সমাধিকক্ষের প্রবেশপথ ছিল। এইখানে কারুকার্যখচিত স্লেজগাড়ি ধরনের একটি রথ পাওয়া গেল। রথের পুরোভাগে

ছিল দুটি গর্দভের কঙ্কাল—এরাই সম্ভবত রথটি টানত। রথের খুব কাছে একটি ভাঙা সিন্দুক প্রত্নতাত্ত্বিকদের কৌতূহল জাগ্রত করেছিল। এটি একেবারেই শূন্য—তবে কাছেই সোনা-রুপার বাসনপত্র দেখে অনুমান করা গেল যে, আগে এগুলি সিন্দুকের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে সিন্ধুকটি ভেঙে পড়ায় বাসনপত্র ছড়িয়ে পড়ে। উলী মনে মনে উল্লসিত হলেন—এতদিনে তাঁর পরিশ্রম আংশিক সার্থক হল। কিন্তু এতগুলি কঙ্কাল আবিষ্কৃত হল—এরা কি সামাজিক মর্যাদায় সকলেই সমগোত্রীয়। এদের মধ্যে কে রাজা, কে মন্ত্রী বা সাধারণ সৈনিকই বা কে—কি করে নির্ধারিত হবে? এর উত্তর পেতে বিলম্ব হল না। সিন্দুক সরাতেই চোখে পড়ল আর এক সুড়ঙ্গপথ। বোঝা গেল এই পথ ধরেই আর একটি গোপন কক্ষে প্রবেশ করা যাবে। হয়ত এখানেই সমাহিত হয়েছিলেন রত্নভাণ্ডারের আসল মালিক। কিন্তু বিরাট হতাশার সঙ্গে উলী এই কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন, বহুপূর্বেই সব লুণ্ঠিত এবং চোর-ডাকাতরা পালাবার সময় কুঠরির পথটি শিল করে দিয়ে গেছে। কক্ষটিকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখতে গিয়ে উলী আবার আর একটি পথের সন্ধান পেলেন—যা দিয়ে সন্নিহিত অপর একটি কক্ষে প্রবেশ করা যায়। ক্ষণিকের জন্য আবার আশার বাতি জ্বলে উঠল। এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—এবার আর তাঁকে ব্যর্থমনোরথ হতে হল না। এই কক্ষে পূর্বে কোন চোর-ডাকাত প্রবেশ করেনি। দেয়ালের গায়ে লেখা ছিল রানী শুবাদের নাম—যিনি এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত। রানীর মরদেহটি রত্নখচিত এক সুদৃশ্য শবাধারে সযত্নে রক্ষিত। এটি সোনা ও রুপার পাতে মোড়া এবং দামী পাথরে অলঙ্কৃত। স্বর্ণময় এক মুকুট শোভা পাচ্ছিল রানীর শিরে। খোঁপার পিছনে ছিল পাঁচ-দাঁতের এক শৌখিন চিরুনী। গলায় সুদীর্ঘ রত্নহার, কানে বহুমূল্য দুল, যার গোল রিংগুলি একেবারে ঘাড় পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়। প্রখ্যাত এক নৃতাত্ত্বিক রানীর করোটি পরীক্ষা করে সমস্ত মুখাবয়বটিকে পুনরায় রূপ দিলেন। প্রাচীন সুমেরীয় টেরাকোটায় যে চিত্র আছে তা দেখে শ্রীমতী ক্যাথরীন উলী পরচুলা ও ফিতার সাহায্যে রানী শুবাদের চুলের সাজ ঠিক করে দিলেন। মডেলটি অতি জীবন্ত হয়ে উঠলো এবং দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করল। এটি এখন ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামের বিশেষ কক্ষে শোভা পাচ্ছে।

সন্নিহিত যে কক্ষটিতে রাজাকে সমাহিত করা হয়েছিল—সেটি পূর্বেই লুণ্ঠিত। এখানে রাজা আ-ব-র-গি শায়িত ছিলেন—সম্ভবত ইনি শুবাদের স্বামী। চোর-ডাকাতরা সব লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলেও ভুলক্রমে দু'একটি জিনিস ফেলে যায়। তার মধ্যে ছিল দু'টি ছোট-ছোট নৌকার মডেল। বর্তমান যুগে ইউফ্রেটিস-এ যে নৌকাগুলি পাড়ি দেয়, গঠনাকৃতিতে নৌকাদুটি তাদেরই মত। উরের রাজসমাধিতে যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি পাওয়া গিয়েছিল তা টুটেনখামেনের সমাধিতে প্রাপ্ত ধনরত্নের তুলনায় নিঃসন্দেহে নিকৃষ্টতর। তবে ঐশ্বর্যের ঔজ্জ্বল্যে কিছুটা কম হলেও ঐতিহাসিক গুরুত্বে উরের প্রত্নতাত্ত্বিক

নিদর্শনগুলি কোন অংশে হীন নয়। প্রাচীনত্বের দিক থেকে উর বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান দাবি করতে পারে। উরের প্রথম রাজবংশের তুলনায় মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশ অনেক অর্বাচীন। তাছাড়া সুদূর অতীতে সুমেরীয় রাজাদের অন্তেষ্টিক্রিয়ার প্রচলিত নিয়মকানুন সম্পর্কে অনেক তথ্য উলী আমাদের জানিয়েছিলেন। একটি বড় প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতেরা মাথা ঘামাতে শুরু করলেন—যে সব সৈনিক, পরিচারক, পরিচারিকার দেহাস্থি উরের সমাধিক্ষেত্র থেকে পাওয়া গিয়েছিল তাদের কি হত্যা করা হয়েছিল—না স্বেচ্ছায় তারা মৃত্যুবরণ করে অনন্তপথযাত্রী প্রভুর অনুগামী হয়। উলীর স্থির বিশ্বাস, রাজা বা রানী মারা গেলে রাজপ্রাসাদের অনুচরেরা প্রভুকে সঙ্গ দিতে আত্মঘাতী হতেন। ইহলোকে যারা রাজাকে পরম দেবতা-জ্ঞানে সেবা ও পূজা করল, পরলোকেও তারা সেই সেবাকাজ থেকে বঞ্চিত হবে না—এই ছিল তাদের মনোগত ইচ্ছা। একটি খাদ থেকেই উলী আটষট্টি জন মহিলা ও ছয়জন পুরুষের কঙ্কাল উদ্ধার করেছিলেন। দেহগুলি দুই সারিতে এত সুন্দরভাবে সুবিন্যস্ত যে, মনে হয়, মৃত্যুর অনেক পূর্বে খাদে নেমে এসে এরা অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষা করেছিল। স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে নেবার এমন নজির পৃথিবীর আর কোন দেশে হয়ত পাওয়া যাবে না। ঠিক কিভাবে এতগুলি লোকের দেহান্ত ঘটেছিল—তার সঠিক বিবরণ আমাদের জানা নেই। তবে কল্পনার সাহায্যে ছবিটি অতি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে এঁকে নিয়েছেন লেনার্ড উলী। নরকঙ্কালগুলি নির্মমতা বা নিষ্ঠুরতার কোন চিহ্ন বহন করছে না—তাতে বোঝা যায় রক্তপাতের কোন লোমহর্ষক ঘটনা এই সমাধিপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়নি। মনে হয়, নির্দিষ্ট দিনে প্রাসাদের অনুগত সেবক-সেবিকারা সুসজ্জিত হয়ে সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। চারিদিকে ধূপধুনার গন্ধ ও মৃদু বাদ্যধ্বনি আবহাওয়াকে রহস্যময় করে তোলে। ঘুমের ওষুধ বা কড়া মাদক-দ্রব্য পান করিয়ে তাদের খানিকটা আচ্ছন্ন করে নেওয়া হয় আগে থেকে। শয্যার উপর তারা তাদের শিথিল শরীর এলিয়ে দেয়—চোখে নেমে আসে ঘুমের ঘোর। একজন রাজপুরুষ শেষবারের মতে দেখে নেন, তাদের কাপড়চোপড় ঠিক আছে কিনা, গয়নাগাটি গা থেকে সরে গেল কিনা। আয়োজন ত্রুটিহীন সাব্যস্ত হলে ঘুমন্ত নরনারীর উপর হার্প জাতীয় বাদ্যযন্ত্র স্থাপন করা হয়। আস্তে-আস্তে অসাড় দেহগুলির উপর মাটির আস্তরণ পড়ে সমাধিমুখ বন্ধ হয় চিরতরে। রাজপুরুষেরা কাজ সমাধা করে ঘরে ফেরেন। যেভাবে এতগুলি নরনারী মৃত্যুবরণ করে, দেখে মনে হয়, অভিসারিকারা বুঝি দয়িতের সঙ্গে মিলনের আশায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে এতক্ষণ প্রহর গুনছিল।

উলীর এই মৃত্যুমহোৎসব-বর্ণনা অনেক পণ্ডিতের মনঃপূত হয়নি। তাঁরা সব ব্যাপারটিকে কবি-কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। রাজারাজড়াদের সমাধিক্ষেত্রে এমন নাটকীয়ভাবে সংহারলীলা অনুষ্ঠিত হত—একথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না তাঁদের। প্রথমত, প্রাচীন কোন সুমেরীয় শাস্ত্রে এমন কোন বর্ণনা চোখে পড়ে না। দ্বিতীয়ত, উলী

রাজা হিসাবে যে ক'জনের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের নাম সুমেরীয় রাজাদের নাম-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়। তৃতীয়ত, তাঁরা মনে করেন, উরের এই নরবলির ব্যাপারটি সম্ভবত সেখানকার বসন্তোৎসবের সঙ্গে জড়িত ছিল। সুমেরীয়রা ভাবত, মধুমাসে স্বর্গের দেব-দেবীদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সময়ে মর্তে নেমে আসে প্রাচুর্যের আশীর্বাদ। মৃত্তিকা উর্বরা হয়, ধরণী হয় শস্য-শ্যামলা। শীতের হিমশীতল করস্পর্শে যে প্রকৃতির মৃত্যু হয় তারই পুনরুজ্জীবন ঘটে নববসন্তে। প্রকৃতির নবজন্মকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজন হয় নরবলির। স্বর্গের দেবদেবীর অনুকরণে সুমেরীয় রাজারা বসন্তকালে বিবাহ করতেন। দেশের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী বিবাহের পরই বরকে জীবনোৎসর্গ করতে হত। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, রাজা নিজে মৃত্যুবরণ না করে, অন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁর হয়ে জীবন দান করতে বাধ্য করছেন। উলীর বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা তাই বলেন, উরের সমাধিক্ষেত্রে রাজা বলে যাদের ধরা হচ্ছে আসলে তারা সকলেই ছিলেন সাধারণ স্তরের মানুষ। উলী বসন্তোৎসবের ব্যাপারটিকে অনৈতিহাসিক বলে মনে করতেন। তাছাড়া, উরের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে কোন সমাধিটি রাজারাজড়ার, কোনটি সাধারণ নাগরিকের তা তিনি ভালভাবেই চিনিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য-বিষয়ের সমর্থন পাওয়া গেল ১৯৪৪ সালে—যে বছর ড. ক্রেমার একটি প্রাচীন সুমেরীয় কিউনিফর্ম লিপির পাঠোদ্ধার করে তার মর্মার্থ ছাপলেন। এই লিপিতে খুব সংক্ষিপ্তভাবে কোন একটি সুমেরীয় রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা আছে। রাজা অনন্ত শয্যায় শায়িত—তাকে ঘিরে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা ক্রন্দন করছে। চারিদিকে শোকগাথা উচ্চারিত হচ্ছে। পরলোকের পথে রাজা কিন্তু একাকী অগ্রসর হবেন না—তাঁকে সঙ্গ দেবেন প্রাসাদের দাসদাসীরা, যাঁরা ইহলোকে সর্বদা তাঁর আশেপাশে থাকতেন। উলীর মতে, কিউনিফর্ম লিপির এই সাক্ষ্য খননকারীর সিদ্ধান্তকে অবশ্যই সমর্থন করবে।

১৯২৭-২৮এ উলী একটি সুদীর্ঘ খাদ কাটতে-কাটতে ৩০।৪০ ফুট গভীরে একপ্রস্থ পলিমাটির সন্ধান পেলেন। প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে এই স্তরের বয়স হল পাঁচ হাজার বছর, অর্থাৎ ৩০০০ খ্রিঃ পূঃ। কিন্তু এই স্তরের আট ফুট নিচে আর পলিমাটি নেই—আছে ইট-পাথর। মেসোপটেমিয়ার নদীগুলিতে আবহমানকাল ধরে বন্যা হয়ে আসছে। প্রতি বছর বন্যা হয় কোন-এক নির্দিষ্ট সময়ে—তারপর পলিমাটির আস্তরণ পড়ে জমির উপর। কিন্তু যে বন্যা আট ফুট পুরু পলিমাটি আনতে সক্ষম হয়েছিল তা কি প্রচণ্ড ভয়াবহ হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা চলে। বুক অব জেনেসিসের সপ্তম অনুচ্ছেদে যে 'ডিলিউজের' কথা আছে, তার সঙ্গে এমন বন্যার তুলনা করা চলে। বাইবেলের কবি কি সুন্দরভাবেই না সেই মহাপ্লাবনের বর্ণনা করেছেন। সেদিন নাকি স্বর্গের সব জানালা খুলে যায়, সাগর খুলে দেয় তার সব ফোয়ারামুখ। সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়—চলে একটানা চল্লিশ দিন। জলোচ্ছ্বাসে ঘরবাড়ি তো ভেসে যায়ই—

পাহাড়ও যায় ডুবে। সৃষ্টি রসাতলে যাবার উপক্রম হল। পুণ্যাত্মা নোয়াই কেবল এই সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। বাইবেলের বহু পূর্বে, সুমেরীয়দের মহাকাব্য 'গিলগামিশ'-এ মহাপ্লাবনের কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। প্লাবনের কাহিনী যে কবিকল্পনা নয়—পাঁচ হাজার বছর পূর্বে নিম্ন মেসোপটেমিয়ায় সত্যি এটি ঘটেছিল, উলীর খননকার্যে তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হল।

---

# ট্রয়নগরী : ইলিয়ডে ও ইতিহাসে

ডার্ডানেলিস প্রণালীর অদূরে তুরস্কের গ্রাম হিসারলিক। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে এখানে আবিষ্কৃত হল অবলুপ্ত এক অতি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ—বয়সকাল যার ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার বছর। ঐতিহাসিকদের মতে, এখানেই অবস্থিত ছিল হোমার-বর্ণিত বিখ্যাত ট্রয় নগরী। বহু পুরাতন শহর আজও কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে—যেমন, জেরুজালেম, বেথলেহেম (আনুমানিক ২০০০ খ্রিঃ পূঃ) চীনদেশের লোয়াং (৫০০০ খ্রিঃ পূঃ) এবং আলেকজান্দ্রিয়া (৩৩২ খ্রিঃ পূঃ)। কিন্তু প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ সুরম্য শহর ট্রয় কি করে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হল সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না।

ট্রয় নগরীব অনুসন্ধান-কাজে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, যাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় ছাড়া ট্রয় আবিষ্কার মোটেই সম্ভব ছিল না, সেই জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক হেনরিক স্লীম্যানের জীবনকাহিনী রূপকথার মতই রোমাঞ্চকর। স্লীম্যান তাঁর বিখ্যাত বই, "ইলিয়স্ : সিটি অ্যান্ড কান্ট্রি অব দ্য ট্রোজন্স্"-এর প্রথম পরিচ্ছেদে তাঁর জীবনের অনেক চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। ম্যাকলেনবার্গ প্রদেশের ছোট একটি শহরে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন দরিদ্র পাদ্রী—নিতান্ত কায়ক্লেশে যাঁর দিন কাটত। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন বলে স্লীম্যানের ভাগ্যে ইস্কুল-যাওয়া ঘটে ওঠেনি। গ্রামের একদল অপরিচ্ছন্ন, অর্ধভুক্ত ও অযত্নে লালিত শিশুর সঙ্গে তিনিও বড় হয়ে উঠলেন। সব দেশের সব শিশুর মতই গল্প শোনার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল অসাধারণ। গ্রাম-সম্পর্কের এক ঠাকুর্দা গল্প শোনাতেন ছেলেমেয়েদের এবং তাঁর কাছে বালক স্লীম্যানের ছিল নিত্য যাওয়া-আসা। একবার তিনি ছেলেদের ভয় দেখানোর জন্য বলেছিলেন যে, গ্রামের প্রান্তে যে কবরটি দেখা যায়—সেটি অভিশপ্ত। নিশুতি রাত্রে অশরীরী এক মূর্তি ঘুরে বেড়ায় সেখানে। একথা জানার পর ভয় পাওয়া দূরে থাক, গভীর রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে অশরীরী আত্মাকে দেখবার আশায় কবরের কাছে বসে থাকতেন স্লীম্যান। দীর্ঘ প্রতীক্ষা যখন ব্যর্থ হল—কিছুই যখন চোখে দেখা গেল না, তখন স্লীম্যান পিতাকে জানালেন যে, কবর খুঁড়ে তিনি দেখতে চান—সত্যি এর তলায় কিছু আছে কিনা। পাদ্রীসাহেব অনেক বুঝিয়ে ছেলেকে নিরস্ত করলেন, কিন্তু তিনি ভাল করে বুঝেছিলেন যে, তাঁর এই ডাকাবুকো ছেলেকে আর যাই হোক ভয় দেখিয়ে দমানো যাবে না। দুরন্ত ছেলেকে শান্ত করার জন্য পিতা নানা দেশবিদেশের গল্প শোনাতেন। ইতিহাসের কাহিনী শোনার দিকেই পুত্রের আগ্রহ ছিল বেশি। হোমারের গল্প, হেক্টর-অ্যাকিলিসের বীরত্ব,

প্যারিস-হেলেনের প্রেমকাহিনী, ট্রয়ের যুদ্ধ-বর্ণনা, কাঠঘোড়ার কূটকৌশল—সবই বালকের চিত্তকে রোমাঞ্চিত করত। ১৮২৯-এর বড়দিনে পিতা তাঁকে একটি বই উপহার দিলেন—লুডভিগ জেরারের 'ইউনিভারসাল হিস্ট্রি'। বইটি বালকের দিবারাত্রের সঙ্গী হয়ে উঠল। এই বই-এর একটি ছবি বিশেষভাবে তাকে আকৃষ্ট করল। ছবিটি এইরকম—ট্রয় আগুনে জ্বলছে এবং জ্বলন্ত তোরণদ্বার, স্কিয়ান গেটের মধ্য দিয়ে ঈনিশ্ তাঁর পিতাকে কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছেন। স্লীম্যান ছুটে এলেন বাবার কাছে—উত্তেজিতভাবে তাঁকে বললেন, জেরার নিশ্চয়ই ট্রয় দেখেছেন, তা না হলে এই ছবি তিনি পাবেন কি করে? পিতা ছেলেকে বুঝিয়ে বললেন, ছবিটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক—কেন না ট্রয় বহু শতাব্দী পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তাকে দেখা কোন মতেই সম্ভব নয়। বালকের ভ্রম কিন্তু ঘুচল না। সে বারবারই ভাবতে লাগল, এমন সুন্দর শহর কখনই লোপ পেতে পারে না। যদি এটি মাটির নিচেই চাপা পড়ে থাকে তাহলে সে বড় হলে মাটি খুঁড়ে এর সন্ধান বার করবেই।

শৈশবের এই মধুর দিনগুলি বেশিদিন স্থায়ী হল না। মোটে চোদ্দ বছর বয়সে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় স্লীম্যানকে জীবন-সংগ্রামে নামতে হল। ফুরস্টেনবার্গের এক মুদিখানায় চাকরি পেলেন। যে সময় অন্য ছেলেরা বইখাতা নিয়ে ইস্কুলে যায়, সে সময় স্লীম্যান দাঁড়িপাল্লা হাতে মুদিখানায় সওদা বিক্রি করতেন। দোকানের এই নিরানন্দ পরিবেশে হঠাৎ একদিন এক মাতাল নাবিক ঢুকে পড়ে হোমারের কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করল। মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই আবৃত্তি শুনতে-শুনতে স্লীম্যান ভাবলেন যে, জীবনের চরম সাধনাকে তাঁর ভুলে গেলে চলবে না—এমন অনবদ্য কবিতা যিনি রচনা করেছেন—সেই মহাকবির অদৃশ্য জগৎকে খুঁজে বার করতেই হবে।

মুদিখানার বদ্ধঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের উন্মুক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার জন্য স্লীম্যান ১৮৪১ সালে হ্যামবুর্গ বন্দরে 'ডরোথীয়া' জাহাজে চাকরি নিলেন কেবিন-বয় হিসেবে। জাহাজে চড়ে সাতসমুদ্র তেরো নদী ঘুরে আসবেন এই তাঁর অভিলাষ। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, সমুদ্রে পাড়ি জমাবার কিছুদিনের মধ্যেই জাহাজডুবি হল। সমুদ্রে অনেকেই প্রাণ হারাল। কিন্তু সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণ বাঁচালেন স্লীম্যান। তিনি তো রক্ষা পেলেনই, তাঁর বাক্স-প্যাঁটরা—এমন কি সামান্য টুকিটাকি জিনিসপত্র সবই জলের উপর ভেসে উঠল। ঈশ্বর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন, তাঁকে দিয়ে মহৎ কোন কাজ করিয়ে নেবেন সেই অভিপ্রায়ে। এবার আর সমুদ্র নয়। আমস্টারডাম শহরে এক সওদাগরী অফিসে কেরানির চাকরি নিলেন স্লীম্যান। এখানেই তিনি লেখাপড়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। দু'বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অনেকগুলি ভাষা, যেমন ইংরেজি, ফরাসি, ডাচ, স্প্যানিশ ইত্যাদি শিখে ফেলেন। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর এমন একটি স্বাভাবিক দক্ষতা জন্মে গিয়েছিল যে, দেড় মাসের মধ্যে তিনি যে কোন একটি নতুন ভাষা শিখে,

সে ভাষায় কথা বলতে বা চিঠি লিখতে পারতেন। কোম্পানির বড় কর্তারা তাঁর এই দক্ষতার খবর পেয়ে তাঁকে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেন কোম্পানির প্রতিনিধি করে। রাশিয়ায় গিয়ে তিনি আরও দুটি নতুন ভাষা আয়ত্ত করলেন—রাশিয়ান ও সুইডিশ।

কৈশোরে তিনি মিনামেনকে-নামক এক সুন্দরী জার্মান বালিকার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। স্লীম্যান মিনার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন, তাঁর শৈশবের স্বপ্ন—হোমারের জগৎকে উদ্ধার করতে সে সহায়তা করবে। তাঁর বড় সাধ ছিল, ভবিষ্যতে এই বাল্যসঙ্গিনীকে বিবাহ করবেন। কিন্তু কোন কারণে মিনার অভিভাবকরা তাঁদের মধ্যে মেলামেশা বন্ধ করে দেন। হয়ত স্লীম্যানরা অতি দরিদ্র ছিলেন সেই কারণেই। অভিভাবকদের এই হৃদয়হীন আচরণে স্লীম্যানের স্পর্শকাতর মন কি নিদারুণ আঘাত পেয়েছিল তা তাঁর লেখা পড়লে জানা যায়। তাঁর প্রথম প্রেম ব্যর্থ হল। যুবা বয়সে টাকা-পয়সা হাতে নিয়ে তিনি যখন দেশে ফিরলেন বিবাহের আশা নিয়ে, তখন শুনলেন মাত্র তিনদিন পূর্বে মিনার বিবাহ হয়ে গেছে।

এরপর তিনি ইউরোপ ছেড়ে সোজা নূতন দেশ আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কালিফোর্নিয়ায় দু'বছর কাটিয়েও ওদেশকে নিজের করে নিতে পারেননি। আবার তিনি ফিরে এলেন রাশিয়ায়, যেখান থেকে চাকরি ছেড়ে তিনি আমেরিকা রওনা হয়েছিলেন। এবার মস্কো শহরে ফিরে এসে নিজেই এক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। এবার রাশিয়ায় ফেরার পর থেকে ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি অতি সুপ্রসন্ন ছিলেন—যে কাজেই তিনি হাত দেন তাতেই সফল হন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় তাঁর কোম্পানি এত বেশি লাভ করল যে, স্লীম্যান একজন ধনকুবের বলে পরিচিত হলেন। যুদ্ধ-শেষে কাজের চাপ কমল। তখন তিনি গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা শেখার দিকে মন দেন। দু'জন সুযোগ্য শিক্ষকের সহায়তায় মাত্র ছ'সপ্তাহে তিনি দুরূহ গ্রিক ভাষা আয়ত্ত করে ফেললেন। এতদিনে তিনি তাঁর প্রিয় গ্রন্থ হোমারের কাব্যগুলি মূল ভাষায় পড়বার অধিকার অর্জন করলেন। হোমারের একনিষ্ঠ পাঠক, স্লীম্যান জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইলিয়ড ও ওডেসি থেকে যে কোন অংশ মুখস্থ আবৃত্তি করে শোনাতে পারতেন। যে সব পণ্যসামগ্রীর কেনাবেচা করে তার প্রতিষ্ঠান প্রভূত অর্থোপার্জন করেছিল তার মধ্যে প্রধান—নীল, তামাক ও তুলা। ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর নীল আমদানি করতেন স্লীম্যান। ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে কলকাতা শহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাঁর। ১৮৬৪ সালে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে তিনি কলকাতায় অবতীর্ণ হন এবং ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত শহর—দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বেনারস, আগ্রা-প্রভৃতি দেখে ভারত-পরিক্রমা শেষ করেন।

লক্ষ্মীর কৃপা তাঁর উপর এত অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়েছিল যে, তিনি তাঁর বাকি জীবনটা যে কোন সাধারণ ধনী লোকের মত বিলাসে গা ঢেলে কাটিয়ে দিতে পারতেন।

কিন্তু বাদ সাধল তাঁর শৈশবের স্বপ্ন। একদিন তিনি নিশ্চিন্ত জীবনের সুখ-শান্তি সব ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে অবসর নিয়ে তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন—ট্রয় নগরীর সন্ধানে মন নিয়োগ করলেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রাশিয়ায় স্বাধীন ব্যবসা শুরু করার পরই তিনি এক রাশিয়ান মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহ সুখের হয়নি। ভদ্রমহিলা যেদিন জানতে পারলেন যে, তাঁর স্বামী প্রত্ন-গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবেন, এজন্য লাভজনক ব্যবসা থেকে বিদায় নিচ্ছেন, তখন তিনি তাঁকে বাতুল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি। তিনি বেঁকে দাঁড়ালেন—বললেন, এ ধরনের পাগলামিকে তিনি কোনমতেই প্রশ্রয় দেবেন না। উভয়ের সম্বন্ধ অতি তিক্ত হয়ে দাঁড়াল। পরিশেষে, যে স্ত্রী তাঁর সত্যিকার সহধর্মিণী হতে পারেননি, তাকে ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করলেন না স্লীম্যান। এর পর তিনি স্থির করেন একজন গ্রিক মহিলার পাণিগ্রহণ করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বন্ধু ও সুহৃদ আর্চ-বিশপ অব এথেন্সকে পত্র দেন। কিছুদিনের মধ্যে ফটো-সহ সম্বন্ধ এনে হাজির করলেন আর্চ-বিশপ। ১৮৬৮ সালে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন স্লীম্যান। বধূ হয়ে তাঁর সংসারে এলেন, উনিশ বছরের গ্রিক কন্যা, পরমাসুন্দরী সোফিয়া।

নবজীবনের সুপ্রভাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অঙ্গীকার করলেন, ট্রয়নগরী তাঁরা খুঁড়ে বার করবেনই। ইউরোপের পণ্ডিত-সমাজ কিন্তু স্লীম্যানকে স্বাগত জানায়নি। তাঁদের মতে স্লীম্যান ধনী হতে পারেন—কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের মত দুরূহ এক শাস্ত্রে তাঁর কোন অধিকার নেই। বিশেষজ্ঞের জ্ঞান না থাকলে এতবড় দুঃসাহসিক পরিকল্পনাকে কি কখনও রূপ দেওয়া যায়? দ্বিতীয়ত, তাঁদের মতে হোমারের জগৎ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। মহাকবির অবিনশ্বর সৃষ্টি ইলিয়ড্ ও ওডেসি সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য সন্দেহ নেই—কিন্তু এগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধান করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। স্লীম্যান যখন কেবল কাব্যের সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করেই এই খনন-কার্য শুরু করলেন, তখন বিশেষজ্ঞেরা উপহাস করে বলেছিলেন, সব ব্যাপারটাই হচ্ছে বড়লোক ব্যবসায়ীর উদ্ভট খেয়ালমাত্র।

হোমারের আশীর্বাদ : ইলিয়ড কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে ১৮৬৮ সালে স্লীম্যান সস্ত্রীক এথেন্সে এসে পৌঁছান। বহুদিন ধরে একটা ধারণা চলে আসছিল যে, ইথাকার অদূরে বুনারবাশি বলে যে গ্রাম, সেখানে আছে একটি অতি প্রাচীন স্তূপ এবং এটিই ট্রয়নগরীর নিশানা জানাচ্ছে। স্তূপটির এই ঐতিহাসিক দাবির সপক্ষে বলা হত যে, এখানে দুটি প্রস্রবণ আছে—ঠিক যেমন দুটির কথা হোমারের কাব্যেও পাওয়া যায়। স্লীম্যান কিন্তু দেখলেন যে, মাত্র দুটি নয়—উষ্ণ ও শীতল সব মিলিয়ে এখানে আটচল্লিশটি প্রস্রবণ আছে। অবশ্য এ ছাড়া আরও দুটি কারণ ছিল, যার জন্য তিনি বুনারবাশি সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিলেন। প্রথমত, সমস্ত অঞ্চলটি চষে ফেললেও কোন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন চোখে পড়বে না এবং দ্বিতীয়ত, সমুদ্রোপকূল থেকে এর দূরত্ব। স্লীম্যানের দৃঢ় বিশ্বাস, ট্রয় সমুদ্রের খুব নিকটে অবস্থিত ছিল। হোমার তো তাই লিখেছেন যে, যারা

এই দুর্গ অবরোধ করল তারা শহর থেকে উপকূল পর্যন্ত রোজ অনেকবার যাতায়াত করত। ট্রয় বেশি দূরে অবস্থিত হলে এমন সহজ-যাতায়াত সম্ভব হত না। গ্রিক ও ট্রোজানদের মধ্যে যে যুদ্ধ ক্রমান্বয়ে দশ বছর-কাল চলে, ইলিয়ডে তার সম্পূর্ণ বিবরণ নেই। হোমার মাত্র শেষ একান্ন দিনের কাহিনী—ট্রয়ের অগ্নিকাণ্ড পর্যন্ত, আমাদের শুনিয়েছেন। যুদ্ধের বর্ণনা পড়ে ট্রয়নগরীর ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপৃষ্ঠের বহিরাবরণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়েছিলেন স্লীম্যান। হোমার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, কিভাবে প্রায়ামের দুর্গের চারিধারে বীর একিলিস হেক্টরকে তিনবার তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বুনারবাশি স্তূপের চারিধারে যেমন চড়াই-উতরাই আছে, তা দেখে স্লীম্যানের মনে হল, যত বড় বীরই হোন না কেন, একিলিসের পক্ষে তিনবার অক্লেশে দুর্গ পরিক্রমা এরকম স্থানে একেবারেই অসম্ভব। স্লীম্যান নিঃসন্দেহে বুঝলেন, বুনারবাশি গ্রামে ট্রয় অনুসন্ধান তাঁর ব্যর্থ হচ্ছে। অতএব অন্যত্র তাঁকে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

বুনারবাশির তিন-চার মাইল উত্তরে নিউ ইলিয়াম বা হিসারলিক নামক গ্রামে কিছু কিছু প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পেলেন স্লীম্যান। সমুদ্রতীর থেকে জায়গাটা তিন-চার মাইলের মধ্যে অবস্থিত দেখে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হল—ভাবলেন, এবার নিশ্চয়ই ঈশ্বর তাঁকে ট্রয়ের নিশানা বলে দিলেন। কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহের কাজটা অতি জটিল হয়ে উঠল। যে দুটি প্রস্রবণ ট্রয় নগরীর দিক নির্দেশ করে নতুন জায়গায় তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। যখন তিনি গভীর হতাশায় নিমজ্জিত, তখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে উৎসাহ দিয়ে জানান যে, আগ্নেয়গিরি-প্রধান অঞ্চলে কখনও-কখনও প্রস্রবণের উৎসমুখ শুকিয়ে যায়। হয়ত এই অঞ্চলে ঠিকই এক সময়ে দুটি প্রস্রবণ ছিল—কিন্তু এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞের অভিমত মনঃপূত হল স্লীম্যানের। আবার তিনি উৎসাহের সঙ্গে অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। এ স্থানে ভূ-পৃষ্ঠ পরীক্ষা করে তাঁর মনে হল, একিলিসের পক্ষে দুর্গ পরিক্রমার কাজটা এখানেই সহজ হতে পারত। সবচেয়ে বেশি তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন নিউ ইলিয়ামের প্রাচীন ইতিহাস জানতে পেরে। তিনি জেনেছিলেন যে, প্রথম শতকে ভৌগোলিক স্ট্রাবো এই স্তূপটির নামকরণ করেন নিউ ইলিয়াম। অ্যারিয়ানের লেখা থেকেও জানা যায় যে, গ্রিক বীর আলেকজাণ্ডার স্বয়ং এই স্থান পরিদর্শন করেন। এথেনার মন্দিরে তিনি পূজা দেন এবং এই মন্দিরে রক্ষিত ট্রোজান বীরদের অস্ত্রশস্ত্র দেখে বিশেষ পুলকিত হন। চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত নিউ ইলিয়াম একটি তীর্থস্থানরূপে পরিচিত ছিল। বহু পরিব্রাজক এখানে এসে ট্রোজান বীরদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতেন। চতুর্থ শতকের পর কোন অজ্ঞাত কারণে নিউ ইলিয়ামের প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হতে থাকে। রোমান অধিপতি কনস্টানটাইন যখন রোম থেকে তাঁর রাজধানী সরিয়ে পূর্বদিকে নিয়ে এলেন, তখন তিনি ট্রয়কে না বেছে, কেন কনস্টানটিনোপলকে পছন্দ করলেন সে কারণ আমাদের জানা নেই।

মাত্র একশত কুলি নিয়ে স্লীম্যান প্রথম তাঁর খননকার্য শুরু করেন। প্রতি পদক্ষেপেই তাঁকে নানা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই তিনি হার মানেননি। পানীয় জলের অভাব, প্রচণ্ড শীত, কুলিদের অসন্তোষ, সর্বোপরি তুর্কি সরকারের বিরূপ মনোভাব—কোন বাধাই শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরাট কর্মপ্রেরণাকে দমাতে পারেনি। নিউ ইলিয়ামের ঠিক কেন্দ্রস্থলেই এথেনার মন্দির অবস্থিত ছিল—এই মনে করে এখানে প্রথম খনন শুরু করা হয়। কিছুকালের মধ্যে মৃত্তিকা-গর্ভ থেকে নানা পৌরাণিক নিদর্শন—থালাবাসন, অস্ত্রশস্ত্র, ফুলদানি, মৃৎপাত্র, অলঙ্কার-ইত্যাদি আবিষ্কৃত হল। কিন্তু তার থেকেও মূল্যবান যে তথ্যটি জানা গেল তা আরও চমকপ্রদ। নিউ ইলিয়াম স্তূপটির নিচেই অনুরূপ আরও একটি স্তূপ আছে—যার এক-একটি স্তরে মানব-সভ্যতার এক-একটি পরিচয় মিলছে। এ যেন প্রকৃতি-রচিত একটি পদ্মকোরক—এক-একটি করে দল মেলে নিজের পরিপূর্ণ রূপকে প্রকাশ করছে। সবসুদ্ধ নয়টি শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করলেন স্লীম্যান। প্রশ্ন হল, এগুলির মধ্যে কোনটি ট্রয়নগরী? দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষ্য পেয়ে স্লীম্যানের ধারণা হল, এই স্তরেই ট্রয় সমাহিত ছিল। এই স্তরে একটি বিরাট দেয়াল ও তোরণদ্বার আবিষ্কৃত হল। স্লীম্যান বললেন, দেয়ালটি প্রায়ামের দুর্গেরই এক অংশ এবং তোরণদ্বার দুর্গের বিখ্যাত 'স্কিয়ান গেট'। অনেকগুলি নিদর্শন ইউরোপে পাঠিয়ে বিশেষজ্ঞের মত জানতে চাইলেন স্লীম্যান। এতদিন যাঁরা তাঁকে উন্মাদ ছাড়া আর কিছু ভাবেননি তাঁরা এখন অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ১৫ জুন খনন বন্ধ করবেন ঠিক করেছিলেন স্লীম্যান। কিন্তু ঠিক সেইদিনই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। সেদিন সকালে সস্ত্রীক স্লীম্যান খননকার্য পরিদর্শন করেছিলেন। অনেক নিচে, গভীর খাদে হঠাৎ একটি চকচকে জিনিসের দিকে তাঁর নজর পড়ল। স্ত্রীকে তিনি চাপা গলায় বললেন, বোধহয় নতুন কিছু মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেছে, সতর্ক হও। কুলিদেরও দূরে সরিয়ে দেওয়া হল। সোফিয়া কুলি-সর্দারকে ডেকে বললেন, 'আজ সাহেবের জন্মদিন। কাজ বন্ধ থাক আজ। বকশিস পাবে তোমরা, সকলে এখন ফুর্তি করো।' কুলিরা সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে গেল। স্লীম্যান এবার অত্যন্ত সন্তর্পণে স্ত্রীকে নিয়ে গভীর খাদে নেমে গেলেন। একটি বড় ছুরি দিয়ে সাবধানে মাটি কেটে, সেই চকচকে গোলাকৃতি বস্তুকে উদ্ধার করতে আরম্ভ করলেন। মাথার উপরে বহু শতাব্দীর পুরাতন ইট ও পাথরের থামিগুলি বিপজ্জনকভাবে ঝুলছিল, সামান্য অসাবধানতাই সর্বনাশ ডেকে আনতে পারত। কিন্তু বহু যুগের স্বপ্ন তাঁর সার্থক হতে চলেছে—এই জয়ের নেশায় এতই তিনি বিভোর ছিলেন যে, ব্যক্তিগত বিপদ-আপদের কথা চিন্তা করবার অবকাশ ছিল না তাঁর। শেষ পর্যন্ত গোলাকৃতি বস্তুটিকে মাটি কেটে উদ্ধার করা হল। সোফিয়া একটি লাল শাল স্বামীর সামনে বিছিয়ে দিলেন এবং তার

উপর উজাড় করে ঢালা হল পুরাকালের কোন এক রাজার গুপ্তধন। এই গুপ্তধনের মধ্যে ছিল অসংখ্য সোনার আংটি, দুল ও ব্রেসলেট, সোনার বড় বড় কয়েকটি পানপাত্র এবং দুটি অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত রাজমুকুট। এই বিপুল রত্নরাজি দেখে স্লীম্যানের সন্দেহ রইল না যে, তিনি রাজা প্রায়ামের রত্নভাণ্ডারটিরই সন্ধান পেয়েছেন।

'ট্রোজান এ্যনটিকুইটি' গ্রন্থে স্লীম্যান কল্পনার সাহায্যে কাহিনী দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর মনে হল, কোন এক বিশ্বস্ত অনুচরের উপর প্রায়াম এই গুপ্তধন রক্ষার ভার দিয়েছিলেন। গভীর রাত্রে যখন প্রাসাদ আক্রান্ত হয়, তখন এই রত্নরাজি কোনো-এক সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছিল। দেয়ালের পাশ দিয়ে এই বিশ্বস্ত অনুচর যখন অতি সন্তর্পণে পালাতে চেষ্টা করছিলেন, তখন শত্রুসৈন্যের বর্শা-ফলকে তাঁর জীবনাবসান হয়। মৃতদেহের উপর ধ্বংসস্তূপ চাপা পড়ে এই হতভাগ্য ব্যক্তির সমাধি রচিত হল এবং বহু শতাব্দী ধরে এই গুপ্তধনকে পাহারা দিতে থাকল কয়েকটি বীভৎস কঙ্কাল। প্রায়ামের রত্নভাণ্ডারে অলঙ্কারগুলি দেখে স্লীম্যান মনে করে নিলেন, এগুলি অঙ্গে ধারণ করতেন স্বয়ং হেলেন। তাঁর মানসচক্ষে ভেসে উঠল সালঙ্কারা সেই নারীর অপূর্ব মুখচ্ছবি—'দ্য ফেস্‌ দ্যাট্‌ লন্‌চট্‌-এ থাউজেন্ড শিপ্‌স্‌'। স্লীম্যানের কল্পনায় তখন জোয়ার এসেছে। অলঙ্কারগুলি পরিধান করে স্ত্রী সোফিয়াকে যখন সামনে এসে দাঁড়াতে বললেন, তখন নিজেও জানতেন না, সোফিয়াকে এত সুন্দর দেখাবে। যে রূপের আগুনে ট্রয় জ্বলেছিল সেই রূপের খানিকটা দীপ্তিচ্ছটা যেন সোফিয়ার আননে এসে পড়ল—অবাক হয়ে মুগ্ধ নয়নে তাই দেখলেন প্রত্নতাত্ত্বিক।

এত মূল্যবান অলঙ্কারাদি নিয়ে স্লীম্যান বিপদে পড়লেন। এই আবিষ্কারকে তিনি কতদিন গোপন রাখবেন? তুর্কি সরকার একবার যদি এ সম্বন্ধে কানাঘুষা শোনে, তবে সবই তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। বহুকষ্টে তুর্কি সরকারের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে এই বহুমূল্য রত্নরাজি তিনি স্বদেশে পাঠাতে পেরেছিলেন। এ বিষয়ে সোফিয়ার আত্মীয়স্বজন তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। এই খবর যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন স্লীম্যান তুর্কি সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়লেন। তাঁর বাড়ি অনেকবার খানাতল্লাসি হল এবং নানা অপমানও সহ্য করতে হল তাঁকে। একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, স্লীম্যানের এই কাজ সাধারণ তস্করবৃত্তির অনেক উর্ধ্বে। তাঁর সপক্ষে বলা চলে যে, কঠোর পরিশ্রম ও দীর্ঘ সাধনার পর তিনি যা পেয়েছিলেন তা তুর্কি সরকারের হাতে না দিয়ে, ইউরোপের বিদ্বৎসমাজের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তুর্কিরা তাঁর বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক মামলা আনে। এই মামলায় স্লীম্যান দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁকে চারশত পাউন্ড জরিমানাও দিতে হয়। স্লীম্যান স্বেচ্ছায় আরও বেশি দেন। তিনি দু'হাজার পাউন্ড তুর্কি সরকারের হাতে দিয়ে বলেন যে, জরিমানা বাদে অবশিষ্ট টাকায় যেন একটি প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা-মন্দির স্থাপন করা হয়।

১৮৯০ সালে মাইকেনিতে খননকার্য চালাবার সময় মনীষী স্লীম্যানের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃতদেহ এথেন্সে আনা হয়েছিল। যিনি গ্রিক সভ্যতা পুনরুদ্ধারের জন্য সারা-জীবন পণ করেছিলেন, যিনি ছিলেন হোমার ও গ্রিক সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পূজারী—তাঁকে শেষবার দর্শন করতে হাজার হাজার গ্রিক নরনারী এথেন্সে সমবেত হয়েছিল। গ্রিসের রাজা স্বয়ং এসে তাঁর সমাধিতে মাল্যদান করেন। আর চরম পরিহাসের মতো লাগে, শেষ পর্যন্ত তাঁরাও এলেন, যাঁরা একদিন তাঁকে কল্পনাবিলাসী বলে উপহাস করেছেন, অবজ্ঞা করেছেন সামান্য হাতুড়ে বলে—তাঁরাও এলেন নতমস্তকে, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে। স্লীম্যান এঁদের প্রণাম নেননি—তিনি এঁদের প্রণত করলেন।

বর্তমান শতকে ব্যাপক খননকার্যের ফলে ট্রয় সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। যে সিদ্ধান্তকে স্লীম্যান স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছিলেন, তার এখন বহুলাংশে সংশোধন প্রয়োজন হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিতকাল পূর্বে আমেরিকান প্রত্নবিদ্ ব্লেগেন ট্রয়ে খননকার্য চালান। তাঁর অনুসন্ধানের ফলে বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা হয়েছে। ব্লেগেন সবসুদ্ধ নয়টি স্তর দেখেছেন। সর্বনিম্ন স্তরটি পাঁচ সহস্র বৎসরেরও বেশি প্রাচীন। দ্বিতীয় স্তরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে—যাতে মনে হয় ৪,২০০ বছর আগে এই অগ্নিকাণ্ডে ট্রয়নগরী ভস্মীভূত হয়েছিল। তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্তরের বয়সকাল খ্রিঃ পূঃ ২২০০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। ষষ্ঠ স্তরটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই স্তরে একটি বৃহৎ প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছে যা উচ্চতায় ৩০ ফুট ও ঘনত্বে ১৫ ফুট। সমস্ত দেয়ালে ও আশেপাশের ইটের গাঁথনিতে একই দিকে একই ধরনের ফাটল লক্ষ করে ব্লেগেন অনুমান করেছেন, ট্রয়ের ষষ্ঠনগরী ভূমিকম্পে বিনষ্ট হয়েছিল। তা ছাড়া এই স্তরে কয়েকটি প্রশস্ত রাজপথের সন্ধান জানা গেল, যেগুলি একটি অনুচ্চ পাহাড়কে কেন্দ্র করে অনেকটা সাইকেলের স্পোকের মত, বৃত্তাকার নগর-প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যদিও এই স্তরেই স্লীম্যানের যোগ্য শিষ্য উইলহেম ডরপ্‌ফেল্ড্ হোমারের ট্রয় নিহিত আছে বলে মনে করতেন। ব্লেগেন অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করে বলেছিলেন, হোমারের ট্রয়কে খুঁজতে হবে পরের স্তরে—অর্থাৎ 'ট্রয় সেভেন এ'-তে। প্রাচীন কিংবদন্তীতে আছে, ট্রয় ১১৮৫ খ্রিঃ পূর্বে বিনষ্ট হয়। এই কিংবদন্তীকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন ব্লেগেন—তা ছাড়া মৃৎপাত্র, ভূমির স্তর ও কয়েকটি নিদর্শন পরীক্ষা করে এই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন। কোন উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তু এই স্তরে (আনুমানিক ১৩০০-১২০০ খ্রিঃ পূর্ব) আবিষ্কৃত হয়নি। পরবর্তী তিনটি স্তর ১২০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পড়ছে। হোমারে ট্রয় সম্বন্ধে কার্ল ব্লেগেনের মতই এখন ঐতিহাসিক সত্য বলে গৃহীত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রত্নতাত্ত্বিকদের তালিকায় হেনরিক স্লীম্যানের নাম সর্বাগ্রে লিখিত থাকবে। গ্রিক-পুরাতত্ত্ব চর্চার পথিকৃৎ হিসাবে তাঁর অক্ষয় কীর্তি কোনদিন ম্লান হবে না।

তিনি সারা-জীবনের সাধনায় এটাই প্রমাণ করেছিলেন যে, হোমারের মহাকাব্য কেবল কাব্য হিসাবেই উৎকৃষ্ট নয়, ইতিহাসেরও আকর গ্রন্থ। প্রাগৈতিহাসিক গ্রিস সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা শুরু করেন, তা তাঁর মৃত্যুর পর অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বর্তমান শতাব্দীতে আর্থার এভান্‌স্‌, মাইকেল ভেনট্রিজ, অ্যালান, ওয়েস, কার্ল ব্লেগেন-প্রভৃতিরা তাঁর সাধনাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে তুলেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে স্লীম্যানের প্রত্নানুসন্ধান সমালোচনার উর্ধ্বে ছিল না। নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। সে যুগে খননকার্য সম্পর্কে সর্বজনস্বীকৃত কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী গড়ে ওঠেনি। প্রত্নতত্ত্ব ছিল অনেকটা গুপ্তধন অন্বেষণের সামিল। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, শাবল ও গাঁইতির ব্যবহারে স্লীম্যান কিছু বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছেন, যা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। কোন-একটি স্তর সম্বন্ধে যথেষ্ট খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করার আগেই তিনি তাকে বিনষ্ট করে নিচের স্তরে কোদাল চালিয়েছেন। তা ছাড়া প্রত্নতত্ত্বে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান না থাকায় তিনি তাঁর বিবরণে এমন কতকগুলি মূল্যবান তথ্য বাদ দিয়ে গেছেন যা কখনই ক্ষমার্হ নয়। বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও বিজ্ঞানসম্মত নয়। ট্রয় ও মাইকেনি—উভয়ক্ষেত্রে তাঁর এই দুর্বলতা ধরা পড়েছে।

এসব ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও স্লীম্যানকে হাতুড়ে বলে অবজ্ঞা করা ঠিক হবে না। আধুনিক বিজ্ঞানীরা অকুণ্ঠভাবে তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তাঁর ছিল এক অদম্য দুঃসাহস—দীর্ঘ মনন ও চিন্তনের ফলে তিনি যে সূত্রটি খুঁজে পেতেন, তারই সাহায্যে নিখুঁত পরিকল্পনা গড়ে তুলতেন তিনি। একবার পরিকল্পনাটি স্পষ্টভাবে মনে আঁকা হয়ে গেলে সমস্ত শক্তি ও সাহস দিয়ে সেটিকে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হতেন। এ যুগের একজন প্রখ্যাত প্রত্নবিদ মর্টিমার হুইলার-এর মতে, আধুনিক গবেষকরা নানা বিষয়ে ভাগ্যবান—গবেষণার বিচিত্র সম্ভার তাঁদের হাতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, নক্‌শা-আঁকার সরঞ্জাম, শক্তিশালী ক্যামেরা, কার্ড ইনডেক্‌স্‌, লগ্‌ বুক-প্রভৃতি নানা হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়েও তাঁরা হারিয়েছেন সেই সৃজনশীল-কল্পনাপ্রবণ মনকে, যা ছিল স্লীম্যানের একমাত্র মূলধন। স্লীম্যানের কাছ থেকে আমরা জেনেছি যে, আত্মপ্রত্যয়, উৎসাহ, উদ্দীপনা-ইত্যাদির সঙ্গে যথেষ্ট কল্পনাশক্তিও থাকা চাই—তা না হলে সব প্রত্নানুসন্ধানই নিতান্ত যান্ত্রিক, প্রাণহীন হতে বাধ্য।

---

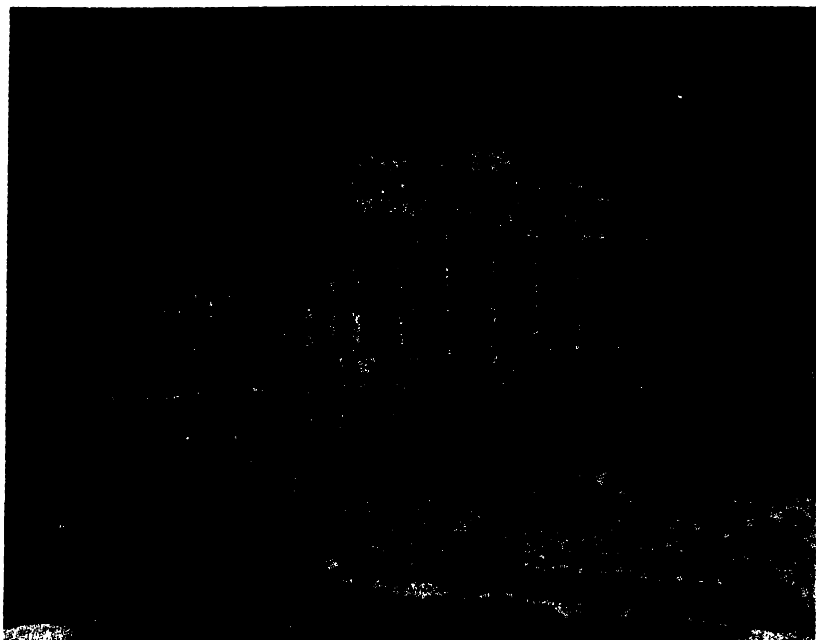
# অসুস্থ পার্থেনন

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে রাষ্ট্রনেতা পেরিক্লিসের উদ্যোগে এবং শিল্পী ইক্‌টিনস্ ও ফিডিয়াসের শিল্পনৈপুণ্যে এথেন্সের কেন্দ্রবিন্দু অ্যাক্রোপোলিস-এর উঁচু জমিতে ভুবনবিখ্যাত পার্থেনন-এর মন্দিরটি গড়ে ওঠে। এই মন্দির নির্মাণের আশুপূর্বে এথেন্স যে দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে পারস্য-আক্রমণের মোকাবিলা করেছিল, তার ফলে সমস্ত গ্রিক জগতে তার নেতৃত্বের আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পারসিক আক্রমণ-বিধ্বস্ত এথেনীয় মন্দিরগুলোর সংস্কারকার্যে উদার হাতে টাকা খরচ করার পক্ষপাতী ছিলেন রাষ্ট্রনেতা পেরিক্লিস। এথেন্সের জনসাধারণ এই সদুদ্দেশ্যে তাঁকে প্রয়োজনীয় টাকা জোগাতে স্বীকৃত হন। কিন্তু মন্দির নির্মাণ শুরু হবার পরই একদল সঙ্কীর্ণমনা লোক বলতে থাকে যে, পেরিক্লিস্ নিজের নাম-প্রচারের উদ্দেশ্যেই অহেতুক অর্থের অপচয় করছেন যা দেশের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক। এ ধরনের অপপ্রচারে ভীত না হয়ে পেরিক্লিস ঘোষণা করেছিলেন যে, কিছু বাজে লোকের সমালোচনায় তাঁর কাজ [illegible] করবে না—মন্দির-নির্মাণ যখন শুরু হয়েছে, তখন সুষ্ঠুভাবে শেষও হবে। দেশের লোক টাকা দিতে রাজি না হলে, পেরিক্লিস একাই সব ব্যয়ভার বহন করবেন। তবে মন্দির শেষ হলে, পাথরের ফলকে এই কথাই লেখা থাকবে যে, পেরিক্লিসের নিজস্ব ব্যয়ে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল—দেশের লোক এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। এ ধরনের স্পষ্ট কথা শোনার পর নিন্দুক-সমালোচকদের মুখ বন্ধ হল—দেশের অন্যান্য লোকও সব ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখতে সচেষ্ট হল।

মন্দির নির্মাণ করতে ঠিক কত টাকা ব্যয় হয়েছিল তার সঠিক হিসাব কোথাও পাওয়া না গেলেও, মন্দিরের বিরাট আয়তন দেখে অনুমান করা যায় যে, একে গড়ে তুলতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। মন্দিরটি আকারে সত্যি বিরাট। যে তিন ধাপ-বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের উপর এটি প্রতিষ্ঠিত, তা দৈর্ঘ্যে ৭০ মিটার, প্রস্থে ৩০ মিটার। মধ্যে সারিবদ্ধ ছেচল্লিশটি শ্বেতপাথরের ঋজু স্তম্ভ সমস্ত ছাদের ভারকে বহন করত। দেবী এথেনার পূজা হত পার্থেননের মন্দিরে। এথেন্সের শৌর্যবীর্যের প্রতীক, এই নগরীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী এথেনাকে গ্রিকরা কন্যা-কুমারী-রূপে কল্পনা করেছিল। একদা মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সোনায় মোড়া, হাতির দাঁত ও সুদৃশ্য কাষ্ঠখণ্ডে তৈরি সুবিশাল দেবীমূর্তি—যাকে সুদীর্ঘ দশ বছরের সাধনায় শিল্পী ফিডিয়াস্ তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল রত্নখচিত শিরস্ত্রাণ, হাতে স্বর্ণনির্মিত ঢাল ও সুদীর্ঘ বর্শাফলক, পায়ের নিচে কুণ্ডলীকৃত বিষধর সর্প। তিলোত্তমা এই দেবী-মূর্তিকে গড়তে ফিডিয়াস নাকি বারোশত কেজি সোনা

ব্যবহার করেছিলেন। মন্দিরের আধো-অন্ধকার প্রাঙ্গণে ১২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট যোদ্ধৃ-বেশী এই দেবী-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে যে কোন এথেনীয় নাগরিক একটা অদৃশ্য সম্মোহিনী শক্তিতে আবিষ্ট হত—ভক্তিনম্রচিত্তে স্বীকার করত, তাদের দেবী কত মহিমাময়ী এবং তাদের রাষ্ট্র এথেন্স কত শক্তিধর। দুঃখের বিষয়, এমন একটি কালজয়ী শিল্পকীর্তিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। খুব রহস্যজনকভাবেই এর অন্তর্ধান ঘটে। খ্রিস্টান শাসক দ্বিতীয় থিওডোসিরাস তাঁর রাজ্যে মূর্তি-পূজা নিষিদ্ধ করেন—অনেক প্যাগান দেব-দেবী তাঁর আদেশে দেশ থেকে বিতাড়িত হলেন। ৪৩৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যাক্রোপোলিস থেকে দেবী এথেনার মূর্তিটি চালান হয়ে চলে গেল কনস্টান্টিনোপল শহরে। সেখান থেকে কবে এবং কিভাবে এটি ভোজবাজির মত সম্পূর্ণ উবে গেল সে-খবর কেউ জানে না। দেবী এথেনার মন্দিরে প্রতি চার বছর অন্তর একটি উৎসবের আয়োজন হত। দূর দূরান্ত থেকে বহু লোক আসত এই উৎসবে যোগ দিতে। উৎসবের এই দৃশ্যটি শিল্পী মন্দিরের গায়ে ১৬০ মিটার দীর্ঘ 'ফ্রিজে' খোদাই করে দিয়েছেন। এই নয়নাভিরাম দৃশ্যের কিয়দংশ এখনও পার্থেননে দেখা যায় এবং তাই দেখতে অসংখ্য ট্যুরিস্টের আগমন হয় প্রতিবছর। নগরবাসীরা উৎসবসাজে সজ্জিত হয়ে দলে-দলে এগিয়ে চলেছেন মন্দির অভিমুখে—পুরোভাগে আছেন হোমরা-চোমরা ব্যক্তিরা, তাদের অনুসরণ করছে যুবক-যুবতীবৃন্দ; সুঠাম ও স্বাস্থ্যবতী এথেনীয় ললনাদের হাতে পূজার ডালি, পুষ্প-পাত্র, পাদ্য-অর্ঘ্য—ইত্যাদি। নৃত্যগীত-সহকারে দেবীর অর্চনা হবে, তাই সঙ্গে চলেছেন একদল বাদ্যকর; রথে বা অশ্বপৃষ্ঠে যাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এথেন্সের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; বেগবান অশ্বের তেজদৃপ্ত ভঙ্গিটি দর্শককে মুগ্ধ করে ; অশ্বের প্রতিটি পেশী পাথরে এত নিখুঁত ফুটে উঠেছে যে, মনে হয় অশ্বটি জীবন্ত—এখনই হয়ত তার হ্রেষা শোনা যাবে; বলির উদ্দেশ্যে যে কটি ছাগশিশুকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদের ক্রন্দনও আমাদের কানে পৌঁছায়। এই শোভাযাত্রার দৃশ্যে শিল্পী প্রতিটি নর-নারী ও জীবজন্তুকে পৃথক করে চিহ্নিত করেছেন—তাদের নিজস্ব সত্তাকে ফুটিয়ে তুলছেন এমনভাবে যে, ভিড়ের মধ্যে কেউ একাকার হয়ে হারিয়ে যায়নি।

আড়াই হাজার বছরের পুরাতন এই মন্দিরের উপর অনেক ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে—যুগে-যুগে একে দাঁড়াতে হয়েছে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি। গ্রিকদের যুগ শেষ হলে আসে রোমানদের যুগ—তারপর যথাক্রমে বাইজানটাইন, ইটালীয় ও তুর্কিদের যুগ। গ্রিকদের যে মন্দিরে নিত্য পূজারতি ও উপাসনা হত কালক্রমে সেটি ব্যবহৃত হতে থাকল চার্চ ও মসজিদ-রূপে—পরে রাজাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাজপ্রাসাদ হিসাবে। রাজপ্রাসাদ থেকে কোন এক সময়ে রূপান্তর ঘটল দুর্গে এবং আরও পরে নিছক বারুদের ডিপোতে। অবশেষে পার্থেননের উপর নেমে এলো ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের সেই ভয়াবহ দিনটি। সে-বছর ভেনিসের সৈন্যরা তুর্কি-অধিকৃত অ্যাক্রোপোলিস অবরোধ করেছিল। তুর্কিরা সে সময় পার্থেননকে বারুদের ডিপোতে পরিণত করেছে। যুদ্ধের সময় ভেনিসের একটি গোলা এসে পড়ল স্তূপীকৃত সেই বারুদে।



*পার্থেননে দেবী আথেনার মন্দির*

মুহূর্তে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পার্থেননের চোদ্দটি মর্মর স্তম্ভ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। অসংখ্য মার্বেলের টুকরো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল এ্যাক্রোপোলিস-এর আশপাশে। পার্থেননের শিল্পসম্ভারের কথা জগতের লোক নতুন করে জানল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে—যে বছর টমাস এলগিন তুর্কি দরবারে ইংলন্ডের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন।

ক্ল্যাসিকাল যুগের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল এই ইংরেজ রাজপুরুষের প্রধান অভিলাষ ছিল, গ্রিসে এসে তিনি গ্রিক পুরাকীর্তির অনুসন্ধান করবেন এবং সুযোগ-সুবিধা মত সারা বিশ্বকে সেই সব দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন উপহার দেবেন। এথেন্স নগরীতে উপস্থিত হয়ে তিনি এ্যাক্রোপোলিস-এ তাঁর অনুসন্ধান কাজ শুরু করেন। তিনি সঙ্গে একদল সুদক্ষ আর্টিস্ট ও ড্রাফটসম্যান এনেছিলেন। পার্থেননের চারিপাশে ভারা বেঁধে তারা মন্দিরের নকশা নিচ্ছিল ও মূর্তিগুলির ছবি আঁকছিল। কাজ কিছুটা অগ্রসর হবার পরই এলগিন ঘোর প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হলেন। বাধা এল স্থানীয় তুর্কি শাসকের কাছ থেকে। পার্থেননের নিকটে এক প্রাচীন সৌধে তাঁর হারেম। ভারার উপর দাঁড়িয়ে যে সব লোক এলগিনের কাজ করছিল, তাদের দৃষ্টি হারেমের আবরুকে কলুষিত করছে এমন সব আজগুবি অভিযোগ এনে তিনি রীতিমত এক গণ্ডগোল বাধিয়ে তুললেন। একে কোন উপায়েই বাগে আনতে না পেরে এলগিন সোজা কনস্টান্টিনোপল-এ সুলতানের দ্বারস্থ হলেন। তুর্কি দরবারে ইংরেজ প্রতিপত্তি তখন উত্তুঙ্গ। ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের প্রার্থনা না-মঞ্জুর করার দুঃসাহস তুর্কি সুলতানের ছিল না। অচিরেই সুলতান এক ফর্মান জারি করলেন। যাতে বলা হল, ইংরেজরা যেমন খুশি ছবি আঁকুক, নকশা নিক—কেউ তাদের কাজে বাধা দেবে না। এমন কি তারা যদি নমুনা হিসাবে দু-একটি পাথরের ভাঙা পুতুল দেশে নিয়েও যায়, তাতেও কোনো আপত্তি নেই সুলতানের। সুলতানের এই অনুমতিপত্রকে বেশ উদারভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন লর্ড এলগিন। মর্মর মন্দিরের বহিরঙ্গের অনেক অংশ, যা খসে পড়েছিল তা তিনি সংগ্রহ করলেন—এমন কি অনেক দেব-দেবীর মূর্তি এবং মন্দিরগাত্রে কারুকার্যখচিত 'ফ্রিজের' দীর্ঘ অংশ, তিনি জলপথে ইংলন্ডে চালান করে দিলেন। বর্তমান যুগে অনেকেই এলগিনের এই কাজকে নিছক কালাপাহাড়ি বলে নিন্দা করেছেন—বিদেশের অমূল্য শিল্পসম্ভারকে এমনভাবে আত্মসাৎ করার দ্বিতীয় নজির নাকি ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এলগিনকে যতই নিন্দা করা হোক না কেন, তাঁর সমর্থনেও দু-একটি যুক্তিপূর্ণ তথ্য নিবেদন করা চলে। যে যুগে তিনি গ্রিসে পদার্পণ করেন সে যুগে মহামূল্য ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি সংরক্ষণের অভাবে হেলায় নষ্ট হচ্ছিল। আরও পঞ্চাশ বছর দেরিতে এলে এলগিন হয়তো সংগ্রহ করার মত কিছুই পেতেন না। সময়মত কিছু নিদর্শন নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে তিনি যদি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করে থাকেন, তাহলে প্রকারান্তরে একটি শুভ কাজই করেছেন। দ্বিতীয় কথা, এলগিন সরকারি ফর্মানের জোরেই যা করার করেছিলেন। বিনা অনুমতিতে পরের দ্রব্য অপহরণ করেননি। অতএব তাঁকে দস্যু বা তস্কর বলে চিহ্নিত করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণই নেই। তুর্কি শাসকরা বিধর্মীদের

দেবদেবীর মূর্তি-সম্পর্কে খুবই উদাসীন ছিলেন। তাঁদের কাছে মূর্তি-পূজা যত নিন্দনীয়, তার চেয়ে অধিক নিন্দনীয় দেব-দেবীকে নগ্নভাবে ক্ষোদিত করার অপচেষ্টা। তাঁদের হাত থেকে প্রাচীন গ্রিসের প্রত্নসম্পদকে রক্ষা করা এক কঠিন কাজ ছিল। কেন না, নগ্ন নারীমূর্তি তাঁদের চোখকে এতই পীড়া দিত যে, সুযোগ পেলে ভাঙচুর করে মনের জ্বালা মেটাতেন তাঁরা। তৃতীয়ত, গ্রিক জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যথেষ্ট দেশাত্মবোধ জাগ্রত হলেও তাঁরা ভাল করেই জানতেন, তুর্কি শাসকদের হাত থেকে গ্রিক পুরাকীর্তিকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব পালনে তাঁরা নিতান্তই অক্ষম। এলগিনকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁরা তখন তাঁকে স্বাগতই জানিয়েছিলেন। তাঁরা যথার্থই ভেবেছিলেন, সুসভ্য ইংরেজ জাতি এই প্রত্ননিদর্শনগুলির প্রকৃত মর্যাদা দেবে—পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আসবে এগুলি দেখতে। পার্থেননের গ্রিক গাইড আজ যখন পৃথিবীর তাবৎ টুরিস্ট-সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে এলগিনকে গালিগালাজ করে তখন তারা এসব কথা বেমালুম ভুলে যায়।

নানা সংবর্তের উদ্বৃত্ত হিসাবে পার্থেননের যেটুকু মহিমা আজ অবশিষ্ট আছে, তাও বর্তমানে রাহুগ্রস্ত। খুব সম্প্রতি জানা গেছে, পার্থেননের মার্বেল এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত। ব্যাধির প্রধান কারণ দূষিত আবহাওয়া। এথেন্স নগরীর অসংখ্য মোটরগাড়ির গ্যাস ও কলকারখানার ধোঁয়া পাথরের ওপর একধরনের ক্যানসার-রোগ সৃষ্টি করছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, গ্রীষ্মের উত্তপ্ত ফুটপাথে যেভাবে একখণ্ড বরফ গলে যায়, ঠিক তেমনিভাবে দূষিত আবহাওয়ার প্রভাবে মার্বেল পাথরও গলছে। মার্বেলের গায়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, যা সাদা চোখে ধরা পড়ে না। সালফার-ডাইঅক্সাইড আর্দ্রবায়ুর সঙ্গে মিশে একধরনের অ্যাসিড তৈরি করে এবং এই বিষাক্ত অ্যাসিড ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট হয়ে পাথরের মধ্যে ঘুণ ধরায়। অল্প আঘাতেই পাথর তখন ঝুরঝুর করে খসে পড়ে। বর্তমানে অ্যাক্রোপোলিস-এ এই ব্যাপারই ঘটেছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে ভাঙনের রূপটি আরও ভয়াবহ হবে। কেবল পার্থেননই নয়, পৃথিবীর তাবৎ মর্মরসৌধ আজ দূষিত পরিবেশের করাল গ্রাসে পতিত। আমাদের তাজমহলের কথাই ধরা যাক। কবি যাকে কালের কপোলতলে শুভ্রসমুজ্জ্বল বলে বর্ণনা করেছেন, সেই তাজমহল ক্রমশই পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করছে, সর্বশরীরে তার মহাব্যাধির চিহ্ন প্রকট। অচিরে যদি মার্বেলের চিকিৎসা শুরু না হয়, তাহলে এদের মহতী বিনষ্টি অনিবার্য।

আজকের পার্থেননে খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতকের সেই বৈভবের অণুমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন এখানে শুধু ধ্বংসস্তূপই পড়ে আছে—স্খলিত মর্মর, ছড়ানো পাথরের টুকরো, তারই মধ্যে সারি সারি স্তম্ভ—ঋজু, সরল সুসংবৃত। মন্দিরের ছাদ ধসে গেছে, দেয়াল নেই, সব মহিমা অন্তর্হিত—তবু সব মিলিয়ে পার্থেননের সম্মোহন অপ্রতিরোধ্য। তুষারশুভ্র স্তম্ভের সারি, তারই ফাঁকে ফাঁকে অবারিত নীল আকাশ—পার্থেননের এই দৃশ্য নিবিড়ভাবে মানুষের মনকে টানে। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি নিয়েও মন্দিরের ছন্দ অটুট, আত্মা অমর। মনে হয়, দেবতারা আজও বুঝি বেঁচে আছেন এখানে—বিচরণ করছেন প্রশস্ত অলিন্দে।

---

# আউরেল স্টাইন : প্রত্নতাত্ত্বিক ও পরিব্রাজক

হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর সীমান্ত থেকে চীন দেশের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি জুড়ে পুরাকালে এক বিপুল সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। মানচিত্রে যে অঞ্চলকে এখন চীনা-তুর্কিস্থান বা রুশ-তুর্কিস্থান নামে অভিহিত করা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক স্টাইন সাহেব তার নামকরণ করেছিলেন 'সেরিন্দিয়া'। গ্রিক সেরেস ও ইন্ডিয়া—এই দুই শব্দের সংমিশ্রণে এই নামের উৎপত্তি। অন্যান্য বিদেশী প্রভাবের কথা বাদ দিলে এই অঞ্চলে বহু প্রাচীন কাল থেকে চীন ও ভারতের প্রভাব অধিকতর কার্যকরী ছিল এবং সেই কথা স্মরণ রেখেই স্টাইনের এই সুন্দর ও সার্থক নামকরণ। সেরিন্দিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়টি বহুযুগ হল মধ্য এশিয়ার মরুবালুতে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু অতীতের সেই হারানো অধ্যায়টি পুনরাবিষ্কৃত করতেই স্টাইন একাধিকবার মধ্য এশিয়াতে খননকার্য চালিয়েছেন। যে অশেষ দৈহিক কষ্ট স্বীকার করে, সবরকম বিপদ-আপদের ঝুঁকি নিয়েও দুর্গম গিরিপর্বত অতিক্রম করে মধ্য এশিয়ায় পৌঁছেছেন, সে কথা ভাবলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। যে ঐতিহাসিক সম্পদ তিনি মধ্য এশিয়া থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন সেগুলি আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি অভিভূত করে তাঁর কঠিন পণ, সঙ্কল্প, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অদম্য আত্মপ্রত্যয়। তাঁর পূর্বে এবং পরে একাধিক ইউরোপীয় পণ্ডিত মধ্য এশিয়ার বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়িয়েছেন—কিন্তু স্টাইনের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-সমন্বিত অনুসন্ধান চালাতে পারা কিংবা তাঁরই মত মনোজ্ঞ বিবরণ রচনার কুশলতা আর কেউই দাবি করতে পারেন না। তাই অর্ধশতাব্দী ধরে স্টাইনকেই আমরা মধ্য-এশিয়ার সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা রূপে সম্মানিত করি।

১৮৬২ সালে হাঙ্গেরীর বুডাপেস্ট শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে মার্ক আউরেল স্টাইনের জন্ম। কৈশোরে তাঁর বিদ্যালাভের সুযোগ ঘটে জার্মানির টুবিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই পরে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাশেষে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছায় তিনি ইংলন্ডে চলে আসেন। ইংলন্ডে এসে স্টাইন অক্সফোর্ড ও লন্ডনে পুরাতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত হন। ক্রমে এই নবাগতের মধ্যে প্রকৃত একজন পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ধান পেয়ে ইংলন্ডের সুধীসমাজ তাঁকে সাদরে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় স্টাইন তাঁর বাকি জীবনটা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই ইংলন্ডে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তখনও তাঁর ঘোরার পালা শেষ হয়নি। তাই ইংলন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তখনকার দিনে জীবিকার অন্বেষণে অনেক স্বনামধন্য ইংরেজ ভারতে চাকরি নিয়ে

চলে আসতেন। স্টাইন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। ১৮৮৮ সালে লাহোরে অবস্থিত ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করে তিনি ভারতে আগমন করলেন। প্রথম দর্শনেই স্টাইন ভারতকে ভালবেসেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ভারত হচ্ছে প্রত্নবিদ্যার যথার্থ এক রত্নখনি। বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়-সহকারে এই বহুমূল্য খনির বিবিধ রত্নে নিজের সঞ্চয়ের ভাণ্ডার তিনি ভরে তুলবেন—এই ছিল তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। সর্বপ্রথম স্টাইন কবি কহ্লণ-কৃত কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী'র সম্পাদনার কাজে হাত দেন। দু'খণ্ডে প্রকাশিত স্টাইনের 'রাজতরঙ্গিণী' আজও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। বলতে বাধা নেই, স্টাইন যদি তাঁর অবশিষ্ট জীবনে আর কিছু নাও লিখতেন তবু এই সম্পাদনা-কাজটিই তাঁকে অমর করে রাখত। কলেজের অধ্যাপনার ফাঁকে-ফাঁকে স্টাইন নিজের খেয়ালে গবেষণা চালিয়ে যেতেন। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের নেশা তাঁকে কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অনেক দুর্গম অঞ্চলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। পুরাতন নগর বা জনপদের সঠিক ভৌগোলিক পরিচয় জানতে তিনি মাইলের পর মাইল অতি দুর্গম পার্বত্য-পথ অতিক্রম করে যেতেন। এইভাবে পথ চলতে চলতে কত নূতন নিদর্শনের তিনি সন্ধান পেতেন—কত নূতন চিন্তা-ভাবনা ভিড় করে আসত তাঁর মনে, যার সূত্র ধরে নূতনতর সন্ধানের দিকে বারে-বারে এগিয়ে যেতে পারতেন তিনি। অনেক চিন্তা মনের মধ্যে উঠে, মনেই লয় পেত। কোনটি আবার দানা বেঁধে উঠত সুচিন্তিত এক পরিকল্পনার আকারে। একবার এক গ্রীষ্মকালীন অবকাশে পার্বত্য-পথে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে তাঁর মনে বাসনা জাগল যে, পুরাকালে ভারত ও চীনের মধ্যে, পাহাড় অতিক্রম করে যে হাঁটাপথ ছিল সেই পথেই তাঁকে মধ্য এশিয়ায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। দশ বছর কাল চলল এই অভিযানের প্রস্তুতি। সরকারি সাহায্য-ব্যতিরেকে এই অভিযান চালানো দুঃসাধ্য। তাই তিনি বহু যত্ন ও পরিশ্রমে এক পরিকল্পনা তৈরি করে ভারত সরকারের কাছে পেশ করেন। তার ফলাফল সম্পর্কে কিছু জানতে পারার আগেই তিনি বদলি হয়ে চলে এলেন বাংলাদেশে। ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে উন্নীত করে সরকার তাঁর বিদ্যাবত্তা ও মননশীলতাকে সম্মানিত করলেন এবং সেই সঙ্গে অর্পণ করলেন কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদ। এই আকস্মিক পদোন্নতিতে কোন আত্মপ্রসাদই লাভ করেননি স্টাইন, বরং বিমর্ষই হয়েছিলেন। কেননা, তিনি বুঝেছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে নিজস্ব সাধনার ক্ষেত্র থেকে বাংলাদেশে নির্বাসিত হয়ে থাকলে কোনদিনই তাঁর মধ্য এশিয়া অভিযানের পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবে না। অত সাধের পরিকল্পনাটি এভাবে নষ্ট হচ্ছে দেখে তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু ভগবান তাঁর সহায় ছিলেন। সৌভাগ্যবশত লর্ড কার্জন সে সময়ে ভারতের বড়লাট। ভারতের পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। স্টাইন যে পরিকল্পনাটি পেশ করেন সেটি তাঁরই হাতে পড়ে এবং তিনি সেটি আদ্যোপান্ত পড়ে স্টাইনকে অভিনন্দন

জানান। কার্জনের আদেশে স্টাইনের ছুটি মঞ্জুর হল। পরিকল্পনার ব্যয়-ভারও সরকার বহন করতে সম্মত হলেন।

১৯০০ সালে কাশ্মীর থেকে যাত্রা শুরু করে স্টাইন গিলগিট ও হুনজার পথ ধরলেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সামনেই পড়ল অতি দুর্গম কিলিক পাশ এবং এই দুর্গম গিরিসঙ্কট দিয়েই তাঁর দলটি পামীর অতিক্রম করল। সম্ভবত এই ভয়ঙ্কর পথটিকেই পালি সাহিত্যে বলা হয়েছে 'জন্নু পথ' অর্থাৎ যে পথ জানু দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। হিন্দুকুশের অপর প্রান্তে পৌঁছে স্টাইনের লক্ষ্য হল, খোটান পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া। মধ্য এশিয়ার তাকলামাকান মরুভূমিকে বেষ্টন করে যে দুটি প্রধান সড়ক উত্তর ও দক্ষিণে চীন দেশ পর্যন্ত প্রসারিত তারই উপর প্রাচীনকালে প্রধান জনপদগুলি গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণবাহী পথটির উপরেই খোটান অবস্থিত। প্রায় একবছর ধরে খোটান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে খননকার্য চালিয়ে স্টাইন হাজার-দেড়-হাজার বছরের পুরাতন অনেক পুঁথিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ উদ্ধার করলেন। এগুলি ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, চীনা, তিব্বতী, পারসিক ইত্যাদি নানা লিপিতে লিখিত—যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এই অঞ্চলে পুরাকালে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা বহু ও বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। তাকলামাকান মরুভূমির ক্রমবিস্তারের ফলে এই সুসভ্য বর্ধিষ্ণু অঞ্চলগুলি বালির আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মরুভূমির শুষ্কতার জন্যই এখানে অমূল্য উপাদানগুলি এমন অক্ষত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল। 'এনসেন্ট খোটান' ও 'স্যান্ড বেরিড রুইনস্ অব খোটান'—এই দুই সুবৃহৎ গ্রন্থে স্টাইন তাঁর এই অভিযানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

রাস্তাঘাট সম্বন্ধে প্রথমবার যে অভিজ্ঞতা হল তাব ফলে স্টাইন তাঁর পরবর্তী অভিযানকে (১৯০৬-০৮) অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন। দ্বিতীয় অভিযানে ভারত সরকার ও ব্রিটিশ মিউজিয়াম যৌথভাবে তাঁকে অর্থ সাহায্য করেন। সার্ভে অব ইন্ডিয়ার দুজন বিশ্বস্ত অনুচর-সহ স্টাইন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে যাত্রা শুরু করে সোয়াট ও ডির-এর পথ ধরে হিন্দুকুশ অতিক্রম করলেন। এই পথেই প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে আলেকজান্দারের সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী ভারতে প্রবেশ করেছিল। স্টাইন তাঁর দলটিকে প্রথম খোটানে নিয়ে এলেন—তারপর ক্রমশ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে নিয়া, লব-নোর, মিরান প্রভৃতি অঞ্চলে খননকার্য চালান। দ্বিতীয় অভিযানে স্টাইন কতকগুলি অমূল্য নিদর্শন লাভ করলেন। নিয়া অঞ্চলে খরোষ্ঠীতে লেখা অনেক কাষ্ঠফলক পাওয়া গেল, যার ভাষা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃত ভাষার অনুরূপ। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, এখানকার অধিবাসীরা মূলত ভারতীয় ঔপনিবেশিক ছিল। নিয়া থেকে আরও কিছু দূরে মিরানের ধ্বংস-স্তূপ। এখানে তিব্বতী ভাষায় লিখিত সহস্রাধিক দলিল আবিষ্কৃত হল। মিরানে স্টাইন এক প্রাচীন মন্দির খুঁড়ে বার করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল গান্ধার শিল্প-রীতিতে নির্মিত বুদ্ধের এক অতিকায় মূর্তি। মিরান ছাড়িয়ে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর

হতে-হতে স্টাইনের নজরে আসে দীর্ঘপ্রসারী অনুচ্চ প্রাচীরের এক বেষ্টনী। বালির আচ্ছাদনে ঢাকা ও আংশিক ক্ষয়প্রাপ্ত এই প্রাচীরের উপর কিছুদুর অন্তর নিরীক্ষণ-স্তম্ভ বা ওয়াচ টাওয়ার দেখা গেল। এগুলির একটির মধ্যে অনেক সরকারি কাগজপত্র অটুট অবস্থায় উদ্ধার করেছিলেন স্টাইন। তিনি অনুমান করেন যে, চীনের হ্যান বংশীয় রাজারা তাঁদের চিরশত্রু হুনদের আক্রমণ থেকে বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও রেশম ব্যবসায়ীদের রক্ষা করার জন্যই চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের অনুরূপ এই প্রাচীর নির্মাণ করেন। লব-নোর বা লবণ-হ্রদ পার হলেই গোবি মরুভূমি আরম্ভ। এই মরুভূমি অতিক্রম করে চীন সাম্রাজ্যের প্রবেশদ্বার তুন-হুয়াং-এ পৌঁছনো যায়। মহাপণ্ডিত হিউয়েন সাঙ্ এই মরুভূমি পার হয়েই তথাগতের জন্মভূমি ভারততীর্থ অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর লেখায় এই পথের এক ভয়াবহ বর্ণনা পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ্ জানিয়েছেন যে, এই ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে তাঁর পথপ্রদর্শক ছিল শুধু মৃতযাত্রীর অস্থি ও উটের মল। এই পথ পরিচারণ করতে-করতে নানা অদ্ভুত দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ে। একদিন তাঁর মনে হল, তিনি দেখলেন শত-শত সুসজ্জিত যোদ্ধা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। কখনও তারা কুচকাওয়াজ করছে, কখনও বা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের পরিধানে চামড়ার পরিচ্ছদ। একদিকে উট ও সুসজ্জিত ঘোড়া, অন্যদিকে নিশান আর ঝকঝকে বর্শা। পরিব্রাজক ভাবলেন, এসবই দৈত্য-দানব, ভূতপ্রেতের কারসাজি। পথ চলতে-চলতে কখনও বা সঙ্গীতের মূর্ছনা, কখনও করুণ আর্তনাদ কানে ভেসে আসছিল তাঁর। এই ভয়ঙ্কর মরুভূমি পার হতে স্টাইনের পুরো একুশটি দিন লেগেছিল।

স্টাইন যখন পুরাকীর্তির অনুসন্ধানে মরুপথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন এক মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছে তিনি জানতে পারেন যে, তুন্-হুয়াং-এর 'হাজার বুদ্ধের গুহায়' এক অজ্ঞাত প্রকোষ্ঠে অনেক প্রাচীন পুঁথিপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তুন্-হুয়াং-এ পৌঁছে স্টাইন অনুসন্ধান করে জানলেন খবরটি সত্য। শহরের উপকণ্ঠে একটি পাহাড়—তারই গায়ে মৌচাকের মত অসংখ্য গুহা। এইজন্যই এর নাম 'সহস্র বুদ্ধের গুহা'—একদা বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ভিক্ষুরা নিভৃতে এখানে সাধন-ভজন করতেন। এরই এক অজ্ঞাত কোণে পাওয়া গেছে অসংখ্য পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন পুঁথিপত্র। যে গুহাটিতে এগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটি যে প্রাচীন সঙ্ঘারামের গ্রন্থাগাররূপে ব্যবহৃত হত তাতে সন্দেহ নেই। ওয়াং টাওসি নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নিজস্ব সংগৃহীত অর্থে গুহাগুলির সংস্কার-সাধন করে কালক্রমে 'সহস্র বুদ্ধের গুহার' মালিক হয়ে বসেছিল। আবিষ্কৃত পুঁথিপত্রগুলির মর্মোদ্ধার করার মত বিদ্যা না থাকলেও সে অনুমান করেছিল, এগুলি ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে অমূল্য। তাই যক্ষের মত এই গুপ্তধনকে সে পাহারা দিয়ে যাচ্ছিল। আবিষ্কারের কথা বেশি জানাজানি হলে পাছে মানুষের মন অযথা কৌতূহলী হয়ে ওঠে—এই আশঙ্কায় সে যতদূর সম্ভব বিষয়টিকে গোপন রেখেছিল। আভাসে-ইঙ্গিতে

ও লোকমুখে স্টাইন যা শুনেছিলেন তুন্-হুয়াং-এ এসে তার বেশি কিছু জানতে পারলেন না। এই লৌহযবনিকা ভেদ করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যেভাবে ধীরে-ধীরে তিনি তুন্-হুয়াং গুহায় নিহিত রত্নভাণ্ডার উদ্ধার করলেন, সে কাহিনী যে কোন রোমাঞ্চকর গল্পের চেয়েও অধিক চমকপ্রদ। স্টাইন তুন্-হুয়াং গুহায় তাঁর চীনা সেক্রেটারিকে প্রথম পাঠিয়ে দেন গুহারক্ষকের মতিগতি বুঝবার জন্য। সেক্রেটারি সুযোগ বুঝে ওয়াং-এর কাছে বিনীত প্রার্থনা জানান যে, সাহেব নবাবিষ্কৃত পুঁথিগুলি একবার স্বচক্ষে দেখতে চান। বলা বাহুল্য, ওয়াং-এর পক্ষে একজন অজ্ঞাতনামা বিদেশীকে বিশ্বাস করা সহজ ছিল না। তাই তাঁর প্রার্থনা নামঞ্জুর হল। স্টাইন কিন্তু হাল ছাড়েননি। একজন সরল, নিরীহ, ভীতু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে পরাভূত করার মত কূটবুদ্ধি তাঁর ছিল। প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্রের কথা একবারও না তুলে তিনি কয়েকদিন এমন ভাব দেখাতে লাগলেন, যেন তিনি বুদ্ধের একনিষ্ঠ উপাসক—পুণ্যাত্মা হিউয়েন সাঙ্ যে পথে ভারতে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন সেই পথেরই অনুসরণ করে তিনি চীন সীমান্তে এসে পৌঁছেছেন। স্টাইনের হাবভাবে এমন এক আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল যে ওয়াং এইটুকু বুঝল যে, বিদেশী পণ্ডিত সত্যধর্মেব অনুরাগী এবং আর যাই হোক ঠক-জোচ্চোর নন কখনও। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া গেল, গুহারক্ষকের পাষাণহৃদয় গলেছে—কেননা নমুনা-স্বরূপ একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি সে সাহেবের কাছ পাঠাতে রাজি হল। সেটি প্রদীপের স্তিমিত আলোকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে স্টাইন বিস্মিত হলেন। মহাপণ্ডিত হিউয়েন সাঙ্ ভারতভূমি থেকে যে সব বৌদ্ধশাস্ত্র চীন দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন, এটি তারই একটি চীনা অনুবাদ। স্টাইন অনুমান করলেন, হিউয়েন সাঙ্-কৃত অন্যান্য অনুবাদগুলি এখানেই পাওয়া যাবে। পরের দিন সকালে তিনি ছুটে এলেন ওয়াং-এর কাছে। কিছুক্ষণ হিউয়েন সাঙ্-প্রশস্তি গাইবার পর স্টাইন পবিষ্কারভাবেই গুহারক্ষক ওয়াংকে বললেন যে, অমূল্য পুঁথিপত্রগুলি যদি গুহাতেই আবদ্ধ থেকে যায় তাহলে বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্য কি তা কেউই অনুধাবন করতে পারবে না। হিউয়েন সাঙ্ যে কতবড় পণ্ডিত ছিলেন জগতের কাছে তাও অজ্ঞাত থেকে যাবে। বিদেশী পণ্ডিতের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় ওয়াং-এর শুভবুদ্ধির উদয় হল—খানিকটা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সে স্টাইনকে নিয়ে এলো সেই গুহাটিতে, যেখানে সঞ্চিত ছিল প্রাচীন জগতের জ্ঞানভাণ্ডার। গুহামধ্যে ঢুকে স্টাইন বিস্ময়ে হতবাক হলেন—ঘরের কোণে উজাড় করে ছড়ানো অজস্র পাণ্ডুলিপি। কত বিভিন্ন লিপিতে সেগুলি লেখা—কোনটা ব্রাহ্মীতে, কোনটা খরোষ্ঠীতে, কোনটা চীনা বা তিব্বতীতে। কেবল পুঁথিপত্রই নয়—প্রাচীন চিত্রকলার নানা অপূর্ব নিদর্শনও চোখে পড়ল তাঁর। গুহার দেওয়ালেও ছবির শোভাযাত্রা—কোন অজ্ঞাত শিল্পীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম সেগুলি। তুন্-হুয়াং যেন চীনের অজন্তা। এত প্রচুর পৌরাণিক নিদর্শন দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলেও স্টাইন মনে-মনে সর্বক্ষণ চিন্তা করে যাচ্ছিলেন, এই বিচিত্র

নিদর্শনগুলি কিভাবে অক্ষত অবস্থায় ইউরোপে স্থানান্তরিত করা যায়। কিন্তু স্থানান্তরিত করার কথা উঠতেই ওয়াং ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তার ভয় হল, শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় পুঁথিপত্র দেশছাড়া হলে তার নিজের তো মহাপাতক হবেই—দেশেরও অকল্যাণ ঘটবে। ধর্মযাজকদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের সঙ্গে স্টাইনের পরিচয় দীর্ঘদিনের। তিনি জানতেন, এই জাতীয় ধর্মভীরু লোকেরা অর্থলোভী হয়ে থাকে। এই ভেবে তিনি তাঁর শেষ অমোঘ অস্ত্রটি ছাড়লেন। বুদ্ধভক্ত হিসাবে গুহা-সংস্কারের জন্য তিনি পাঁচশত টাকা ওয়াং-এর হাতে তুলে দিতে চাইলেন। কিন্তু অনুরোধ করলেন, প্রতিদানে তাঁকে যেন কয়েকটি পাণ্ডুলিপি বিদেশে নিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। রুপোর কাঠির স্পর্শে ওয়াং-এর কঠিন মন দ্রবীভূত হল। সপ্তাহখানেক বাদে স্টাইন যেদিন তুন্-হুয়াং ছেড়ে স্বদেশ-অভিমুখে যাত্রা করলেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে চলল অশ্বপৃষ্ঠে বোঝাই উনত্রিশটি কাঠের প্যাকিং-বাক্স। তার মধ্যে ছিল প্রাচীন পুঁথিপত্র ছাড়াও চিত্রকলার অসংখ্য নিদর্শন—কোনটা সূক্ষ্ম রেশমের উপর কাজ করা, কোনটা বা পুঁথির উপর আঁকা। যথাসময়ে এগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের হাতে তুলে দিয়ে স্টাইন সকলের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়ে রইলেন। তুন্-হুয়াং-এর আবিষ্কার সারা জগতে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। ইউরোপের পণ্ডিতসমাজ প্রাচ্য-বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। পরের বছর তুন্-হুয়াং-এর পথে পা বাড়ালেন ফরাসি পণ্ডিত পেলিও—'হাজার বুদ্ধের গুহায়' তখনও যা কিছু অবশিষ্ট ছিল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে নিয়ে এলেন। কাজটি এমন নিখুঁতভাবে তিনি করেছিলেন যে, পরে আরও একবার যখন স্টাইন তুন্-হুয়াং-এ আসেন, তখন সংগ্রহ করার মত আর কিছুই পড়ে ছিল না।

তুন্-হুয়াং পরিক্রমা শেষ করে ফেরার পথে স্টাইন তাকলামাকান মরুভূমির উত্তরবাহী পথটি ধরে কুচার পর্যন্ত এসে, মরুভূমির মধ্যভাগ দিয়ে অগ্রসর হয়ে, সোজাসুজি দক্ষিণপ্রান্তে নিয়াতে পৌঁছবার সঙ্কল্প করেন। পরিকল্পনা যেমন দুঃসাহসিক, পথটি তেমনই ভয়ঙ্কর। হিউয়েন সাঙ্ তাকলামাকানের নাম দিয়েছিলেন—'বিশাল বহমান বালি।' তিনি লিখেছেন, এখানে বালি সর্বদাই চলমান। পথের কোন চিহ্ন নেই—জল বা উদ্ভিদ চোখে পড়ে না। তাই অনেক-সময় বালির সমুদ্রে পথ হারিয়ে পথিকের প্রাণ যায়। পথটি এত ভয়ঙ্কর স্টাইনের জানা ছিল না। মরুভূমিতে পানীয় জলের অভাব মেটাতে উটের পিঠে যথেষ্ট বরফের চাঁই নেওয়া হল। কিন্তু কয়েকদিন বালির সমুদ্রে পাড়ি দিতেই দেখা গেল, পানীয় জলের টানাটানি শুরু হয়েছে। দু-একটি বিরল মরুদ্যান যা চোখে পড়ল সেখানে সবুজের কোন চিহ্ন নেই—সবই শুকিয়ে মরে গেছে। অনেকটা মাটি খুঁড়েও জলের সন্ধান পাওয়া গেল না। দলের লোকেরা আর অগ্রসর হতে সাহস করে না—তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল। ভারবাহী পশুরাও জলের অভাবে মৃতপ্রায়। কুলিরা বেঁকে দাঁড়াল—বেঘোরে প্রাণ হারাতে কেউই প্রস্তুত নয়। তবু হাল ছাড়েননি স্টাইন। এই

ভয়ঙ্কর পথের শেষ নিশ্চয়ই আছে—এই আশায় আরও দু'দিন এগিয়ে চললেন তিনি। কখনও মিষ্টি কথা বলে, কখনও ভয় দেখিয়ে কুলিদের তিনি শান্ত রাখতে চেষ্টা করলেন। দিনের বেলা প্রখর রৌদ্রে তাকলামাকান মরুভূমি ধূ-ধূ করে জ্বলতে থাকে। কিন্তু দিনাবসানে এর বিপরীত। রাত্রে এখানে প্রচণ্ড শীত নেমে আসে। তাপমাত্রা তখন এত নিচে নেমে যায় যে, এক পেয়ালা গরম জলও কয়েক মিনিটে বরফের টুকরায় পরিণত হয়। বালির সমুদ্রে তাঁবু খাটিয়ে শেষ বরফের চাঁইটি আগলে রেখে স্টাইন রাত্রে তাঁর ডায়েরির পাতায় দিনের ঘটনাবলী লিখে রাখছিলেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তখন কলমের কালিও বুঝি বরফে জমে যায়! গভীর দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সে রাত কাটল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে আবার শুরু হল তাঁর যাত্রা। পরবর্তী দু'দিন একটানা হাঁটার পর স্টাইনের দলটি এসে পৌঁছাল কেরিয়া নদীর উৎসমুখে—নদীর জল যেখানে জমে বরফ হয়ে আছে। আনন্দের আতিশয্যে তৃষ্ণার্ত ও পরিশ্রান্ত কুলির দল চেঁচিয়ে উঠল। প্রাণদায়িনী উৎস-ধারা আকণ্ঠ পান করে তারা সতেজ হল—ভারবাহী পশুরাও দীর্ঘদিন বাদে জল পেয়ে প্রাণে বাঁচল। এরপর যাত্রাপথ আরও ভয়ঙ্কর—আরও বিপদসঙ্কুল। খোটান ও নিয়ার দক্ষিণে কুয়েনলুন পর্বতমালা। এই সু-উচ্চ পর্বতবেষ্টনী পার হয়ে রাস্তাঘাটের পরিচয় নিতে-নিতে স্বগৃহে ফিরবেন এই ছিল স্টাইনের বাসনা। এই ভয়ঙ্কর পথে মানুষ কোনদিন পা বাড়ায়নি। দূরের তুষারাচ্ছাদিত চূড়াগুলি এত উঁচুতে যে, পাখিরাও সেগুলি উড়ে পার হতে পারে না। তাছাড়া সৃষ্টির প্রথম থেকে সেখানে বরফ জমে তৈরি হয়ে আছে বিশাল হিমবাহ। পর্বতারোহণে বিশেষ পারদর্শী হয়েও স্টাইন এই পথে পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হলেন। বিশ হাজার ফুট উঁচুতে বরফে ঢাকা পথ অতিক্রম করতে করতে স্টাইন একদিন অনুভব করলেন যে, তাঁর পায়ের আঙুলগুলি সব অবশ হয়ে গেছে। কিছু সময়ের মধ্যেই প্রবল যন্ত্রণায় তিনি চৈতন্য হারালেন। তিনশ মাইল খাড়াই পথ কুলিরা তাঁকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে এল লেহ্ নগরীতে। সেখানকার মিশনারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হল। তুষারের কামড়ে তাঁর ডান পায়ের আঙুলগুলি সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—ডাক্তার সেগুলি অপারেশন করে বাদ দিলেন। কিছুকাল হাসপাতালে বিশ্রাম নেবার পর ১৯০৮ সালে নভেম্বর মাসে শ্রীনগরে ফিরে এসে স্টাইন এবারকার মত তাঁর যাত্রা সাঙ্গ করলেন।

ব্যক্তিগত বিপদ ও অঙ্গহানি ছাড়াও আর-একটি দুর্ঘটনা স্টাইনের মনের উপর চিরকালের মত একটা কালো-পর্দা টেনে দেয়। স্টাইন যখন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে অন্যত্র ব্যস্ত তখন তিনি তাঁর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ, বিশ্বস্ত অনুচর নায়েক রামসিং-কে মিরান অঞ্চলে পাঠান কিছু ছবি তুলে আনার জন্য। রামসিং মিরানে পৌঁছে একদিন প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা অনুভব করলেন এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর একটি চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। পরিণাম ভয়ঙ্কর জেনেও রামসিং তাঁর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরতে রাজি

হলেন না। অবশেষে তাঁর অপর চোখটিও দৃষ্টিহীন হল—আগেরটির মত। কাজ শেষ করে তিনি যেদিন স্টাইনের সামনে দাঁড়ান, সেদিন একেবারেই অন্ধ তিনি। এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্য স্টাইন প্রস্তুত ছিলেন না। কালবিলম্ব না করে রামসিং-কে তিনি ইয়ারকন্দের সুইডিশ মিশনারি ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করে বললেন, দুরারোগ্য গ্লুকমা রোগে দু'চোখই নষ্ট হয়ে গেছে—এর আর কোন প্রতিকার নেই। স্টাইনের মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি সর্বদাই নিজেকে দোষী মনে করছিলেন, তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল যে, মধ্য এশিয়ায় তাঁর সঙ্গে না এলে বোধহয় বেচারি রামসিং-এর চোখ এভাবে নষ্ট হত না। পরে তিনি বহু চিকিৎসককে দিয়ে রামসিং-এর চোখ পরীক্ষা করিয়েছেন এবং তাঁদের মতামত নিয়েছেন। সকলেই একবাক্যে রায় দিয়েছেন যে, গ্লুকমা রোগ ভারত বা মধ্য এশিয়ার যে কোন স্থানে রামসিং-এর হতে পারত—এজন্য স্টাইন বিন্দুমাত্র দোষী নন। তবু ভ্রান্ত ধারণা সহজে ঘোচে না। স্টাইনের মধ্য এশিয়া অভিযান বর্ণনাকালে তুষারঝটিকায় জনৈক সহচরের দৃষ্টিহীনতার কথা ইংরেজ পণ্ডিত আজও বেশ বিপদ করে লিখে থাকেন।

১৯৩৩ সালে স্টাইন তৃতীয়বার মধ্য এশিয়ায় আসেন। এবারকার অভিযান তিনবছর-কাল স্থায়ী হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি হাজার-হাজার মাইল পথ পরিক্রমা করে বহু অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ করেন। ইতিপূর্বে যেসব স্থানে তাঁর যাওয়ার সুযোগ হয়নি এই অভিযানে তিনি সেগুলি প্রদক্ষিণ করেন। স্টাইনের 'ইনারমোস্ট এশিয়া'তে এই অভিযানের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ১৯১৬ সালের পর স্টাইন আর মধ্য এশিয়ায় যেতে পারেননি। রাজনৈতিক অবস্থা জটিল হওয়ায়, মধ্য-এশিয়ায় নূতন কোন অভিযান নিয়ে যাওয়া ভারত সরকারের অভিপ্রেত ছিল না। নবীন চীনের উগ্র দেশপ্রেমিকরাও বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত এ জাতীয় প্রত্ন-অনুসন্ধানের ঘোর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। দেশের অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ বিদেশীরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে—এই ছিল তাদের প্রধান অভিযোগ। স্টাইন তাঁর আজন্ম সাধনার ক্ষেত্র মধ্য এশিয়ায় পৌঁছতে না পেরে মনে-মনে বড়ই বেদনা বোধ করেছিলেন। তবু তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারেননি। তাঁর সদাজাগ্রত কৌতূহল এবার নূতন পথ ধরল। আলেকজান্দার যে পথে ভারতে এসেছিলেন তার সঠিক পরিচয় জানতে তিনি পারস্য-ব্যাবিলন থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত পার্বত্য পথ চষে ফেলেছিলেন। ১৯২৩ সালে সিন্ধু-সভ্যতার বিশদ বিবরণ পাওয়া গেল মার্শালের খনন-কার্যের ফলে। এই নতুন আবিষ্কার স্টাইনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন মেসোপটেমিয় সভ্যতার যোগসূত্র আবিষ্কারের বাসনায় তিনি পারস্য ও বেলুচিস্থানে কিছু-কিছু খননকার্য চালান।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে স্টাইনের স্থান নির্দেশ করা সহজ নয়। কহ্লণকৃত রাজতরঙ্গিণীর ইংরেজি অনুবাদ ও সম্পাদনা ছাড়া ভারতের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস সম্বন্ধে স্টাইনের আর কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা নেই। তাঁর যা কিছু কাজ সবই ভারত-বহির্ভূত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। তাই ভারতের প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে তাঁকে আদৌ কোন স্থান দেওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে স্মরণ রাখতে হবে, স্টাইন যে সময় ভারতের প্রত্নবিভাগে যোগ দিয়েছিলেন সেটি মার্শালের যুগ। স্যার জন মার্শাল যখন বিরাট বনস্পতির মত ভারতের প্রত্নবিভাগকে পরিব্যাপ্ত করে স্বকীয় মহিমায় বিরাজ করছেন—সেই সময়েই স্টাইন স্থায়ীভাবে প্রত্নবিভাগে যোগ দেন এবং তিনিই ছিলেন মার্শালের আকাশে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তাই এই আমলের যা কিছু ভাল-মন্দ, দোষত্রুটি, প্রশংসা-নিন্দা, সবেরই তিনি অংশীদার হতে বাধ্য। মার্শাল প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বিপুল উন্নতি সাধন করে গেছেন—তক্ষশিলা ও মহেঞ্জোদড়োর খননকার্য তাঁর অক্ষয় কীর্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। তবু পরবর্তী কালের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের সন্ধানী দৃষ্টিতে তাঁর কাজের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছে। ১৯৩৯ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রত্নবিদ স্যার লেনার্ড উলী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উপদেষ্টাস্বরূপ এদেশে আসেন। তিনি ভারতে অনুসৃত প্রত্নতত্ত্বের খনন ও সংরক্ষণ-নীতি সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, মার্শাল ও তাঁর অনুচরেরা পুরাতন সাবেকী পদ্ধতিতে খননকার্য চালিয়ে গেছেন—ইউরোপ ও আমেরিকায় যে উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল তার সঙ্গে এঁদের কোনই পরিচয় ছিল না। স্টাইন যদিও মার্শালের সুযোগ্য সহকর্মী—তবু তাঁর সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে এমন অভিযোগ আনা হয়নি। উলীর অনুগামী আধুনিক সমালোচকরা তাই ঘোর মার্শাল-বিরোধী হয়েও স্টাইনকে সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে বলে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, স্টাইন ভারত-বহির্ভূত অঞ্চলে খননকার্যের যে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মার্শাল তার আংশিক অনুকরণও করতে পারেননি।

মানুষ হিসাবে স্টাইন ছিলেন সদাহাস্যময়—শিশুর মত সরল, আত্মভোলা। তিনি বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে বিদ্যার অহমিকা কখনও প্রকট হয়ে ওঠেনি। কেবল পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গেই নয়—অত্যন্ত সাধারণ স্তরের মানুষের সঙ্গেও তিনি অল্পকালেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারতেন। এদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ এবং এদের কথাই তিনি তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে নানা স্থানে উল্লেখ করেছেন। অপদার্থ পাচক রমজান, পথপ্রদর্শক কুর্বান, উটচালক হাসান, সহচর লালসিং ও রামসিং—এদের সকলের প্রতিই তাঁর ছিল সমান দরদ, সমান ভালোবাসা। যে কোন অভিযানে তিনি স্বজাতীয় শ্বেতাঙ্গ অনুচর অপেক্ষা এই শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে নিতে বেশি পছন্দ করতেন। স্টাইন ছিলেন মূলত হাঙ্গেরীয়—এবং সেইজন্যই বোধহয় সে আমলের ইংরেজ

শাসকশ্রেণীর উন্নাসিক মনোভাব ও দম্ভ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁর দেহের গড়ন লম্বা-চওড়া ছিল না—কিন্তু তিনি অসাধারণ বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। হাজার-হাজার মাইল অতি দুর্গম পথ তিনি অক্লেশে হেঁটে পাড়ি দিতে পারতেন—দুর্ধর্ষ পার্বত্য-কুলিরাও তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠত না। পথের নেশা তাঁকে এমন পেয়ে বসেছিল যে, বেশিদিন তিনি এক জায়গায় বসে থাকতে পারতেন না। স্টাইন বিবাহ করেননি—ঘর-সংসার বলতে তাঁর কিছু ছিল না। তিনি ছিলেন চিরপ্রবাসী সেই আদর্শ ভবঘুরে, দেশে-দেশে যিনি নিজের ঘর খুঁজে বেড়াতেন এবং সব দেশকেই যাঁর সমান আপন বলে মনে হত। প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের ফাঁকে-ফাঁকে তাঁকে সাময়িকভাবে ডেরা বাঁধতে দেখা যেত কাশ্মীর উপত্যকায়, এগারো হাজার ফুট উর্ধ্বে 'মোহন মার্গে'—যেখানে হিন্দুকুশের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে আত্মনিবিষ্ট হয়ে তিনি তাঁর অভিযানের কাহিনী লিখে যেতেন। অশীতিপর বৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক জীবন-সায়াহ্নে এসেছিলেন কাবুল শহরে। ইচ্ছা ছিল বাল্‌খ্ অঞ্চলে খননকার্য চালাবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হল না। শীতের প্রারম্ভে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়। ১৯৪৩ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি পরলোক-গমন করেন। তিনি যে উইল রেখে গিয়েছিলেন তাতে দেখা গেল যে, তিনি তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় দান করে গেছেন। আইনজ্ঞরা কিন্তু তাঁর এই উইলটিকে সিদ্ধ করতে গিয়ে বিপদে পড়লেন। স্টাইন কোন্ দেশের আইনের আওতায় পড়বেন সেটি ঠিক করতে তাঁদের হিমসিম খেতে হল। কেন না, ইংরেজ নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও, তিনি যে হাঙ্গেরীয় নন—একথা কোনদিন কাগজে-পত্রে স্বীকার করে নেননি স্টাইন। এহেন বিশ্বনাগরিকের উইল—আইনগ্রাহ্য করা কি সহজ কথা!

প্রত্ন-গবেষণায় যাঁরা জীবন-উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে স্টাইনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মধ্য-এশিয়া অভিযানের নানা নিদর্শন আজ ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় শোভা পাচ্ছে। কেবল ইতিহাস বা পুরাতত্ত্ব নয়, স্টাইনের অভিযান নৃতত্ত্ব, ভূ-বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব-ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকেও সমৃদ্ধ করেছে এবং গবেষকদের সামনে নূতন-নূতন সম্ভাবনার দিক খুলে দিয়েছে। স্টাইনের উত্তর-সাধক অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত আজও মধ্য-এশিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একজন ভারতীয় পণ্ডিতও এপথে এগিয়ে আসেননি।

---

# সাহারার শিল্পতীর্থ তাসিলি

ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, আনুমানিক চার হাজার বছর পূর্বে সাহারা এখনকার মত এমন অন্তহীন বালির সমুদ্র ছিল না। বিস্তীর্ণ উষর এই মরু-অঞ্চলে একদা অনেক খরস্রোতা নদী প্রবাহিত হত এবং বছরের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হত বলে সাহারার মৃত্তিকা উর্বরা ও শস্যশ্যামলা হয়ে উঠেছিল। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে কালক্রমে এখানে বহু লোকালয় বা জনপদ গড়ে ওঠে—আজ তাদের একটিরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকে কয়েকজন ফরাসি পর্যটক সাহারা অভিমুখে অভিযান চালান এবং তাঁদের অনুসন্ধানের ফলে সাহারার অতি নিভৃত অঞ্চল, তাসিলি-এন্-আজ্জার-এর কাছে অসংখ্য প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁদের এই যুগান্তকারী আবিষ্কার আফ্রিকার প্রাগৈতিহাসিক যুগকে আরও কয়েক হাজার বছর পিছনে ঠেলে দিয়েছে। পণ্ডিতদের অনুমান মানব সভ্যতার আট হাজার বছর-ব্যাপী এক বিবর্তন-কাহিনী ধরা পড়েছে তাসিলি-চিত্রমালায়।

১৯৩৩-এ ফরাসি সামরিক বিভাগের অফিসার শার্ল ব্রেনান্ আলজিরিয়ার দক্ষিণে, সাহারার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন। নানা স্থানে ঘুরতে-ঘুরতে তিনি একদিন জনহীন পরিত্যক্ত অঞ্চল তাসিলির মালভূমির কাছে পৌঁছে যান। চারিদিকে বেলে পাথরের বিরাট স্তূপ। তারই একটির গভীর খাদের গায়ে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের বিরাট-বিরাট চিত্র অঙ্কিত আছে দেখতে পান। তিনি অনুমান করেন, এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহামানবদের আঁকা অমূল্য চিত্রসম্পদ। যে স্বল্প সময় তাঁর হাতে ছিল তারই মধ্যে কয়েকটি চিত্রের তিনি প্রতিলিপি এঁকে নেন। সে ছবি অবশ্য খুব নিখুঁত হল না, তবু সামান্য একটু নমুনা তিনি দেশবাসীকে দেখাতে পারবেন—এতেই তিনি খুশি রইলেন। ফ্রান্সে ফিরে যখন সকলকে এই শিল্পতীর্থের কথা জানালেন তখন অনেকেই বিশেষ উৎসাহিত হলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নামকরা চিত্রকর ও ইতিহাসবিদ এবং কিছু সাধারণ মানুষও। আঁরি লোতে শেষোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পড়েন। ভবঘুরে এই ফরাসি যুবক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শার্ল ব্রেনান-এর কাছে এসে গুহাচিত্রের প্রতিলিপিগুলি দেখেন এবং যাবার সময় বলে যান, তিনিও শীঘ্রই তাসিলি দর্শন করতে সাহারা অভিমুখে রওনা হবেন। বিচিত্র এঁর জীবন-কাহিনী। শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়ে অনাথ হন তিনি। স্কুল-কলেজে যাবার কোন সুযোগই ঘটেনি তাঁর জীবনে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন তিনি। দীর্ঘদিন পেট চালাবার মত নানা ধরনের কাজকর্ম করে অবশেষে ১৯ বছর বয়সে তিনি সামরিক বিভাগে চাকরি নিয়ে ফরাসি

উপনিবেশ আলজিয়ারস-এ এসে উপস্থিত হন। কিন্তু শান্তিতে বসবাস করা তাঁর কপালে লেখা নেই। একদিন এক দুর্ঘটনায় আহত হলে তাঁর একটি কান চিরবধির হয়ে যায়। কানের জন্য সামরিক কর্তব্য পালনে তিনি অসমর্থ, এই অজুহাতে চাকরি থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হল। আবার এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়ালেন লোতে। জীবনের ঘাটে-ঘাটে ভেসে বেড়ান ছাড়া এবার তাঁর আর অন্য গতি নেই। অথচ তরুণ যুবক স্বপ্ন দেখেন : ঈশ্বর তাঁর জন্য এক কঠিন দায়িত্ব নির্দিষ্ট রেখেছেন—বিধিনির্দিষ্ট এই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ছুটি নেই। লোতের উপরওয়ালা হোমরা-চোমরা সামরিক কর্তারা পছন্দ করেন তাঁকে। যুবকটি যেন অন্য ধাতুতে গড়া, সাধারণ সৈনিকের তুলনায় ভিন্ন জাতের। দয়াপরবশ হয়ে আবার তাঁকে চাকরিতে বহাল করেন তাঁরা। এবার অবশ্য অপেক্ষাকৃত হাল্কা ধরনের এক কাজে। সামরিক বিভাগ থেকে সাহারা অঞ্চলে এক অনুসন্ধানী দল পাঠানো হচ্ছে—এই দলের মধ্যে লোতের নামটি ঢুকিয়ে দেওয়া হল। কায়মনোবাক্যে লোতে এমন একটি কাজই চাচ্ছিলেন। কিন্তু বাধা পড়ল শেষ মুহূর্তে—হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে বাতিল হল এই সফর-সূচি। লোতে বড়কর্তাদের কাছে অনেক দরবার করলেন, অনেকবার হাঁটাহাঁটি করলেন তাঁদের দোরগোড়ায়—কিন্তু ফল হল না কিছুতে। সামবিক সিদ্ধান্ত একবার পাকাপাকি হয়ে গেলে তার আর নড়চড় নেই। কিন্তু ছেলেটির আগ্রহ দেখে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেন দক্ষিণ সাহারার সামরিক অধিকর্তা, বৃদ্ধ এক কর্নেল। যে ছেলে ঘরের আরাম চায় না, হোটেলেব ভাল খাদ্য-পানীয়, নৃত্য-গীত, সব ছেড়ে দুস্তর মরুভূমির পথে পা বাড়াতে চায়, তার অ্যাডভেনচারের স্পৃহা প্রশংসনীয়। পঙ্গপাল তাড়াবার কাজে ব্যয়িত হতে পারে এমন কিছু সরকারি অর্থ তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। এই অর্থের কিছু অংশ তিনি লোতেকে গ্রহণ করতে বললেন। বেশি খরচ-পত্রের মধ্যে না গিয়ে এই সামান্য টাকায় যদি সে মরুভূমির কিছুটা দেখে আসতে পারে, তাহলে তাঁর কোন আপত্তি নেই। গভীর কৃতজ্ঞতাব সঙ্গে লোতে সেই অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করলেন। সামান্য-কিছু রসদ ও প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস কিনে দু-একজন স্থানীয় পথপ্রদর্শক-সহ তিনি মরুভূমির অতি বিপজ্জনক পথে পা বাড়ালেন। তখন পর্যন্ত মরুভূমি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দূরে থাক—কোন কেতাবি জ্ঞানও তাঁর ছিল না। পরবর্তীকালে, মরুভূমিকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে, মরুভূমিকেই তাঁর ঘর-বাড়ি করে তুলেছিলেন লোতে। সাহারা মরুভূমিতে ৫০ হাজার মাইল ঘুরে বেড়িয়েছেন এমন রেকর্ড আর ক'জনের আছে? সাহারার প্রতিটি দুর্গম অঞ্চল তাঁর নখদর্পণে ছিল—এখানে বসবাসকারী যাযাবর শ্রেণীর লোকদের তিনি ভালোমতই চিনতেন, এবং তাদের ভাষায় কথাও বলতে পারতেন; ধূ-ধূ মরুভূমির মধ্যে কোথায় কি দর্শনীয় স্থান আছে তা তাঁর মত ভাল আর কেউ জানত কিনা সন্দেহ। প্রথম দর্শনে তাসিলিতে এসে প্রায় নিঃসঙ্গভাবেই এখানে ১৮ মাস অতিবাহিত করেন। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র অঞ্চলটি তন্ন-তন্ন করে তিনি খুঁজে

দেখেছিলেন। যে স্থানে তাসিলির চিত্রসম্ভার অবস্থিত তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন লোতে। বেলেপাথরের উন্নত এক মালভূমির এক পাশে গভীর খাদ। এই খাদের গায়েই প্রাগৈতিহাসিক চিত্রমালা শোভা পাচ্ছে—কোনটা পাথরে খোদাই করা, কোনটা রঙ ও তুলির সাহায্যে আঁকা। খাদের ভিতর কোন-কোন স্থান আবৃত হয়ে গুহার আকার ধারণ করেছে। সেখানেও অজস্র ছবি—দেয়ালের গায়ে, ছাদে, গুহার আনাচে-কানাচে—সর্বত্র। ছবির ভিড়ে দর্শকের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে যায়। খাদের ধারে বেলেপাথরের একাধিক স্তম্ভ সমস্ত জায়গাটিকে আরও রহস্যময় ও গুরুগম্ভীর করে তুলেছে। দেখে মনে হয়, কোন এক সুদূর অতীতে স্তম্ভগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল—কিন্তু মরুভূমির ঝড়ো হাওয়া ও তপ্ত বালু-কণার ঘর্ষণে সেগুলি ক্রমশই শীর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, কতকগুলি লম্বা পেরেক মাটি ফুঁড়ে সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে যেন। খাদের গভীরে কোন এক স্মরণাতীত কালে স্বচ্ছ জলধারা প্রবাহিত হত। জল এখন নিঃশেষিত, চারিপাশের শ্যামলিমা দগ্ধ ও ভস্মীভূত। কিন্তু সব নিঃশেষিত হলেও, খাদের গভীরে জলধারার গতিপথটি এখনও মুছে যায়নি। সরু আঁকাবাঁকা সেই আলো-আঁধারি পথে উপর থেকে সূর্যালোক পড়ে না বললেই চলে। তাসিলি আজ এক অভিশপ্ত নগরী—পরিত্যক্ত, শূন্য ও নিস্তব্ধ। মনে হয়, আঁকাবাঁকা এই নদীপথটিই সেই প্রেতপুরীর একমাত্র সদর-রাস্তা। পথিক যদি এই ভুতুড়ে পথে এগুতে চান তাহলে হয়ত কোনদিনই তাঁকে পথের শেষ দেখতে হবে না—গোলকধাঁধায় ঘুরেই প্রাণটা বেঘোরে যাবে। লোতে লিখেছেন, তাসিলির মত নির্জনতম স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। চারিদিকের উঁচু-নিচু পাথরের সারি, বালির সমুদ্র ও দগ্ধ প্রকৃতি, সব মিলিয়ে জায়গাটিকে এক রহস্যময় ভৌতিক জগতে পরিণত করেছে—যার বিরাট স্তব্ধতাকে চন্দ্রলোকের নিঃসীম শূন্যতার সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা চলে।

প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হল। পুনরায় এখানে ফিরবেন, এই প্রবল বাসনা নিয়ে ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করলেন আঁরি লোতে। তিনি এমন একটি অনুসন্ধানী দল গঠনের পরিকল্পনা নিলেন, যে দলে থাকবে বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞরা। এই দলে তাঁর নিজের কি ভূমিকা হবে তা তিনি ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। এতদিন লেখাপড়ার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। তাসিলির শিল্পসম্পদ সম্বন্ধে তাঁর যত উৎসাহই থাক না কেন, তাঁর এমন কোন জ্ঞান-বিদ্যা নেই যার জোরে তিনি গুহাচিত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটনে এগিয়ে আসতে পারেন। আরও পাঁচজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে তাঁকে নেহাৎ বেমানান দেখাবে—আড়ালে সঙ্গীরা তাঁকে হাতুড়ে বলে ঠাট্টা-তামাশা করবে। সময় থাকতে সাবধান হলেন লোতে—আরম্ভ করলেন এক কঠোর সাধনা। প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র, সাহারার ইতিহাস ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহ তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন। কয়েক বছর পরই সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় এক গবেষণাপত্র রচনা করলেন—যা পণ্ডিত সমাজে

উচ্চ-সমাদর লাভ করল। সরবোন্ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এই কাজের জন্য ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করল। বিদ্বৎসমাজে স্থায়ী আসন পেলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি জীবনে কোনদিন স্কুল-কলেজের মুখ দেখেননি। এমন অদ্ভুত ব্যাপার ফ্রান্সে কোনদিন ঘটেছে বলে কেউ শোনেনি। ফরাসি ভাষায় লিখিত লোতের একটি বই-এর সুখপাঠ্য ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে—যার নাম, 'দ্য সার্চ ফর দ্য তাসিলি ফ্রেসকোজ'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সারা ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। এই সময় আবার এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে লোতে হাসপাতালে শয্যা নিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনুসন্ধানের কাজ বন্ধ থাকল। পুরো দশ বছর কর্মবিরতির পর ১৯৫৬ সালে আঁরি লোতে তাসিলি-অভিযানের তোড়জোড় শুরু করলেন। প্যারিসের একটি প্রতিষ্ঠান 'মিউজিয়াম অব ম্যান' এই অভিযানের ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হল। বিখ্যাত ফরাসি প্রত্নবিদ আবে ব্রেউইল (প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলা সম্পর্কে যিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন) নানাভাবে এই অভিযানকে সাহায্য করেন। লোতের এই দলটিতে চারজন নামকরা ফরাসি চিত্রকর, একজন অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান ও একজন বিদুষী মহিলা যোগ দিয়েছিলেন। মহিলাটি সাহারা অঞ্চলের বার্বারি ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।

জ্যানেট বিমান-বন্দরে নেমে আট দিনের হাঁটা পথ। ত্রিশটি উটের পিঠে মালপত্র বোঝাই করে লোতের দলটি দুর্গম প্রস্তরাকীর্ণ মরুপথ ধরে এগিয়ে চলল। উঁচু খাড়াপথে উঠতে গিয়ে উটেরা ক্ষতবিক্ষত হল। মুহুর্মুহু আর্তনাদ করে তারা বারবার তাদের নালিশ জানিয়ে দিল। প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হয়ে লোতের সঙ্গীরা অর্ধমৃত অবস্থায় একদিন তাসিলিতে এসে পৌঁছলেন।

তাসিলির দেয়ালে এত বিচিত্র জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেখে লোতের সঙ্গীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। তাঁদের মনে হচ্ছিল, পাথরের উপর কারা যেন একটা গোটা চিড়িয়াখানাই এঁকে রেখেছে। সমস্যা হল, এত অসংখ্য চিত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহ করা যাবে কী উপায়ে? চিত্রগুলি কোনটাই সমতল জমির উপর আঁকা নয়। উঁচু-নিচু পাথরের দেয়ালে, গুহার ছাদে, আনাচে-কানাচে—সব জায়গাতেই অসংখ্য চিত্র আছে। সেখান থেকে তাদের কাগজে তুলে আনা সহজ কথা নয়। শিল্পীরা কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন। যেমন করে পারেন—শুয়ে পড়ে, হামা দিয়ে, হাঁটু-গেড়ে বসে, দাঁড়িয়ে নানা ভঙ্গিতে ছবির কপি করলেন তাঁরা। লম্বা-লম্বা কাগজ ভরে উঠল বিচিত্র সব রেখায়। গুহাচিত্রের আশ্চর্য সজীবতা মুগ্ধ করেছিল তাঁদের। এত হাজার-হাজার বছর কেটে গেছে—তবু চিত্রের একটি রেখাও অস্পষ্ট হয়নি। মুছে যায়নি একটি মূর্তিও। বলা বাহুল্য, মরুভূমির শুষ্ক জলবায়ু এদের সবরকম অবক্ষয় থেকে রক্ষা করেছে। লোতের সহযোগী শিল্পী-বন্ধুরা একটি বৃহৎ স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার

করেছিলেন। মরুভূমির শত অসুবিধা ও দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা। সাহারার জলবায়ুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সহজ কাজ নয়। মরুভূমির বুকে দিনের বেলা প্রচণ্ড বেগে ঝড় বয়ে চলে। সে হাওয়া এত উত্তপ্ত যে, গায়ে লাগলে ফোস্কা অনিবার্য। কখনো সেই ঝড়ো হাওয়ায় মিশে থাকে তপ্ত বালুকণা। ছুঁচের মত সেই বালুকণা গায়ে বিঁধতে থাকে। সূর্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গে ঝড় থেমে যায়। তখন তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নেমে যায়—গভীর রাত্রে তা একেবারে হিমাঙ্কে গিয়ে পৌঁছায়। অগ্নিবর্ষী দিন ও হিমশীতল রাত্রি—এই দুই বিপরীত কাঠিন্যে শরীরকে অভ্যস্ত করা খুবই কষ্টকর। তার উপর পানীয় জলের সমস্যা। তাসিলির কাছে-পিঠে যে সামান্য জল পাওয়া যায়—তা এতই দূষিত ও পুতিগন্ধময় যে, স্থানীয় তোয়ারেগ অধিবাসীরা তা অক্লেশে পান কবলেও, সভ্য জগতের কোন মানুষের পক্ষে তা আদৌ সম্ভব নয়। অবশ্য লোতে ও তাঁর সঙ্গীরা খাদ্য ও পানীয়ের ব্যাপারে ক্রমশই তাঁদের সংস্কার কাটিয়ে পুরোপুরি বুনো আদিবাসী হয়ে উঠেছিলেন। খাদ্যের অভাবে তাঁরা ফড়িং ও গিরগিটি পর্যন্ত খেয়ে দেখেছেন!

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে কাজ শেষ করে অভিযাত্রী দলটি দেশে ফিরল। লোতে মোট ৮০০টি চিত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহ করে এনেছিলেন—এর জন্য তাঁর দরকার হয়েছিল ১৬ হাজার বর্গফুট কাগজ। লুভর মিউজিয়ামের এক বিশেষ প্রদর্শনীতে তাসিলির চিত্রগুলি দেখাবার ব্যবস্থা হল। বিশেষজ্ঞরা কালানুক্রমিক চিত্রগুলি সাজিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁদের মতে, সবচেয়ে প্রাচীন যে চিত্রটি, তাতে একদল শিকারিকে বন্য জীবজন্তু শিকার করতে দেখা যাচ্ছে। নিগ্রয়েড জাতি-গোষ্ঠীর অন্তর্গত এই লোকগুলির মাথা শরীব অনুপাতে বেজায় বড়, অথচ হাঁত-পা কাঠির মত সরু-সরু। মনে হয়, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে তারা। এরা বর্শা বা ত্রিশূল হাতে রাইনো, হিপো, জিরাফ, হস্তী, হরিণ-প্রভৃতি শিকার করে। এছাড়া এমন কতগুলি জীবজন্তুকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে যারা অনেক যুগ আগেই পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত। প্রথম যুগের শিল্পীরা এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতও হতে পারেন। কেননা, তাঁরা দেবতা, অপদেবতার ছবিও অনেক এঁকেছেন। একটি গুহামুখে যে ১৯ ফুট দীর্ঘ মূর্তিটি আঁকা তা নিশ্চয়ই কোন দেবতার। তাঁর মুখাবয়ব কূর্মের, হাত-পা মানুষের এবং চোখ অস্বাভাবিকভাবে নাকের নিচে নেমে গেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, চিত্রটি বুঝি পিকাসোর হাতে আঁকা।

শিকারিদের যুগ শেষ হল এমন একদল লোকের আগমনে, যারা পশুচারণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এখন থেকে তাসিলির দেয়ালে গৃহপালিত পশু—গরু, ভেড়া, ছাগল-ইত্যাদির ছড়াছড়ি। বিবর্তনের এই দ্বিতীয় ধাপেই সাহারায় স্বর্ণযুগের সূচনা। মৃগয়ার বহু দৃশ্য এযুগেও আঁকা হয়েছে। একটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে, হস্তী-শাবক তার মায়ের আড়ালে লুকোতে চেষ্টা করছে—তার সামনেই আক্রমণোদ্যত এক চিতা-বাঘ।

শিল্পীরা এই যুগে মানুষ ও জন্তুর পূর্ণাবয়ব চিত্র অঙ্কন করেছেন—কোন-কোনটা এত বড় যে, বড় একটা দেয়ালই ভরে যায়। মানুষের চেহারায় একটু নতুনত্ব দেখা দিয়েছে। পূর্বে তার হাত-পাগুলি কাঠির মত সরু-সরু ছিল—এখন সে জায়গায় সুঠাম মাংসপেশী দেখা দিয়েছে। মানবদেহের অ্যানাটমি সম্পর্কে শিল্পী অনেক সচেতন হয়েছেন। মানবদেহ আর নিরাভরণ নয়, সেখানে শোভা পাচ্ছে নানাবিধ সুদৃশ্য অলঙ্কার। একস্থানে এক বলিষ্ঠ পুরুষকে মুখোশ পরে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। ঠিক এমন ধরনের মুখোশ আজও আইভরি কোস্টের কোন-কোন আদিম জাতির পুরুষেরা পরিধান করে থাকে। গ্রাম্যজীবনের সরল-স্বাভাবিক রূপটি ফুটে উঠেছে অনেক চিত্রে। কোথাও মেয়েরা গম ভাঙছে, বাচ্চাদের ঘুম পাড়াচ্ছে, অথবা বাড়ির ছাদ সারাচ্ছে—কোথাও বিয়ের ব্যাপার চলেছে, অতিথিরা দূরে বসেছেন ভোজ খেতে।

আনুমানিক ১০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে অশ্বের আগমন ঘটেছিল তাসিলি গ্রামে। অশ্বের আগমন-বিবর্তনের তৃতীয় ধাপে পৌঁছে দিল আমাদের। একদল দীর্ঘনাশা ও শক্তিশালী যোদ্ধা অশ্ব ও রথে সজ্জিত হয়ে তাসিলি আক্রমণ করে। এদের দেহের গঠন অনেকটা প্রাচীন মিশরীয়দের মত। নিগ্রয়েড জাতীয় লোকেরা এদের হাতে পরাজিত হয়ে পালাতে বাধ্য হয়। একটা গোটা দেয়ালে আঁকা আছে এই যুদ্ধের দৃশ্য। আক্রমণকারীরা কোথা থেকে এসেছিল, কী তাদের পরিচয়—কিছুই এখন জানবার উপায় নেই। মিশরের প্রাচীন পুঁথিতে এমন কথা আছে যে, ক্রীট দ্বীপ থেকে আগত এক সামুদ্রিক-জাতি মিশর আক্রমণ করে। মিশরবাসী সেই আক্রমণ প্রতিহত করে। আক্রমণকারীরা পরাজিত হয়ে লিবিয়ায় কিছুকাল বসবাস করে—তারপর তারা সাহারার দক্ষিণাঞ্চলে চলে যায়। এরাই হয়ত তাসিলি আক্রমণ করে থাকবে।

এক সময়ে তাসিলিতে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটল। বৃষ্টিপাত প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। তীব্র খরার মুখে পড়ল সমগ্র অঞ্চলটি। জলের অভাবে মানুষ, বন্যপ্রাণী ও গাছপালা কিছুই বাঁচল না। তাসিলি পরিত্যক্ত হল—ধীরে-ধীরে মরুভূমি সমগ্র অঞ্চলকে গ্রাস করে নিল। তাসিলির শেষ অধ্যায়ে, অশ্বের বদলে দেখা দিল উট। এই উটের আগমন জানাল, সাহারার প্রাগৈতিহাসিক যুগ শেষ হয়ে গেছে, আরম্ভ হয়েছে ঐতিহাসিক যুগ। যে যুগের প্রামাণিক চিত্র মিলবে গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকদের রচনায়। হেরোডোটাস সাহারাকে অনন্তপ্রসারী এক বালির সমুদ্ররূপে বর্ণনা করেছেন—যেখানে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত বালির ঢেউ নিরন্তর ওঠানামা করে। সাহারার এই রুদ্ররূপ কোন্ পথিকের মনে না ত্রাসের সঞ্চার করবে? স্পষ্টতই বোঝা যায়, হেরোডোটাসের আমলে (৫০০ খ্রিঃ পূঃ) সাহারার সজল-ঘন শ্যামল দিনের স্মৃতি মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল।

প্রাগৈতিহাসিক সাহারার এই গুহাচিত্রগুলি আমাদের মনে নানারূপ প্রশ্ন জাগিয়ে

তোলে অথচ সমাধান করে না কিছুরই। এই শতকের ঠিক মধ্যভাগে ফ্রান্সের ল্যাসকো ও স্পেনের অলটামিরাতে যে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে তাসিলি চিত্রমালার কোন সম্পর্ক স্থাপন করা চলে কি? মানচিত্রে ফ্রান্স থেকে সাহারা অভিমুখে যদি একটি সরলরেখা সোজাসুজি টানা যায়, তবে এই রেখার উপরই প্রায় সমদূরত্বে, এই প্রাচীন শিল্পতীর্থ তিনটি অবস্থিত দেখা যাবে। কিন্তু এই ভৌগোলিক সান্নিধ্য অন্য-কিছু প্রমাণ করে না। চিত্রগুলি সমপর্যায়ের নয়—তাই একই মানব-গোষ্ঠী তিন বিভিন্ন স্থানে তাদের শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছে—একথা জোর গলায় বলার উপায় নেই। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কী উদ্দেশ্যে সাহারার প্রাচীন শিল্পী এই চিত্রগুলি রচনা করেছেন? তাঁদের মূল প্রেরণা কি ম্যাজিক, না কোন ধর্মীয় রীতি? ম্যাজিক ও ধর্মকে বাদ দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলার কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। কিন্তু লোতে বলেছেন, নিছক সৃষ্টির আনন্দেই শিল্পীরা অনেক ছবি এঁকেছেন—এমন প্রমাণ তাঁর কাছে যথেষ্ট আছে। তাসিলিতে ধর্মীয় চিত্রকলার পাশেই এমন সব চিত্র বিরাজ করছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল মনোরঞ্জন করা—আনন্দ বিতরণ করা। তৃতীয় প্রশ্ন, তাসিলির অধিবাসীরা কি মিশরীয়দের কাছ থেকে শিল্পকর্মে প্রেরণা পেয়েছিল? তাসিলির দেয়ালে এমন-একটি ছবি আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, নৌকা চড়ে কয়েকজন শিকারী জলহস্তীর পিছনে ধাওয়া করেছেন। লোতে বলেন, প্রাচীন মিশরীয়রা ঠিক ঐ ধরনের নৌকা তৈরি করত। মিশরীয় প্রভাবের সপক্ষে আরও একটি প্রমাণ, তাসিলির বিখ্যাত চারকন্যার চিত্রটি। এঁরা চারজন দৈহিক লাবণ্যের অধিকারী, দেহের রেখায় যথেষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু এঁরা কেউ পুরোপুরি মানবী নন—এঁদের ঠোঁট ঠিক পাখির ঠোঁটের মত লম্বা ও চোখা। ঠিক এই ধরনের নারী-চিত্র মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের অনেক শবাধারের উপর অঙ্কিত হয়েছে দেখা যায়। এর থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, মিশরীয় সভ্যতা দক্ষিণ সাহারার এই পার্বত্য অঞ্চলের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই লোতে যখন বলেন, লিবিয়া অতিক্রম করে মিশরের সীমান্ত-সৈনিক তাসিলি অঞ্চলে খণ্ডযুদ্ধ চালিয়েছিল—তখন সে ঘটনা নিতান্ত অবিশ্বাস্য মনে হয় না। কিন্তু এমন অনুমানের সপক্ষে কোন পাথুরে প্রমাণ তিনি খুঁজে পাননি। তন্ন-তন্ন করে মরুপ্রান্তর খুঁজে তিনি শিলালিপি দূরে থাক, একটি নরকরোটিও উদ্ধার করতে পারেননি। যতক্ষণ না কোন পাথুরে প্রমাণ হাতে আসছে, ততক্ষণ তাসিলি চিত্রমালা সম্পর্কে শেষ কথা বলা আদৌ সম্ভব নয়।

---

# লাসকোর গুহাচিত্র

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক অতি সঙ্কটময় মুহূর্ত। ঝাঁকে-ঝাঁকে জার্মান বিমান ইংলন্ডের উপকূলবর্তী শহরগুলির উপর অবিরাম বোমা-বর্ষণ করে চলেছে। জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছে—আর কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া ধীরে-ধীরে কেন্ট-এর আকাশকে ছেয়ে ফেলছে। ডোভারের অপর পারে, সুদূর দক্ষিণে ভিসি-ফ্রান্সে তখন অন্য এক অবস্থা। প্যারিসের পতন হলেও, যুদ্ধের দাবানল দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়েনি। দক্ষিণের মেঘমুক্ত নির্মল নীলাকাশে তাই বোমারু-বিমানের তৎপরতা নেই। আকাশের অদৃশ্য কোণ থেকে হঠাৎ শত্রুবিমান এসে বিভীষিকার সৃষ্টি করবে এমন আশঙ্কা কারও মনে হানা দিচ্ছে না। সেপ্টেম্বর মাসের এমন এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে মঁতিগনাক শহবেব পাঁচটি তরুণ এক জায়গায় মিলিত হয়ে ভাবছিল, ছুটির দিনটি তারা কিভাবে কাটাবে। বয়স তাদের অষ্টাদশের মধ্যে। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, তারা শিকারের সন্ধানে শহরের কিছুদূরে পাহাড়ে-ঘেরা যে জঙ্গল আছে সেখানে যাবে। হাতে এক একটি এয়ারগান নিয়ে পাঁচ বন্ধু—রাভিদা, মারকাল, কেরয়-এসত্রেজিন্ ও কোয়েঁকা—পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। শেষের দুই বালক, জার্মান অধিকৃত অঞ্চল থেকে পালিয়ে দক্ষিণে আশ্রয় নিয়েছিল—সেই হিসাবে তারা দু'জন ছিল রেফুউজি। অপর তিনজন মঁতিগনাকের পুরানো অধিবাসী—যারা আশেপাশের রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা, চড়াই-উতরাই সবই ভালভাবে চিনত। পাঁচ বালকের সঙ্গে চলল তাদের পোষা কুকুর রোবট। শহর ছাড়িয়ে যে রাস্তা গাঁয়ের দিকে গেছে, সেটি ধরে এগুতে-এগুতে তারা জঙ্গলে ঘেরা এক অনুচ্চ পাহাড়ের কাছে এসে উপস্থিত হল। পাহাড়ের গায়ে ঢালু জমিতে আঙুরের চাষ হয়। আঙুরের ক্ষেতের পাশেই এক পোড়ো বাড়ি—যার নাম শাতো দ্য লাসকো। আসলে শাতো বলতে মধ্যযুগের যে দুর্গ বা প্রাসাদের কথা মনে করিয়ে দেয়, তার সঙ্গে লাসকোর এই ভগ্ন অট্টালিকার কোন সম্পর্কই ছিল না। এটি কোন ঐতিহাসিক প্রাসাদ নয়—মাত্র দুশো বছর আগে এক ধনাঢ্য ধর্মযাজক নিছক খামখেয়ালের বশে এটি তৈরি করতে শুরু করেন। তিনি অবশ্য নির্মাণ-কাজ শেষ করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর এই শাতো এক ভুতুড়ে পোড়ো বাড়িতে পরিণত হয়। এখান থেকে শুরু করে পাহাড়ের গা পর্যন্ত সব জায়গাটা অসমতল, এবড়ো-খেবড়ো—মধ্যে-মধ্যে বড় বার্চ, ফার ও ওক গাছ এবং খানিকটা নিচে গভীর খাদ। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে এখানে এক প্রচণ্ড ঝড়ে একটি প্রাচীন ওক গাছ উপড়ে যায়। গাছের বিরাট গুঁড়ি উৎপাটিত

হবার ফলে জমির উপর মস্ত ফাটল দেখা দিল। আশেপাশের কৃষকরা তাদের গরু-ছাগল-ভেড়ার পাল চরাতে নিয়ে আসত এই দিকে। তারা দেখল, এই বিরাট ফাটল তাদের জন্তু-জানোয়ারদের পক্ষে বিপজ্জনক—তাই তারা চেষ্টা করে দেখল, মাটি দিয়ে ফাটল ভরাট করা যায় কিনা। কিন্তু মাটি ঢেলেও তেমন সুফল পাওয়া গেল না। এক পশলা বৃষ্টির পর দেখা গেল, মাটি বসে গিয়ে আবার ফাটলের মুখ বেরিয়ে পড়েছে। শেষে তাবা নূতন উপায় বার করল—ফাটলের চারিধারে এক বেড়া তুলে দিল। কিন্তু তাতেও দুর্ঘটনা এড়ানো গেল না। বেড়া টপকে তাদের এক গাধা একবার গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং তাতেই তার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। এর পর থেকে ঐ বিপজ্জনক ফাটলের এক বিশ্রী নামকরণ হল—'গাধা ডোবা' বা 'ডানকিজ্ ডিপ'।

শিকারি পাঁচ-বন্ধু শাতো দ্য লাসকোর ভাঙা ইট-পাথরের স্তূপে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—এমন সময় দেখা গেল তাদের সঙ্গী রোবট কোথাও উধাও হয়েছে। অনেক ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ভয় হল, ছোট কুকুরটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে এবং আর উঠতে পারছে না। দলনেতা রাভিদা গর্তের ধারে গিয়ে রোবটের নাম ধরে অনেকক্ষণ ডাকল। পাহাড়ের এক পাশ থেকে সেই শব্দই আবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল। যে মুহূর্তে ছেলেরা ভাবছে এদিক থেকে সরে গিয়ে অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে, সেই মুহূর্তেই রোবটের ভয়ার্ত ক্রন্দন বাতাসে ভেসে এলো—মনে হল পাহাড়ের অনেক ভিতর থেকে সেই শব্দ উঠে এসেছে। কিন্তু ডাক শুনে কুকুরের অবস্থান জানতে পারলেও তখন-তখনই হাতেনাতে তাকে উদ্ধার করা সহজ হল না। গর্তে নেমে তারা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। সামনেই পাথরে আড়াল-করা বিরাট এক গুহামুখ। এমন আড়াআড়িভাবে সেই পাথর রাখা আছে যে, একটা ছোট কুকুর তার মধ্য দিয়ে ঢুকতে পারলেও বড়সড় মানুষের পক্ষে তা মোটেই সম্ভব নয়। রাভিদা একটা পাথর সেই গুহার মধ্যে গড়িয়ে ফেলে দিল। কান পেতে সকলে শুনল পাথরটা গড়াতে গড়াতে কিছু দূর গিয়ে ধপ করে নিচে কোথায় যেন পড়ে গেল। গুহামুখের পাথরটা অতি কষ্টে সামান্য সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার মত জায়গা করে নিল রাভিদা। তারপর হাতে একটা গাছের ডাল ও এক বাক্স দেশলাই-কাঠি সম্বল করে অতি দুর্গম বিপজ্জনক পথে পা বাড়াল। গুহাতে নেমে সে ধীরে-ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। দেশলাই-এর ক্ষীণ আলোকে রাভিদা দেখল, তাদের কুকুর ভয়ে আধমরা হয়ে এক পাশে বসে থর-থর করে কাঁপছে। সুখের বিষয়, তার হাড়-পাঁজর ভাঙেনি বা গায়ে কোন আঘাতও লাগেনি। হয়তো খরগোশের পিছনে ছুটতে-ছুটতে রোবট এই গুহার মধ্যে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। রোবট নিরাপদে আছে দেখে রাভিদার সাহস বেড়ে গেল। সে ভাবল, একটু এগিয়ে গিয়ে গুহাটিকে ভাল করে দেখে নিলে মন্দ কি? বন্ধুদেরও সে ডাক দিল। বন্ধুরা খুব খুশি—ছুটির দিনে এমন অ্যাডভেঞ্চারই তো তারা চাইছিল।

ছেলেগুলি হুড়মুড় করে গুহার মধ্যে নেমে পড়ল। ৬০´ × ৩০´ হলঘরের মত প্রশস্ত সেই গুহা। মাথার ওপর ঢেউ খেলানো অসমান ছাদ। দেশলাই-এর আলোতে চারিধার দেখতে-দেখতে হঠাৎ রাভিদা চেঁচিয়ে ওঠে—'দেখ, দেখ কি সব অদ্ভুত জিনিস—এখানে'। বন্ধুরা ছুটে এসে দেখে দেয়াল ভর্তি অদ্ভুত সব জীবজন্তুর ছবি। কোনটা ছুটছে, লাফাচ্ছে, তেড়ে আসছে বা নিছক শিঙ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড লম্বা ষাঁড়, লোমশ বাইসন, অতিকায় হরিণ—আবার তারই পাশে ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়া। পাঁচ বন্ধু অতিমাত্রায় বিস্মিত হল। তারা যেন ভূগর্ভস্থ কোন আর্ট গ্যালারিতে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ছবিগুলি কি বিচিত্র—এমন ছবি তো সভ্যজগতের চিত্রশালায় দেখা যায় না। কোন-কোন ছবি রেখাচিত্র মাত্র—কোন-কোনটিতে আবার কালো, লাল বা পাটকিলে রঙের ব্যবহার হয়েছে। দেয়ালের গায়ে চুনে-পাথরের স্ট্যালাগমাইট আস্তরণ পড়ে অনেক সময় ছবিগুলিকে অস্বাভাবিক চকচকে করে তুলেছে। দেখার জিনিস শেষ হবার নয়—অথচ সম্বল তো মাত্র এক বাক্স দেশলাই। শেষ কাঠিটি খরচ করে পাঁচ বন্ধু যখন হাতড়াতে-হাতড়াতে গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো—তখন সূর্য মধ্যগগনে। বাইরে এসে স্বপ্নের ঘোর কাটল—এতক্ষণ তারা যেন এক রহস্যময় অদৃশ্য জগতে নির্বাসিত হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে কারও কোন জ্ঞান না থাকলেও ছেলেরা ঠিকই অনুমান করেছিল যে, গুহাচিত্রগুলি খুবই প্রাচীন। তারা জানত, গুহার আবিষ্কারের কাহিনী বেশি জানাজানি হলে গুহার উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব খাটবে না। বিরাট হোমরাচোমরা পণ্ডিত ব্যক্তিরা শহরে এসে জাঁকিয়ে বসবেন—এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গুহায় যাতায়াত সর্বসাধারণের নিষিদ্ধ হয়ে যাবে—অন্তত কিছু কালের জন্য। তাই তারা আবিষ্কারের কাহিনী গোপন রাখল—এমন কি বাড়িতেও কাউকে জানাল না। পরবর্তী ৫।৬ দিন তারা অনেকবার গুহায় যাতায়াত করল—প্রত্যেকের হাতে ছিল শক্তিশালী টর্চ। তারা যতদূর পারল গুহাটিকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখল। গুহার প্রধান কক্ষটি পার হলে সামনাসামনি একটি করিডর। প্ল্যানটা অনেকটা ইংরেজি T অক্ষরের মত। ডানদিকের বারান্দা পার হলেই আবার এক ৩০ ফুটের মত গর্ত। এই গর্তের পরেই আর এক কক্ষ—যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ক্রিপট' বা ভূগর্ভস্থ গুপ্ত কক্ষ।

কয়েকজন কোমলমতি বালকের পক্ষে বেশিদিন আর গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হল না। সাতদিন পরে তারা বুঝল, এই গুহার রহস্য জানতে হলে কোন পণ্ডিত ব্যক্তির সাহায্য নিতেই হবে। তাদের আবিষ্কারের গুরুত্ব কেউ কোন দিন যদি জানতেই না পারল, তাহলে তাদের সবই পণ্ডশ্রম হবে। অতএব তারা স্থির করল, স্থানীয় স্কুলশিক্ষক লেয়' লাভাল-কে তারা সব কথা খুলে বলবে। কিন্তু তাতেও বিপদ কম হল না। মাস্টারমশাই তো বিশ্বাসই করতে চান না, ছেলেদের কথা। ভাবলেন, কোন মতলববাজ লোক এদের ছেলেমানুষির সুযোগ নিয়ে বোকা বানাচ্ছে এদের। ছেলেদের দ্বারা মহৎ

কোন আবিষ্কার সম্ভব হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছিল না। অবশ্য বিরাট বপু নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে তিনি যেদিন সরেজমিন তদন্তে গুহায় এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর প্রত্যয় হল, ছেলেরা আবোল-তাবোল কিছু বকছে না। তারপর টর্চের আলো দেয়ালগাত্রে পড়ামাত্র তাঁর সব সন্দেহ দূর হল। তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন, মঁতিগনাকের দামাল ছেলেগুলি নিশ্চয়ই কোন প্রাগৈতিহাসিক চিত্রশালার দ্বার উম্মোচন করেছে।

মঃ লাভাল পণ্ডিত ব্যক্তি, তবে এতদূর পণ্ডিত নন যে, কারও সাহায্য ছাড়াই লাসকো গুহার রহস্য বলে দিতে পারবেন। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি শহরে প্রত্যাগমন করে বিখ্যাত ফরাসি প্রত্নবিদ আবে ব্রেউইলকে এক জরুরি বার্তা পাঠালেন। ব্রেউইল ফ্রান্সের একজন সেরা প্রত্নবিদ্ই কেবল নন, ইউরোপের যে মুষ্টিমেয় ক'জন পণ্ডিত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজখবর রাখেন তিনি তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বার্তা পেয়ে ব্রেউইল অনতিবিলম্বে মঁতিগনাকে পৌঁছে গেলেন। তিনি স্বচক্ষে সব দেখেশুনে এই মত প্রকাশ করলেন যে, লাসকোর গুহাচিত্র এ যুগের এক মহৎ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। এই গুহা স্পেনের অলটামিরা গুহার সমগোত্রীয় এবং এখানে এমন সব ছবি আছে, যেগুলি মানব সভ্যতার উষা-লগ্নে অঙ্কিত হয়েছিল। এই আবিষ্কারের কাহিনী অতি অল্প সময়ে ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। দলে-দলে শৌখিন পর্যটক প্রাগৈতিহাসিক চিত্রাবলী দেখবার বাসনায় মঁতিগনাক শহরে এসে উপস্থিত হলেন। ব্যবসায়ীরা বেশ ফলাও ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। কাফেটরিয়া, কিউরিও-শপ, থিয়েটার-সিমেনায় ভরে গেল ছোট শহরটি। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এত তাড়াতাড়ি গুহাটিকে পর্যটকদের জন্য খুলে দিতে রাজি ছিলেন না। তাদের তখনও অনেক কাজ বাকি। প্রতিটি ছবির পুঙ্খানুপুঙ্খ ফটোগ্রাফ নিলেন তাঁরা। ছবিগুলিকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দেখা হল, ছবির নিচেই অন্য কোন ছবি পাওয়া যায় কিনা। অনেক সময় দেখা যায়, একটা পুরাতন ছবির উপরেই অপেক্ষাকৃত নবীন কোন চিত্রকর তার নকশা এঁকে রেখেছেন। ছবির পরম্পরা নির্ণয় এক অতি কঠিন কাজ। একাজ করা সহজ হল না। ছবিগুলি একই সঙ্গে কোন একদিন আঁকা হয়নি। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিল্পী দেয়াল-গাত্রে তাঁদের ছবি সংযোজিত করেছেন। সম্ভবত ১৩ হাজার বছর ধরে তাঁদের এই শিল্পপ্রচেষ্টা চলে—তারপর কোন এক অজ্ঞাত কারণে সৃষ্টির ধারা আপনি রুদ্ধ হয়ে আসে। ২৫ থেকে ৩০ হাজার বছর পূর্বে এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন। তবে এ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদের আশঙ্কা আছে। লাসকোতে যেসব পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞরা কাজ করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের সুবিধার জন্য গুহাতে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করলেন। আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে লাসকোর চেহারাই গেল পালটে। যে প্রাচীন চিত্রকররা এগুলি এঁকেছিলেন, আলোর অভাবে তাদের কম কষ্ট হয়নি—কিন্তু এ যুগের দর্শকরা আলোর প্রাচুর্যে বেশ স্বচ্ছন্দেই চিত্রগুলি দেখলেন এবং গুণাগুণও বিচার করতে পারলেন। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে যে, দিনের

আলো যেখানে পৌঁছায় না সেখানে চিত্রকররা এসব ছবি আঁকলেন কেন এবং কি তাদের উদ্দেশ্য ছিল? পণ্ডিতরা বলেন, নিছক খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্যই শিল্পীরা এগুলি আঁকেননি—তাঁরা এঁকেছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই। গুহার মধ্যে অঙ্কিত হবার ফলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অনন্য শিল্পকীর্তিগুলি রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, ঝঞ্ঝা ও তুষারপাত থেকে সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়েছে। লাসকোর গুহায় একদা বহু আদিম মানুষ মিলিত হয়ে ধর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত। তাদের সমাজে, ধর্ম ও ম্যাজিকে তখন বিশেষ প্রভেদ ছিল না। মানুষ যখন নিজ কৌশলে প্রকৃতিকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেয় সেটা হল ম্যাজিক। আর মানুষ যখন প্রকৃতির নিকট প্রার্থনা করে নিজের কাজ করিয়ে নেয় সেটা হল ধর্ম। লাসকো গুহার কোন দেবদেবীর নাম না জানলেও আমরা জানি, ধর্ম ও ম্যাজিকের চর্চা হত এই গুহায়। আমাদের দেশে বড় বড় মন্দিরগুলির সম্মুখে থাকে প্রশস্ত চত্বর। সেখানে মানুষ বসে, বিশ্রাম করে। ঠাকুর থাকেন মন্দিরের ভিতরে গর্ভগৃহে। লাসকোর গুহাতেও ছিল অনুরূপ ব্যবস্থা। প্রথম দিকের যে প্রশস্ত কক্ষ সেখানে হয়ত মানুষ বসবাস করত সংঘবদ্ধভাবে। গুহার ভিতরের অংশটি ছিল পূজার্চনার জন্য সংরক্ষিত। লাসকো বা অলটামিরাতে যে সব চিত্র পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই হল শিকারের ছবি। বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা এবং খাদ্য সমস্যার সমাধান—এই উভয় কারণে আদিম মানুষ শিকারে মন দিয়েছিল। তারা বনদেবীর পুজো করত ঐ গুহার মধ্যে। বনদেবীকে তুষ্ট করতে পারলে শিকারে সাফল্য অনিবার্য। নিজেদের মনের কামনা তারা ছবিতে ব্যক্ত করেছিল।

লাসকোর চিত্রকররা কেউ আনাড়ি ছিল না। ছবির পারস্পেকটিভ কি হওয়া উচিত তারা জানত—সেই সঙ্গে আরও জানত, কাকে বলে ছবির ডেপথ, কাকে বলে কম্পোজিশন। দেয়ালের গায়ে ছবি আছে অনেক প্রকারের। দলবদ্ধভাবে বড় শিঙওয়ালা একদল হরিণ ছুটে যাচ্ছে, মানুষ তাদের তাড়া করছে—কোথাও বাইসনের তাড়া খেয়ে মানুষই প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। দু-এক জায়গায় তীরবিদ্ধ বন্যপ্রাণীকে দেখানো হয়েছে। একটা দৃশ্যে সুন্দর এক কালো গরু দেখা যাচ্ছে, সেটি লাফাতে লাফাতে 'গেটের' দিকে এগোচ্ছে। অবশ্য 'গেট' কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে—কেউ কেউ বলেন, ওটা আসলে ফাঁদ। সব থেকে প্রাচীন যে চিত্রটি আঁকা হয়েছিল তা হচ্ছে কোন এক শিশুর হাত। ছোট শিশুর হাত দেয়ালে চেপে রেখে বাইরে থেকে লাল রঙ ছড়িয়ে দেওয়া হয়—তারপর হাত সরিয়ে নিলে দেয়ালে পাঞ্জার ছাপটি সুস্পষ্ট থেকে যায়। গুহার সর্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান হল—ক্রিপ্ট্। সেখানে একটি মাত্র ছবি আছে যার নাম দেওয়া হয়েছে—প্রাগৈতিহাসিক ট্রাজেডি। এক শিকারি বিরাট এক বাইসনকে বর্শা ছুঁড়ে মেরেছে। আহত অবস্থায় বাইসন ছুটে এসে শিকারিকে গুঁতিয়ে দিয়েছে এমনভাবে যে তার আর বাঁচার আশা নেই। আমরা যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর শিকারির গোঁঙানি শুনতে পাচ্ছি। আবে

ব্রেউইল বলেন, ছবিটি কাল্পনিক নয়। শিকারীর মৃত্যু হলে তাকে ক্রিপটেই সমাহিত করা হয়—এবং তার স্মৃতিরক্ষার্থে শিল্পী দেয়ালের গায়ে ঐ ছবি এঁকে রাখে।

পাঁচজন ভবঘুরে ছেলের অ্যাডভেঞ্চার শেষ পর্যন্ত এ যুগের এক অবিস্মরণীয় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারকে সম্ভব করেছিল। তাদের জন্যই আজ লাসকো ভুবনবিখ্যাত টুরিস্ট আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর দক্ষিণ ফ্রান্সের এই ছোট শহরে দলে-দলে লোক আসে গুহাচিত্রগুলি দেখতে। যদি এই পাঁচটি ছেলেকে ফরাসি সরকার সাহস ও উদ্যমের জন্য পুরস্কৃত করতেন তাহলে আমরা সুখী হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের কথা এক সময়ে সকলেই ভুলে গেল। যাদের জন্য লাসকোর এত নামডাক তাদের প্রতি কেউ আর কোন বদন্যতা দেখাল না। বড় দুই ছেলে রাভিদা ও মারকালকে লাসকোর গাইড হিসাবে চাকরি দেওয়া হল বটে—কিন্তু অপর তিনজনের কি হল কেউ জানে না। ছেলেদের কৃতিত্বের তুলনায়, তাদের এই পুরস্কার অকিঞ্চিৎকর নয় কি?

---

# অলটামিরার গুহাচিত্র

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এক আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে উত্তর-স্পেনের সান্তাদার প্রদেশের এক নির্জন গিরিগুহায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের অমূল্য চিত্রমালার সন্ধান পাওয়া গেল। ছোট স্টেশন সান্তিলানা-দেল-মার থেকে মাত্র দু'কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত এই গুহা। স্থানীয় লোকরা নামকরণ করেছিল 'অলটামিরা'। স্পেনিশ ভাষায় যার অর্থ হল—উঁচুতে যা অবস্থান করছে। পিরানীজ্ পাহাড় ঢালু হয়ে যেখানে বিস্কে উপসাগরের কূলে নেমে এসেছে, সেখান ধূসর পাহাড় ও নীল সমুদ্রের মাঝামাঝি স্থানে চুনা পাথরের এক অনুচ্চ পাহাড়—তারই নিভৃত এক প্রকোষ্ঠে প্রস্তরযুগের মানুষ রেখে গেছে তার শিল্পকর্মের নিদর্শন। পর্যটন বিভাগের ভাষায় অলটামিরাকে ভূস্বর্গ বলে বর্ণনা করা চলে। এখানকার দৃশ্য অতি মনোরম। প্রশস্ত বালুতট অর্ধ বৃত্তাকারে ঘুরে দূরের পাহাড়ে মিশেছে। রৌদ্রোজ্জ্বল সুনীল আকাশ, সমুদ্রসৈকতের শুভ্র বালুকা-রাশি, পাহাড়ের সানুদেশে হরিৎ শস্যক্ষেত্র—সব মিলিয়ে মনে হবে, প্রকৃতিদেবী বুঝি স্বহস্তে আদি মানবের এই আর্ট গ্যালারির পটভূমিকা রচনা করে রেখেছিলেন। ঐতিহাসিক বলেন, সুদূর অতীতেও এখানকার জলবায়ু ছিল মৃদু ও সুখকর। শিকার মিলত জঙ্গলে, সমুদ্রে ছিল মাছ, সমতল জমির গাছপালাতে ফলত অজস্র ফলপাকুড়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের পক্ষে এর চেয়ে সুখের স্থান আর কি হতে পারে? বর্তমান যুগে এখানকার অধিবাসীদের বাস্ক নামে অভিহিত করা হয়। তারা সাহসী, স্বাধীনচেতা ও কর্মঠ। চারিত্রিক এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধানত জলবায়ুরই দান। বাস্ক জাতীয় লোকদের উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, এরা উত্তর-আফ্রিকার বারবার জাতির আত্মীয়—আবার কারও কারও মতে, এরা ছিল প্লেটো-বর্ণিত সেই কাল্পনিক দ্বীপ—অ্যাটলান্টিস-এর অধিবাসী, যে দ্বীপটি ভূকম্পন ও প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ফলে একদিনেই সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যায় এবং আজ পর্যন্ত যার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সান্তাদার প্রদেশের এক পথভ্রষ্ট শিকারি প্রথম এই গুহায় পদার্পণ করেন। পাথর সরিয়ে তিনি যখন পাহাড় থেকে দ্রুত নামছেন তখন একস্থানে খানিকটা মাটি ধসে যায় এবং তার ফলে একটি গুহামুখ বেরিয়ে পড়ে। কৌতূহলবশত তিনি গুহাতে প্রবেশ করেন এবং কিছুদূরে যেতেই দেখেন, গুহার দেয়ালে নানা ধরনের চিত্র আঁকা আছে। তিনি ইতিহাস ও প্রত্ন-বিষয়ে তেমন আগ্রহী না হয়েও বুঝেছিলেন, হয়তো বহু যুগ পূর্বে মানব-জাতির আদি পুরুষেরা এসব চিত্র এঁকে গেছেন। শহরে ফিরে সেদিন সন্ধ্যায় তিনি বন্ধু-বান্ধবদের গল্প করে শোনান এই অ্যাডভেঞ্চারের কথা। দুঃখের বিষয়,

বন্ধুরা কেউ তেমন উৎসাহিত হল না—এবং শিকারিটি গুহা সম্পর্কে আর কোন খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। প্রায় দশ বছর বাদে আবার এক ব্যক্তি অলটামিরা গুহায় আগমন করেন। ইনি স্থানীয় জমিদার ডন মার্সিলেনো দ্য সাওতুলা। সেকালের অনেক ধনী ব্যক্তির মত তাঁর ছিল পুরাতত্ত্বের নেশা। ১৮৭৮ সালে ফরাসি সরকার প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন—তাতে সাম্প্রতিক কালে ফ্রান্সে যে সব বিখ্যাত পুরাতত্ত্বের নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছিল, তার মধ্যেই ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে দর্দইনির গুহায় প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনগুলি দেখে সাওতুলা বিস্ময়ে অভিভূত হন। সুদূর অতীতে মানবগোষ্ঠীর হাতের তৈরি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও তাদের আঁকা চিত্রাবলী তাঁকে চমৎকৃত করেছিল। এই প্রদর্শনী থেকে অনেক উৎসাহ-অনুপ্রেরণা নিয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের নানা পরিকল্পনায় তাঁর মন তখন ভরপুর। এতদিন তিনি খেয়াল-খুশি মত অবসর সময়ে প্রত্নতত্ত্বের চর্চা করতেন—এবার ফ্রান্স থেকে ফিরে আসা অবধি প্রত্নানুসন্ধানই তাঁর সর্বক্ষণের নেশা হয়ে দাঁড়াল। গ্রাম্য জমিদারের নিশ্চিত আয়েসী জীবন পরিত্যাগ করে তিনি যখনই সুবিধা পেতেন তখনই বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন। তার মনে এক ক্ষীণ আশা জেগেছিল, স্পেনের সান্তাদার প্রদেশে তিনি হয়তো ফ্রান্সের দর্দইনির অনুরূপ কোন প্রাগৈতিহাসিক গুহার সন্ধান পেয়ে যাবেন—যার আবিষ্কারে প্রত্নতত্ত্বের এক নবদিগন্ত উদঘাটিত হবে। ১৮৭৫ সালে তিনি প্রথমবার যান অলটামিরাতে, তখন খুব নিবিষ্ট-চিত্তে সবকিছু ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেননি। চার বছর বাদে তিনি যখন আবার এখানে আসেন তখন তিনি স্থির করে এসেছিলেন যে, এবার প্রত্নতাত্ত্বিকের সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে সব-কিছু যাচাই করে দেখতে হবে। তাঁর এই অনুসন্ধান-কাজে তাঁর সঙ্গী হলেন মাদ্রিদ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক তাঁরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রতিদিন তাঁরা অলটামিরা গুহাতে এসে কিছু সময় অতিবাহিত করতেন। একদিন সাওতুলার ছোট মেয়ে, মারিয়া ছিল তাঁদের সঙ্গী। পিতা যখন বন্ধুর সঙ্গে গুহাটির বয়স সম্পর্কে ভূতাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যস্ত, তখন মেয়েটি একা গুহার অনেকটা ভিতরে ঢুকে পড়ে। হঠাৎ সাওতুলা শুনলেন, মেয়েটির আর্তস্বর—সে ভীত হয়ে চিৎকার করছে, টোরাস টোরাস। অর্থাৎ ষাঁড়, ষাঁড়। সাওতুলা ছুটে এসে দেখেন, ছোট মেয়েটি গুহার ছাদের দিকে চোখ রেখে ভীতসন্ত্রস্তভাবে গুহার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। ছাদের সিলিং-এ আঁকা ভীষণাকার শিঙ-বাগানো এক জন্তুর ছবি। বুল-ফাইটিং দেখা যে মেয়ের অভ্যাস আছে, তার কাছে শিঙ বাগিয়ে তেড়ে আসা ষাঁড় নিশ্চয়ই এক আতঙ্কের বস্তু। চিত্রগুলি এত জীবন্ত যে মনে হয়, এখনই বুঝি জন্তুগুলি তেড়ে এসে গুঁতিয়ে দেবে। পরের বছর এই চিত্রশালা আবিষ্কার সম্পর্কে সাওতুলা অনেক খোঁজখবর দিলেন তাঁর স্বরচিত পুস্তিকায়। তিনি অবশ্য বলেন যে, ছোট মেয়ে মারিয়া যাকে ষাঁড় বলে মনে

করেছিল আসলে সেটি বাইসন—যা এক সময়ে উত্তর স্পেনের জলাভূমিতে প্রচুর পাওয়া যেত। বাইসন ছাড়াও এই অঞ্চলে পাওয়া যেত হরিণ ও বন্যবরাহ—এইসব বন্যজন্তু শিকার করেই আদিম যুগের মানুষ তার ক্ষুধা মেটাত।

অলটামিরার আবিষ্কার কিন্তু সে যুগে পণ্ডিত-মহলে তেমন সাড়া জাগাল না। মুক্তকণ্ঠে সাওতুলাকে সাধুবাদ জানানো দূরে থাক, চিত্রগুলি সত্যি খুব প্রাচীন কিনা সে সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। কেউ-কেউ বললেন, রোমান আমলে ক্যান্টাব্রিয়ান যুদ্ধের সময় (২৬-১৯ খ্রিঃ পূঃ) এখানে রোমান সৈনিকদের ছাউনি পড়েছিল—সেই সময় সৈনিকদের মধ্যে কেউ হয়ত এই ছবিগুলি এঁকে থাকবে। আবার এমন কথাও সমালোচকরা বলে বসলেন, ঐতিহাসিকদের মনে ধোঁকা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই কোন রসিক আর্ট-ছাত্রই বোধহয় এসব ছবি গুহাগাত্রে এঁকে রেখেছে! অবশ্য অলটামিরাকে ছোট করে দেখানোর পিছনে এক ধরনের মনোভাব কাজ করছিল। ফরাসি পণ্ডিতদের নিন্দা আছে, তাঁরা চিরকালই সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, খুঁত-খুঁতে ও উন্নাসিক; মন খুলে তাঁরা ভাল জিনিসকে ভাল বলতে পারেন না। তাঁদের দেশ ফ্রান্সে যে প্রত্নসম্পদ আছে তার চেয়েও প্রাচীন প্রত্নবস্তু ইটালি অথবা স্পেনে কোথাও পাওয়া যাবে—একথা সহজে তাঁরা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। অলটামিরার আবিষ্কারকে তাঁরা এমন এক স্পেনিশ চক্রান্ত বলে বর্ণনা করলেন, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ফ্রান্সের দর্দইনির মাহাত্ম্যকে খর্ব করা। অলটামিরাকে কেন্দ্র করে যখন পণ্ডিতদের মধ্যে তর্কবিতর্কের ঝড় উঠছে, ঠিক সেই সময় ডন সাওতুলা মারা গেলেন এবং তাঁর বন্ধু মাদ্রিদের সেই ভূ-বিজ্ঞানী, তিনিও গত হলেন দু'বছর না যেতেই। কাজেই অলটামিরার পক্ষ নিয়ে লড়াই করে তাকে স্বীকৃতি এনে দিতে পারে এমন কেউ আর অবশিষ্ট রইলেন না। অলটামিরার কথাও লোক ভুলতে বসল।

১৮৯৫ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে দক্ষিণ ফ্রান্সের একাধিক স্থানে প্রাগৈতিহাসিক গুহার সন্ধান পাওয়া গেল। দক্ষিণ ফ্রান্সের মারসুলার গুহায় বাইসনের কয়েকটি চিত্র ছিল। পণ্ডিতরা বললেন, এগুলির সঙ্গে অলটামিরায় প্রাপ্ত বাইসনের হুবহু মিল আছে। ফরাসি প্রত্নবিদ ও গুহাচিত্র-বিশারদ আবে ব্রেউইল আরও কয়েকজন পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে 'অলটামিরা' পরিদর্শনে আসেন। তাঁরা চিত্রগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে রায় দেন যে, অলটামিরার চিত্রগুলি যে জাল বা ভুয়াবস্তু একথা আদৌ ঠিক নয়—আসলে এগুলি খুবই প্রাচীন এবং এতদিন একথা স্বীকার না করে গুহাচিত্রগুলি সম্পর্কে ঘোর অবিচার করা হয়েছে। আবে ব্রেউইল লিখিত অলটামিরা সম্পর্কে পুস্তক ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। স্পেনের এই প্রাগৈতিহাসিক গুহাটি সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেন তিনি। আবে ব্রেউইল-লিখিত বিবরণ পড়ে অলটামিরার চিত্রগুলি সম্পর্কে সবিশেষ জানা যায়।

গুহাটি প্রায় ২৭০ মিটার লম্বা। গুহাচিত্রই এখানকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার নয়। এখানে খননকার্য চালিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ব্যবহার্য নানা হাতিয়ার পাওয়া গেছে। তাছাড়া জন্তু-জানোয়ারের অস্থির উপর কারুকার্য করা নানা শিল্প-নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। গুহাটি আদিম যুগে মানুষের চিত্রশালা ছিল। এখানকার দেয়ালগাত্রে আছে অসংখ্য বাইসনের ছবি—কতকগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, কতকগুলি আবার শিঙ উঁচু করে আসছে তেড়ে। বাইসন ছাড়া হরিণ, বুনোশুয়োর, কয়েকটি শক্তিশালী অশ্ব, গৃহপালিত গরু ও ছাগলও চোখে পড়ে। মাটি থেকে প্রস্তুত করা তিনটি রং—লাল, কালো ও বেগুনি, প্রাগৈতিহাসিক শিল্পী তার ছবিতে প্রধানত ব্যবহার করেছে। দেয়ালের গায়ে কালো কালিতে আঁকা ষাঁড়ের একটি মাথা আছে—ভঙ্গিটি তার অনবদ্য। গুহার ভিতর ভিজে স্যাতসেঁতে হওয়ায়, ছবিগুলি খুব তাজা থেকে গেছে—টর্চের আলো পড়লে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ও চিকচিক করে। প্রত্নতাত্ত্বিক বলেন, চিত্রগুলি কোন এক বিশেষ দিনক্ষণে অঙ্কিত হয়নি—দীর্ঘ সময় নিয়ে, যুগ যুগ ধরে চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছে। সম্ভবত তিন হাজার থেকে এক হাজার খ্রিঃ পূঃ—এই সময়ের মধ্যে এগুলি আঁকা হয়েছিল। শিল্পীরা সকলেই যে আদি প্রস্তরযুগের শিকারি ছিলেন, সেকথা সহজেই অনুমান করা চলে। দিনের আলো যেখানে পৌঁছায় না সেখানে চিত্রকররা এসব ছবি আঁকলেন কেন? তাঁরা কি নিছক খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্যই এগুলি এঁকেছিলেন—না এগুলি আঁকার মধ্যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? গুহার মধ্যে অঙ্কিত হবার ফলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অনন্য শিল্পকর্মগুলি রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও তুষারপাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। অলটামিরার গুহায় একদা বহু আদিম মানুষ মিলিত হয়ে ধর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত।

অলটামিরার গুহায় প্রাপ্ত প্রস্তরযুগের এই অপরূপ শিল্পসম্ভারকে রক্ষা করতে স্পেনিশ সরকার চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। তাঁদের দূরদৃষ্টি আছে—তাঁরা গ্রামের চরিত্রকে নষ্ট না করে এই গণ্ডগ্রামে শহরের সুবিধা পৌঁছে দিয়েছেন ; শহরকে তুলে এনে গ্রামে বসাবার চেষ্টা করেননি। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই অলটামিরা আজ ইউরোপের এক শ্রেষ্ঠ টুরিস্ট-আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গুহাটি ছিল দেবারাধনার পবিত্র স্থান এবং সেই সঙ্গে আদি মানবের আর্টগ্যালারিও। যে বিস্ময় ও আনন্দ নিয়ে টুরিস্টরা রোম ও ভেনিস দেখেন, ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে দেখতে আসেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সিস্তিন চ্যাপেলকে। এখানকার সুন্দর টুরিস্ট-বাংলো যাত্রীদের থাকা ও খাওয়ার সবরকম অসুবিধা দূর করছে—কাছেই রেল স্টেশন থাকায় দ্রুত যাতায়াতের সুবিধা ভ্রমণকে অনেক আরামদায়ক করে তুলেছে। চওড়া রাস্তার দুই ধারে মৃদু গন্ধে ভরা ইউকালিপটাস বীথি, ছবির মত সুন্দর পুরাতত্ত্বের সংগ্রহশালা, সুপরিকল্পিত উদ্যান ও স্বচ্ছ সরোবর—সব মিলিয়ে যাত্রীদের মনে করিয়ে দেয়, তাঁরা সত্যিই যেন নন্দনকাননে বিচরণ করছেন।

# সমুদ্র-গর্ভের প্রত্নসম্পদ

## (ক)

সাম্প্রতিক কালে প্রত্নানুসন্ধান কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠের উপর, স্তূপ-সমাধিক্ষেত্র, অরণ্য-পর্বত, উপত্যকা বা নদীমুখেই সীমাবদ্ধ নেই। পুরাবস্তুর সংগ্রহকাজে প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টি এখন সমুদ্রের অতল গর্ভেও পৌঁছে গেছে—যেখান থেকে তাঁরা বহু যুগ পূর্বে নিমজ্জিত জাহাজের জীর্ণ ভগ্নাবশেষ ও তার বিচিত্র পণ্যসামগ্রী প্রায়ই তুলে আনছেন। তাঁদের নিত্যনতুন আবিষ্কার অতীত ইতিহাসের অনেক অন্ধকার কোণকে আলোকিত করেছে। এতদিন আমরা মিশরের 'ভ্যালি অব কিংস' অথবা মেসোপটেমিয়ার কোন. 'টেল'-এর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতে অভ্যস্ত ছিলাম। প্রতিমুহূর্তে আশা ছিল, নিঃশেষিত-প্রায় ঐ আকরগুলি থেকেই বোধহয় আবার কিছু বিস্ময়কর প্রত্নসম্পদ উঠে আসবে। আমাদের সে আশা কিন্তু অপূর্ণ থেকে গেছে। অবশ্য তাতে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই, পরিপূরক হিসাবে সমুদ্র আমাদের চোখের সামনে প্রত্নতত্ত্বের এক নবদিগন্ত খুলে দিয়েছে—সন্ধান দিয়েছে এমন এক অফুরন্ত ভাণ্ডারের, হাজার বছর ধরে কাজ চললেও যা নিঃশেষ হবার নয়। সমুদ্র তার বিপুল বক্ষে নানাবিধ রত্নরাজি ধারণ করে আছে, এমন ধারণা যে নেহাৎ কবি-কল্পনা নয়, তার প্রমাণ দিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা গত বিশ বছরের একাধিক অভিযানে।

গভীর সমুদ্রের প্রত্নানুসন্ধানকে প্রত্নবিজ্ঞানের আলাদা কোন বিভাগরূপে চিহ্নিত করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য জলেও যা ডাঙাতেও তাই। যে আদর্শ ও কর্মসূচি সামনে রেখে প্রত্নবিদ জলে অবতরণ করেন, ঠিক সেই একই আদর্শের অনুসরণ হয় ভূপৃষ্ঠের কোন অনুসন্ধানে। তাই এই দুই বিভাগকে আলাদা করে দেখার কোন অর্থ হয় না। নূতন প্রচেষ্টার একমাত্র বৈশিষ্ট্য—জলে নামা। বাদবাকি অন্যান্য কাজ—যেমন, মাপজোক ঠিক রেখে নক্‌শা আঁকা, সার্ভে করা এবং স্তর-পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখে খনন চালান এবং পরিশেষে প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণ—এসবই এক ধরনের। তুরস্কের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যিনি খননকার্য চালাচ্ছেন, অথবা যিনি গোয়াটিমালার গহন অরণ্যে প্রত্নবস্তুর অনুসন্ধান করেন—তাঁরা একই পথের পথিক। 'পাহাড়' বা 'জঙ্গলের' বিশ্লেষণ ব্যবহার করে তাঁদের কাজের মধ্যে কোন শ্রেণী-বিভাগ করা হয় না। অতএব সমুদ্রে যে ব্যক্তি অনুসন্ধান চালাচ্ছেন তাঁকেই বা আলাদা করে দেখার প্রয়োজন কি?

কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হলেও লক্ষ্য তাঁদের এক—তাঁরা সকলেই প্রত্নতাত্ত্বিক এবং এটাই তাঁদের প্রধান পরিচয়।

নীতি হিসাবে পৃথক কোন সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই মেনে নিলেও, কার্যত দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছুকাল ধরে ঐতিহাসিক মহলে 'মেরিন আর্কিওলজি' কথাটি চালু হয়েছে। সম্প্রতি (জুলাই ১৯৭১) ব্রিস্টল শহরে প্রত্নবিদদের একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার বসেছিল—তাতে আলোচ্য বিষয় ছিল 'মেরিন আর্কিওলজি'। এই সংজ্ঞাটি অনেকের মনঃপূত হবে না এই কারণে যে, সমুদ্রই প্রত্নবস্তুর একমাত্র আধার নয়। যদিও পণ্যবাহী বড়-বড় জাহাজ সাধারণত সমুদ্রেই নিমজ্জিত হয় বেশি, তবু হ্রদ বা নদীতে জাহাজ ডুবেছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। তাছাড়া প্রত্নবিদ কেবলমাত্র ডুবে যাওয়া জাহাজেরই অনুসন্ধান করেন না, সেই সঙ্গে অন্য মূল্যবান প্রত্নবস্তুও খোঁজেন। অনেক প্রাচীন জাতি-উপজাতির মধ্যে সমুদ্র-দেবতাকে ধনরত্ন, টাকাপয়সা উৎসর্গ করার প্রথা আগে ছিল, আজও আছে। মেক্সিকোর মায়া সভ্যতার অমূল্য নিদর্শনাদি চিচিন-ইটজার পবিত্র কূপ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। তাই মেরিন কথাটা ব্যবহার না করে ব্যাপকতর অর্থে আনডার ওয়াটার বা জলনিম্ন -প্রত্নতত্ত্ব কথাটি ব্যবহার হতে পারে। শ্রুতিমধুর না হলেও এর দ্বারা অর্থ বুঝতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এক্ষেত্রে আলাদা কোন সংজ্ঞা আদৌ ব্যবহার না করাই ভাল। তাতে অনেক অনাবশ্যক তর্ক-বিতর্কের হাত এড়ানো যাবে।

সুদূর অতীত থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কত অসংখ্য সমুদ্রগামী জাহাজ যে জলমগ্ন হয়েছে তার হিসেব নেই। কোনটা পণ্যবাহী বাণিজ্যপোত, কোনটা বা নৌবাহিনীর যুদ্ধ-জাহাজ। সমুদ্রের প্রধান-প্রধান সড়কগুলি তাই প্রত্নবিদ অনুসন্ধান করেন এবং জলের নিচে বিভিন্ন স্তরে জাহাজের জীর্ণ কঙ্কাল ও সেই সঙ্গে তার পণ্যসামগ্রীর কিছু অংশ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। কেবল জাহাজ নয়, কখনো বা জলে ধসে যাওয়া পুরো একটা ভূখণ্ডই আবিষ্কার করেন তাঁরা। গ্রিক ঐতিহাসিকদের লেখা পড়লে জানা যায়, ৩৭১ খ্রিঃ পূঃ গ্রিসের ছোট দ্বীপ 'হিলিকে' একদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর হঠাৎ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, ৭ জুন ১৯৬২ সালে জামাইকা দ্বীপের অন্তর্গত 'পোর্ট রয়াল' বন্দরটি প্রবল ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাসের পর জলের তলে তলিয়ে যায়। আজও হিলিকের কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। তবে 'পোর্ট রয়াল'-এর সঠিক অবস্থান প্রত্নবিদরা জেনেছেন। সমুদ্রের গভীরে অবতরণ করে তাঁরা নিমজ্জিত এই বন্দরের নকশা নিয়েছেন—ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, পার্ক ময়দান সবই সেই ছবিতে স্থান পেয়েছে। প্লেটোর বর্ণনায় জানা যায়, এথেন্সের প্রতিদ্বন্দ্বী 'অ্যাটলান্টিস' নামে সামুদ্রিক মহাদেশটি মাত্র একদিনের ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়েছিল। 'অ্যাটলান্টিস' কোথায় ছিল কেউ বলতে পারে না। প্লেটোর বর্ণনা যদি সত্যি হয়, তাহলে একদিন না একদিন, প্রত্নতাত্ত্বিক সমুদ্র ছেঁচে তার সংবাদ নিয়ে আসবেন।

সমুদ্র-গর্ভে সর্বত্র একই পদ্ধতিতে খননকাজ চলে না। জলের স্বচ্ছতা ও গভীরতা অনুযায়ী পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে—ভিন্ন হাতিয়ারের ব্যবহার হয়। রোমান আমলের প্রাচীন শহর খোঁড়ার সময় যে নিয়ম খাটে, এট্রাস্কান কবর-খননে সেটি প্রযোজ্য নয়। আবার মিশরের 'ভ্যালি অব কিংস'-এ যেভাবে কোদাল ও গাঁইতির ব্যবহার হয়, তাকলামাকান মরুভূমিতে সেইরূপ নয়। সমুদ্রের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম। বিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নদী মোহনায় যে পদ্ধতির অনুসরণ হয়, সে পদ্ধতি কার্যকরী হয় না ভূমধ্যসাগরে অথবা ক্যারিবিয়ান সী-তে। এ যাবৎ সমুদ্রে যেসব অনুসন্ধান চালানো হয়েছে তার সবগুলিই ২০০ ফিট গভীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ—এর অধিক গভীরে এখনও অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। সমুদ্রের তলদেশে নেমে ডুবুরি-প্রত্নবিদ তাঁর বাঞ্ছিত প্রত্নবস্তুটিকে কাদা, মাটি, বালি ও আগাছায় আচ্ছাদিত অবস্থায় দেখতে পান। খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে কাজ শুরু করতে হয়। ভারী শাবল ও গাঁইতি জলের নিচে ব্যবহার করা চলে না—তার বদলে প্রয়োজন হয় হাল্কা ধরনের হাতিয়ার—খোন্তা, খুরপি, কাঁচি জাতীয় যন্ত্রপাতির। উপস্থিত-বুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ডুবুরি কাজ চলাকালীন অভিজ্ঞতা থেকে নূতন হাতিয়ারও উদ্ভাবন করে থাকেন। জলের তলে সার্ভে করার অনেক যন্ত্রপাতি এইভাবে উদ্ভাবিত হয়েছে। জলের নীচে কাজ করার দুটি প্রধান যন্ত্র হচ্ছে, ডেপথগজ এবং এয়ার লিফট। প্রথমটির সাহায্যে জলের গভীরতা মাপা হয় এবং দ্বিতীয়টি প্রত্নবস্তু বা ভারী যে কোন জিনিসকে জলের তল থেকে উপরে তুলতে সাহায্য করে। ভূপৃষ্ঠের কাজে একজন বলিষ্ঠ মজুর সারাদিনই কোদাল চালাতে পারে। মাঝে-মাঝে বিশ্রাম নিলে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করা তার পক্ষে খুব কষ্টকর নয়। কিন্তু সমুদ্রে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের অসুবিধা অনেক। একটানা আধঘণ্টার বেশি জলে থাকার উপায় নেই তাঁদের। দিনে মাত্র দু-শিফটে কাজ করা চলে—তাও প্রথম ও দ্বিতীয়বার জলে নামার মধ্যে অন্তত ৩।৪ ঘণ্টার ব্যবধান থাকা চাই। ১৯৪৮ সালে সমুদ্রবিশারদ ফরাসি পণ্ডিত ক্যাপ্টেন কুস্তো যে কৃত্রিম ফুসফুস বা একোয়ালাং আবিষ্কার করেন তা ব্যবহার করেও এর বেশি সময় জলের নিচে থেকে খনন-কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছে না। যেসব গুণ থাকলে একজন ভাল ডুবুরির প্রত্নবিদ হওয়া যায়—তার মধ্যে দৈহিক বল ও সাহসই হল প্রধান। সমুদ্রের অতলে বিপদ-আপদের ঝুঁকি কম নয়। কত রকমের বিষাক্ত সাপ-পোকা-মাকড় সেখানে। তার উপর আছে সমুদ্রের আতঙ্ক—হাঙর ও অক্টোপাস, ঈলফিশ ও বিষাক্ত কাঁকড়া। কিন্তু এইসব ভয়ঙ্কর বিপদ সেই অভিশপ্ত ব্যাধির তুলনায় তুচ্ছ, যাতে আক্রান্ত হলে শরীরের নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে আসে। কত শক্তসমর্থ ডুবুরি যে এই ব্যাধির প্রকোপে পড়ে চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে গেছেন তার হিসেব নেই। বর্তমানে যেসব প্রত্নবিদ জলে নামা অভ্যেস করছেন—তাঁদের এইসব বিপদ-আপদ সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজখবর নিতে হয়। তারপর বেশ কিছুটা সময় যায়, হাতেনাতে জলে-নামা বিদ্যেটা আয়ত্ত করতে। সাধারণ ডুবুরিকে

জলে নামিয়ে দেখা গেছে, তারা যতটা মুক্তা অথবা স্পঞ্জ আহরণে উৎসাহী, প্রত্নবস্তুর অনুসন্ধানে ততটা নয়। এর জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়টি বেশ জটিল—এ বিষয়ে যাদের কোন পড়াশুনা নেই, তাদের পক্ষে এর মাহাত্ম্য বোঝা কঠিন। তাই আজকাল অনেকে বলছেন, ওস্তাদ ডুবুরিকে প্রত্নতাত্ত্বিক হতে না দিয়ে, অভিজ্ঞ প্রত্নবিদকে জলে নামতে শেখানো অনেক বেশি বুদ্ধির কাজ। যে-কোন আনাড়ির চেয়ে প্রত্নবস্তুকে তাঁরা তাড়াতাড়ি ও সহজে চিনে নেবেন।

নিমজ্জিত জাহাজকে ডাঙায় তোলার চেষ্টা খুব প্রাচীন হলেও, সুদূর অতীতে এ ধরনের উদ্ধারকার্যের কোন বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানা নেই। রেনেসাঁস আমলে ইটালিতে দুটি জাহাজকে জল থেকে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। আমাদের কাছে এটাই হল সবচেয়ে প্রাচীন নজির। শোনা যায়, রোম থেকে মাত্র ১৭ মাইল দূরে 'লেক নেমির' জলে দুটি নবনির্মিত জাহাজ প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে একই সঙ্গে ডুবে গিয়েছিল। এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে বহু লোক 'লেক নেমিতে' এসে ঘটনাস্থল স্বচক্ষে দেখে যায়। জাহাজডুবির এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ লোকদের মধ্যে নানা আজগুবি কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। লোকমুখে প্রচারিত এই গালগল্পগুলিকে একত্রে সংগ্রহ করেন কার্ডিনাল কলোনা নামে এক খ্রিস্টান পাদ্রী। বেশ কিছুকাল পরে কলোনার বিবরণটি পাঠ করলেন এক আর্কিটেক্ট ভদ্রলোক, যাঁর নাম অ্যালবার্তি। এঁর ইচ্ছা হল, 'লেক নেমি'র জলে ডুবে-যাওয়া জাহাজ দুটিকে তিনি ডাঙায় তুলবেন। খেয়ালি এই ভদ্রলোক পয়সা খরচ করে জেনোয়া থেকে কয়েকজন নামকরা ডুবুরিকে আনিয়ে নিলেন। 'লেক নেমির' অগভীর জল থেকে তারা ছোট জাহাজটিকে উদ্ধার করল—কিন্তু বড়টি মাটিতে এমনভাবে বসে গিয়েছিল যে, তাকে নড়ানই গেল না। ঘটনাটি ঘটে প্রায় চারশ' বছর আগে—তাই জাহাজ থেকে কি কি পাওয়া গেল—সে কথা কারও মনে নেই, লিখেও রাখেননি কেউ। শোনা যায়, বড় জাহাজটিকে ৬ বার ডাঙায় তুলতে চেষ্টা করেছিল ডুবুরিরা, কিন্তু প্রতিবারই তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৮৯৫ সালে এলিচিত্ত বজি নামে এক পুরাতত্ত্ব-প্রেমিক জেনোয়াবাসী, ডুবুরির সাহায্যে জাহাজের খোল থেকে কয়েকটি ব্রোঞ্জমূর্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। 'লেক নেমির' জাহাজ নিয়ে যথেষ্ট হৈচৈ হচ্ছে লক্ষ্য করে ১৯২৮ সালে মুসোলিনী আদেশ দিলেন, হ্রদের জল পাম্প করে তুলে ফেলে জাহাজটিকে ডাঙায় তোলা হোক। তাঁর কথা মতো কাজ হল। উদ্ধার হল পাঁকে ডোবা বৃহৎ জাহাজটি। দেখা গেল, এটি একটি সাধারণ কাঠের মাস্তুল-বিশিষ্ট বৃহদায়তন জাহাজ—এর মধ্যে এমন একটিও বৈশিষ্ট্য নেই যা ঐতিহাসিকদের অজানা। কাজেই প্রশ্ন হল, এত অর্থ ব্যয়ে যে জাহাজটির পুনরুদ্ধার সম্ভব হল, ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে তার মূল্য কতটুকু! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে, ১৯৪৪ সালে একদল জার্মান সৈন্য কোন অজ্ঞাত কারণে 'লেক নেমির' এই

হতভাগ্য জাহাজটিতে অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করে। এইভাবে সব তর্কবিতর্কের উপর যবনিকাপাত হল।

সুইডেনের এক দুর্গম 'ফিয়র্ডে' যেদিন আকস্মিকভাবে ৯০০ বছরের পুরাতন জরাজীর্ণ ভাইকিং জাহাজের সন্ধান পাওয়া গেল, সেদিন ঐতিহাসিক মহলে রীতিমতো সাড়া পড়ে যায়। ভাইকিংদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল সুইডেনে। তাই এদেশের জল থেকে ভাইকিংদের ব্যবহার করা জাহাজের কঙ্কাল উঠে আসবে, তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক আমলের একটি জাহাজ নিয়ে সুইডেনে যে সোরগোল পড়ে গিয়েছিল তার বর্ণনা খুব কৌতূহলোদ্দীপক। ১৬২৫-এ রাজা দ্বিতীয় গুস্তাভাস এডলফাসের আদেশক্রমে বহু অর্থ ব্যয়ে একটি নতুন মডেলের জাহাজ তৈরি হয়। রাজবংশেব নামানুযায়ী এর নামকরণ হয়েছিল 'ভাসা'। আয়তনে বৃহৎ এই জাহাজের ডেকে সারি সারি ৬৪টি কামান বসানো ছিল। সুইডিশ নৌশক্তি-প্রাধান্যের প্রতীক 'ভাসা'র জন্ম কিন্তু অশুভলগ্নে। যেদিন তাকে জলে ভাসানো হয়, সেদিন সামান্য এক ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কায় বেসামাল হয়ে জাহাজটি জলের তলায় তলিয়ে যায়। রাজা নিজে ও রাজ পরিবারের অনেকে এই মর্মান্তিক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেন। এই দুর্ঘটনার প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরে নৌবহরের তরুণ ইঞ্জিনিয়ার এন্ডারিজ ফ্রাঞ্জেন, স্টকহলম বন্দরের অদূরে ১২০ ফুট জলের গভীরে, ভাসার ভগ্নাবশেষ খুঁজে পেলেন। ১৯৫৬ থেকে শুরু করে চার বছর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন ভাসাকে পুনরুদ্ধার করতে। নৌবিভাগের ডুবুরিদের সাহায্যে তিনি কর্দমশয্যায় শায়িত ভাসার ছয়টি বিভিন্ন স্থানে সুড়ঙ্গ কাটলেন। তাঁরপর সেই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ৬ ইঞ্চি পুরু কাছি চালিয়ে পুরো জাহাজটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন এবং সেই অবস্থায় ধীরে-ধীরে উপরে টেনে তুললেন। ৭০০ টনের ভারী জাহাজটিকে এখন সারিয়ে জোড়াতালি দিয়ে একেবারে পূর্বেকার নতুন অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। প্রয়োজন হলে একে আবার জলে ভাসানো চলে। স্টকহলম বন্দরের অদূরে খানিকটা জায়গা ঘিরে দর্শনীয় বস্তু হিসাবে সপ্তদশ শতকের 'ভাসাকে' সাজিয়ে রাখা হয়েছে। জাহাজের মধ্যে আছে একটি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দেহাবশিষ্ট। পরিধানে তার উলের সোয়েটার ও প্যান্ট। পকেটের মানিব্যাগে কিছু টাকা-পয়সা প্রমাণ করে হতভাগ্য ব্যক্তির হয়তো ইচ্ছা ছিল, বিদেশের কোন বন্দরে নেমে কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনবে—কিন্তু কে জানত, যাত্রার শুরুতেই ভাসার এমন ভরাডুবি হয়ে যাবে, যার ফলে সলিল সমাধি ঘটবে এতগুলো যাত্রীর।

১৯৫৮ সালে আমেরিকার পেনসিলভানিয়া মিউজিয়াম ও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে গ্রিস-তুরস্কের উপকূলে একটি অভিযান প্রেরিত হয়।

বাইজানটাইন আমলের কয়েকটি জাহাজ উদ্ধার করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল। পর-পর দুটি ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালানো হয় এবং উভয়ক্ষেত্রেই আশাতীত সাফল্য

অর্জন করেছিলেন অভিযানের সর্বাধিনায়ক পিটার থ্রক্‌মরটন ও তাঁর প্রধান ডুবুরি ফ্রেড ডুমাস। অনুসন্ধানকারীরা প্রথমে তুরস্কের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'কেপ গেলিডোনিয়ার' অদূরে, ৯০ ফুট জলের নিচে ব্রোঞ্জ যুগের একটি জাহাজের খোঁজ পান। স্পঞ্জ ব্যবসায়ী গ্রিক ডুবুরিরা এই জাহাজটির সন্ধান এনে দেয়। থ্রক্‌মরটন ও ডুমাস সরেজমিন তদন্ত করতে নেমে কিন্তু নিরাশ হলেন। তাঁরা বুঝলেন, তিন হাজার বছরেব পুরাতন এই জাহাজকে উপরে টেনে তোলা প্রায় দুঃসাধ্য। আট ইঞ্চি পুরু প্রবাল-আস্তরণ একে সমুদ্রের তলদেশের সঙ্গে সিমেন্ট-কংক্রিটের মত শক্তভাবে গেঁথে রেখেছে, শত চেষ্টাতেও জাহাজের একটি কাঠকেও আলগা করা যাচ্ছে না। ৮জন ডুবুরি ৫।৬ দিন কাজ করে হাল ছেড়ে দিল—একটি কাঠও তারা উপরে আনতে পারল না। ফ্রেড ডুমাস তখন একটি নূতন উপায় বার করলেন। তাঁর মতে, টুকরো-টুকরো কাঠের অংশকে উপরে তোলার চেষ্টা বৃথা। তাব চেয়ে সহজ, সমস্ত কংক্রিটের চাঁইকে উপরে তোলা। একবার উপরে তুলতে পারলে ধীরে-সুস্থে নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে জাহাজের তক্তাকে কংক্রিট-মুক্ত করা যাবে। সকলেই ডুমাসের পরিকল্পনায় সায় দিলেন। ছেনি, হাতুড়ি ও জ্যাক নিয়ে ডুবুরিরা জলে নেমে কাজ আরম্ভ করলেন। যাতে প্রত্নবস্তুর কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রেখে খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ সমাধা করলেন তাঁরা। কিছুদিনের মধ্যে বড়-বড় কোরাল-কংক্রিটের চাঁই এয়ার-লিফটের সাহায্যে উপরে তোলা হল। নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে জাহাজের এক-একটি অতি জীর্ণ, পুরাতন অংশকে কংক্রিট থেকে ছাড়িয়ে পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হল। হোমারের বর্ণনায়, ওডিসীয়াস যে পদ্ধতিতে জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন, সেই পদ্ধতিতে দলের আর্কিটেক্ট একটা কাঠ অন্যটার সঙ্গে সুনিপুণ হাতে জোড়া দিয়ে আবার তার আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন। আস্তে-আস্তে যে কাঠামোটা তৈরি হল তাতে বোঝা গেল, প্রবাল-সমাহিত ব্রোঞ্জ যুগের এই জাহাজের আকৃতি তেমন বড় নয়—মাঝারি ধরনের। মাত্র ৫৫ পাউন্ডের মত ব্রোঞ্জের পাত ও ধাতব দ্রব্য এই জাহাজ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ব্রোঞ্জের পাতে সাইপ্রো-মিনোয়ান লিপি খোদিত ছিল—যার পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। আজ পর্যন্ত প্রাচীন যতগুলি নিমজ্জিত জাহাজের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম। অনুমান করা যায়, এটি একটি ফিনিসীয় বাণিজ্য পোত—সিরিয়া থেকে সাইপ্রাস অভিমুখে যাবার পথে এর সলিল-সমাধি ঘটে।

---

# সমুদ্র-গর্ভের প্রত্নসম্পদ

## (খ)

কেপ্‌গেলিডোনিয়াতে যা পাওয়া গিয়েছিল তার চেয়ে আরও চমকপ্রদ কিছু আবিষ্কারের আশায়, থ্রকমরটন তাঁর দলটিকে বোডরাম শহরে (প্রাচীন হেলিকারনেসাস) নিয়ে এলেন। ভূপৃষ্ঠে কোথায় কি প্রত্নসম্পদ লুকিয়ে আছে, প্রত্নতাত্ত্বিক সে খবর প্রধানত জানতে পারেন স্থানীয় কৃষক মেষ-পালকদের কাছ থেকে—তেমনি জলের নিচে কোথায় কি পাওয়া যেতে পারে সে খোঁজ তাঁকে এনে দেয় মৎস্যজীবীরা। এদের মধ্যে অনেকেই সমুদ্র থেকে মুক্তো অথবা স্পঞ্জ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। দক্ষিণ তুরস্কের উপকূলে ঘোরাঘুরির সময় প্রত্নতাত্ত্বিকরা কামাল আরাস নামে এমন এক স্থানীয় স্পঞ্জ ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, সমুদ্র যাঁর নখদর্পণে। তিনি খবর দিলেন, বোডরাম-এর অদূরে ছোট্ট দ্বীপ ইয়াসি এ্যাডো-র দেড় শ' ফুট জলের গভীরে অনেকগুলি জাহাজের ভগ্নাবশেষ প্রায় পাশাপাশি পড়ে আছে—যা তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। খবরটি কতদূর সত্য যাচাই করতে থ্রকমরটন ১৫ মাইল দূরবর্তী ইয়াসি এ্যাডোয় এসে উপস্থিত হলেন। ইয়াসি এ্যাডো ছোট দ্বীপ—শিলাবহুল উষর তার ভূপৃষ্ঠ। এখানে জনবসতি নেই। ইয়াসি এ্যাডো কথাটির অর্থ হল, 'ফ্ল্যাট আইল্যান্ড' বা সমতল দ্বীপ। এখানে বসবাস করার সুবিধা নেই দেখে থ্রকমরটন বোডরাম শহরকেই তাঁর হেড কোয়ারটার বা 'বেস' হিসাবে ব্যবহার করবেন স্থির করলেন—যদিও জানতেন, যাতায়াতে অনেকটা সময় রোজ নষ্ট হবে। ইয়াসি এ্যাডোতে পৌঁছেই থ্রকমরটন ও তাঁর সহকর্মী জর্জ ব্যস জলে ডুব দিয়ে দেখলেন, কামালের সংবাদ ভিত্তিহীন নয়—নির্দিষ্ট সেই জায়গায় ১২টি জাহাজের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। থ্রকমরটনের মনে প্রশ্ন জাগল, একই জায়গায় এতগুলি ছোট-বড় জাহাজ নিমজ্জিত হল কেন? উপরে উঠে দ্বীপের চারিধার ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর তিনি পেয়ে গেলেন। দ্বীপের সংকীর্ণ এক ভূখণ্ড হঠাৎ একস্থানে সমুদ্রের দিকে অনেকখানি হস্ত প্রসারিত করেছে। দূর থেকে জলমগ্ন এই প্রবাল-প্রাচীর চোখেই পড়ে না। এইজন্যই বহু যুগ ধরে অনেক অসতর্ক নাবিক এই প্রাচীরে ধাক্কা লাগিয়ে জাহাজ-ডুবি ঘটিয়েছে। ইয়াসি এ্যাডো এক সমাধিক্ষেত্র। এই আবিষ্কারের কাহিনী ঐতিহাসিক মহলে বেশ সাড়া জাগাল—নিমজ্জিত জাহাজগুলি থেকে কি উঠে আসে জানবার জন্য সকলেই আগ্রহে অধীর হলেন। থ্রকমরটনের কাছে ইয়াসি এ্যাডোর জল বড়ই রহস্যময় বলে মনে হল। এর ১২০ ফুট গভীরে যে জাহাজটিকে

পাওয়া গেল সেটি ষষ্ঠ শতকের। আবার তারই একটু নিচে ১৫০ ফুট গভীরে দেখা গেল আরও পুরাতন, পঞ্চম শতাব্দীর অপর একটি জাহাজ। সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে এক-একটি দোলনায় যেন এক-একটি জাহাজ নিদ্রামগ্ন হয়ে আছে। মোট ১২টি জাহাজের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেটি বাইজানটাইন আমলের এক মাঝারি ধরনের রোমান জাহাজ। থ্রকমরটন ও তাঁর দলটির সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যে, এই জাহাজটিকে তাঁরা পুরোপুরি ডাঙায় তুলতে পেরেছিলেন। দুটি গ্রীষ্ম ঋতু (১৯৬০-৬১) তাঁরা এখানে অতিবাহিত করেন। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যে জলে নেমে তাঁরা এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। খনন শুরু করার আগে কতকগুলি প্রাথমিক কাজ আছে যা প্রত্নবিদরা অবশ্য-কর্তব্য বলে মনে করেন। তার মধ্যে প্রধান—সমুদ্রগর্ভে ঠিক যে অবস্থায় জাহাজটি বালি ও কাদার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তার নিখুঁত বিবরণ সংগ্রহ করা। মাপজোখ যত নির্ভুল হয় ততই ভাল। কারণ, হিসাবে গরমিল থেকে গেলে ঐতিহাসিকদের মূল্যায়নও যথাযথ হবে না। কিন্তু জলের নিচে নকশা আঁকার কাজে নানা বিঘ্ন। সার্ভের কাজটা যাতে সহজে করা যায়, সেজন্য একটা নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন প্রত্নবিদরা। জলমগ্ন জাহাজটির উপর পাইপ ও তার-নির্মিত চারচৌকা একটি খাঁচা ফেলে দেওয়া হল। তারপর এই খাঁচার এক একটি দাঁড়ে ভর দিয়ে ১৩ ফুট উপর থেকে একাধিক ফটো নিলেন তাঁরা। ছবিতে জাহাজের খুঁটিনাটি সব বিবরণ সুন্দর ফুটে উঠল—একটি পেরেক রিবেটও বাদ গেল না। এইভাবে জলের নিচে নকশা আঁকার পরিশ্রম অনেক লাঘব হল। ১৩শ' বছর সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ডুবে থাকার জন্য জাহাজের তক্তা খুব ভঙ্গুর হয়ে গিয়েছিল। হাত লাগলেই সেগুলি ভেঙে পড়ছিল ঝুরঝুর করে, ঘুণ-ধরা বাঁশ যেভাবে ভেঙে পড়ে। জাহাজের কাঠগুলি আলাদা-আলাদা করে না তুলে সমস্ত কাঠই যাতে একসঙ্গে উপরে তোলা যায় সেই চেষ্টা করলেন প্রত্নবিদরা। এই উদ্দেশ্যে তৈরি হল লোহা ও তারের বিরাট বাসকেট। এতে জাহাজের কাঠ সন্তর্পণে সাজিয়ে রেখে এয়ার লিফটের সাহায্যে উপরে তোলা হল। এই কাঠগুলি নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ভেজা কাঠ রোদ্দুর ও হাওয়ায় শুকিয়ে গেলে অনেকটা সঙ্কুচিত হয়—যার ফলে কাঠে ফাটল দেখা দেয়। তাই ১৩শ' বছরের জলে-ভেজা তক্তাগুলিকে উপরে ওঠানো-মাত্র এক-একটা বড় বেসিনে ডুবিয়ে রাখা হল। কাঠ সংরক্ষণের জন্য জলে মেশানো হল—'পলিএথিলিন, গ্লাইকল'। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গুণে কাঠ অবিকৃত ও অক্ষত থাকল।

ব্রোঞ্জ যুগের জাহাজটির বয়সকাল নির্ণিত হয়েছিল কাষ্ঠখণ্ডের উপর প্রবাল-আচ্ছাদনের ঘনত্ব পরীক্ষা করে। কিন্তু ইয়াসি এ্যাডোর জাহাজটি যে বাইজানটাইন আমলের তার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ কি? দলের একমাত্র মহিলা সদস্য, মৃৎপাত্র-বিশারদ, শ্রীমতী ভারজিনিয়া গ্রেস, কয়েক টুকরো মৃৎপাত্র পরীক্ষা করে অনুমান করেছিলেন জাহাজটি সপ্তম শতকের (অর্থাৎ ১৩শ' বছরের পুরাতন) কিন্তু তবু সংশয় দূর হচ্ছিল না। যেদিন

জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের (৬১০-৬৪১ খ্রিঃ) নামাঙ্কিত ছটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেল, সেদিনই প্রত্নবিদরা নিঃসন্দেহে জানলেন, জাহাজটি ৭ম শতকের প্রারম্ভে নির্মিত হয়েছিল। ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রায় ৯০০টি দুই-হাতল বিশিষ্ট মাটির জার (গ্রিক নাম এমফোরা) পাওয়া গিয়েছিল—এগুলির মধ্যে মদ ভরা থাকত। দীর্ঘ-শতাব্দী জলের নিচে থাকার জন্য অধিকাংশ জারই জীর্ণ, বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। মাত্র ১০০টি অটুট অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। এর প্রত্যেকটির মধ্যে বিষাক্ত পোকা-মাকড় বাসা বেঁধে সুখে বাস করছিল। অতি সতর্কতার সঙ্গে এগুলিকে পরিষ্কার করে ঘষে-মেজে দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত করা হল। জাহাজের ক্যাপ্টেনের ব্যবহার কবা ব্যক্তিগত দুটি জিনিস—একটি ক্রশ ও একটি ছোট দাঁড়িপাল্লা এঁরা খুঁজে বার করেছিলেন। ক্রশটি প্রমাণ করে ক্যাপ্টেন ছিলেন ধর্মভীরু খ্রিস্টান। কিন্তু ধর্মপ্রাণ এই ব্যক্তির যে প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি ছিল, তার প্রমাণ, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রাখা ছোট দাঁড়িপাল্লাটি—যার একপাশে খোদিত মালিকের নাম : 'জর্জ—সিনিয়র সী ক্যাপ্টেন।' অধিনায়কের এই সী ক্যাপ্টেন (গ্রিক ভাষায় : নাওকোরস্) উপাধিটি তাৎপর্যপূর্ণ। সপ্তম শতকে অধিনায়ক জর্জের মত ব্যক্তিরা যথেষ্ট বিত্ত ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। এতদিন তাঁরা বেতনের বিনিময়ে অন্য-কারো জাহাজ চালাতেন। রোমান আমলের বিরাটাকার জাহাজের পরিবর্তে ৭ম শতকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন জাহাজ নির্মিত হতে থাকে। জাহাজের ক্যাপ্টেন জর্জ সেইসব উদ্যোগী কর্মঠ ও পরিশ্রমী ব্যক্তিদের মধ্যে পড়েন, যাঁরা নিজেরাই জাহাজ কিনে ব্যক্তিগত মালিকানায় মদের ব্যবসা চালাতে পারতেন। এমন লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে যে লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সে যুগের জাহাজ-নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কেও অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে, অপেক্ষাকৃত আধুনিককাল পর্যন্ত জাহাজ-নির্মাণের যে বিবর্তন-ধারা আমাদের জানা আছে তার মধ্যে ইয়াসি এ্যাডোর জাহাজটি একটি বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা করছে। এটি দাঁড়টানা বিরাটাকার রোমান 'গালী' নয়, আবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধরনের ছোট পালতোলা জাহাজও নয়। এটি দুই ভিন্ন ধারার সঙ্গমে দাঁড়িয়ে বিশেষ একটি টাইপের পরিচয় দিচ্ছে—যা পূর্বে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

সীমাহীন সমুদ্রের ভীষণ ও করাল রূপ প্রত্নতাত্ত্বিকের মনে আর আতঙ্কের সৃষ্টি করে না। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও গভীরতা, দুই-ই এখন তার আয়ত্তে। এখন পর্যন্ত সমুদ্রের ২০০ ফুট গভীরতার মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁর অনুসন্ধানকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু ক্রমশই যে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে নামা সম্ভব হবে তার অঙ্গীকার পাওয়া যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চারিধারে এবং ভূমধ্যসাগরে অনুসন্ধান চাল্লানো হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগর ও অ্যাটলান্টিকের বিখ্যাত সমুদ্র-সড়কগুলিতে

এখনও কাজ বাকি। সেখানে সমুদ্র যেমন গভীর—পরিবেশও তেমনি প্রতিকূল। আমেরিকা মহাদেশ থেকে প্রত্যাগমনকালে বহু পণ্যবাহী স্পেনিশ জাহাজ, দেশপ্রেমী ইংরেজ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে জলমগ্ন হয়। এখন পর্যন্ত এমন একটি জাহাজেরও সন্ধান মেলেনি। কিন্তু ক্রমশই এসব স্থানে প্রত্নানুসন্ধানীরা পৌঁছে যাবেন। এমন দিন আসছে, যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যেখানেই জাহাজ ডুবেছে সংবাদ আসবে, সেখানেই এঁরা ছুটে যাবেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতি অসম্ভবকেও সম্ভব করছে। সমুদ্র-বিশারদ ফরাসি পণ্ডিত ক্যাপ্টেন কুস্তো লোহিতসাগরের নিচে এমন কতকগুলি গৃহনির্মাণ করেছেন যার মধ্যে মানুষ অক্লেশে দীর্ঘদিন বসবাস করতে পারে। এই বাড়িগুলির মধ্যে হাওয়ার বদলে এক ধরনের 'প্রেসারাইজড গ্যাস' ভরা থাকে—যার জন্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কোন অসুবিধা হয় না। ঘরের মেঝেতে থাকে আগমন ও নির্গমনের পথ। এইরূপ ৩৫ ফুট নিম্নে অবস্থিত এক বাড়িতে যে-কোন ব্যক্তি এক মাসকাল কাটিয়ে আসতে পারেন। নিজস্ব দেশ রিভিয়েরার উপকূলে কুস্তো আর-একটি বাড়ি তৈরি করেছেন ৩৩০ ফুট গভীরে। তাঁর আশা আছে আরও গভীরে তিনি এ ধরনের একাধিক বাড়ি তৈরি করবেন। তার ফলে যে কোন ব্যক্তি ৯০০।১০০০ ফুট গভীরে অনুসন্ধান করে উপরের স্তরে এমন-কোন-এক গৃহে এসে বিশ্রাম নিতে পারবে। এতে দীর্ঘ সময় সে জলে কাটাতে পারবে—অনুসন্ধান আরও সহজ হবে।

অনেকের ধারণা, সমুদ্রগর্ভের অনুসন্ধান-কাজ খুবই অর্থসাপেক্ষ। কথাটা কিন্তু আংশিক সত্য। পিটার থ্রকমরটন দেখিয়েছেন, কেপ্ গেলিডোনিয়াতে তাঁদের যা খরচ পড়েছিল, তা সাধারণভাবে ভূপৃষ্ঠের খনন চালাতে যা খরচ হয় তার তুলনায় কম। ভূপৃষ্ঠের একটা পুরো অভিযান চালাতে হলে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যে প্রচুর টাকা ঢালতে হয় তার হিসাব রাখে ক'জন! ক্ল্যাসিকাল যুগের কোন শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করতে আমেরিকার মিউজিয়ামগুলি লক্ষ-লক্ষ ডলার ব্যয় করে। তাই ব্যয়-বাহুল্যের কথা তুলে সমুদ্রের অনুসন্ধানকে অবৈজ্ঞানিক বা আজগুবি প্রচেষ্টা বলে উড়িয়ে দেওয়া কাজের কথা নয়। এমন সব বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক আছেন যাঁরা নৈরাশ্যের সুরে বলেন, এত পয়সা ঢেলে সমুদ্র থেকে যা তোলা হবে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর—তার চেয়ে ভূপৃষ্ঠেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। যিনি কোন প্রাচীন অট্টালিকার জলনিষ্কাষণ ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন, দেখা যায় তিনি গভীর নিষ্ঠা-সহকারে প্রতিটি পাইপের ব্যাস, উচ্চতা বা দৈর্ঘ্যের খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করেন। একটি প্রাচীন জাহাজের গঠন, আকৃতি কেমন ছিল, সে আলোচনা কি তার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর? দুঃখের কথা, জাহাজ এখন প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে অনাদৃত। প্রত্নতত্ত্ব-সম্পর্কিত নানা পুস্তিকায় প্রাচীন আমলের মুদ্রা, অলঙ্কার ও আসবাবপত্র থেকে শুরু করে দেয়ালের ইট, ছাদের টালি, স্ক্রু-পেরেক—সবই স্থান পায়। কিন্তু জাহাজ সম্পর্কে তেমন কিছু লেখা পাওয়া যায় না। স্বীকার করা

যাক, নূতন অনুসন্ধান এখনও বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি—গড়ে ওঠেনি এমন কোন সর্বগ্রাহ্য নিয়মকানুন যা সমুদ্রের সর্বত্র প্রযোজ্য হতে পারে। তবে মাত্র পনেরো থেকে কুড়ি বছরের চেষ্টায় গভীর সমুদ্রের প্রত্নবিদরা যতদূর এগিয়েছেন, তাকে কোন হিসাবেই সামান্য বলা চলে না। পুরাকালের জাহাজ-নির্মাণ সম্পর্কে তাঁরা আমাদের অনেক তথ্য জানিয়েছেন। আরও জানিয়েছেন, কি ধরনের পণ্য এই জাহাজগুলি দেশ থেকে দেশান্তরে বয়ে নিয়ে যেত—কোন্ পথে তারা যাতায়াত করত এবং যাত্রাপথে কোন্-কোন্ বন্দরে তারা থামত। এসব মূল্যবান তথ্যের ভিত্তিতে একদিন অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখা সম্ভব হবে। সমুদ্র-গর্ভে অনুসন্ধানকারী এই প্রত্নবিদদের তাই আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বাগত জানাই। উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ তাঁদের এই প্রচেষ্টা এবং আমাদের প্রত্যাশাও অনেক।

---

# সাটন হু-র রত্নভাণ্ডার

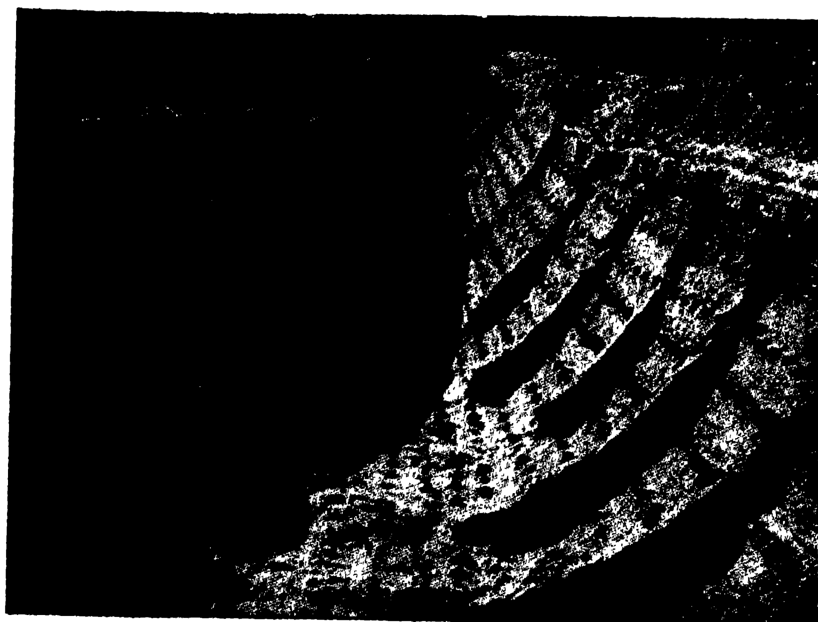
১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মে মাসের এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে, মিসেস এডিথ প্রেটি নামক এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা উলব্রিজের কাছে সাটন হু-তে তাঁর এস্টেট পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাঁর এবারকার সফরের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হল, স্বল্পস্রোতা ডেবেন নদীর ধারে খানিকটা উঁচু জমির ওপর ছোট-বড় এগারোটি স্তূপ। স্থানীয় ভাষায় হু বা হো কথাটির অর্থ হল টিলা বা ছোট পাহাড়। মিসেস প্রেটির সঙ্গে ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক বেসিল ব্রাউন— যাঁর অনুমান, এগারোটির মধ্যে অন্তত পাঁচটি হল সমাধি-স্তূপ। আগের বছর ব্রাউন তিনটি স্তূপ খনন করে ব্রোঞ্জ-যুগের মৃৎপাত্র, কিছু হাড়-পাঁজর এবং অতি পুরাতন এক কাঠের নৌকার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছিলেন। এ বছর তিনি আবার খনন শুরু করার তোড়জোড় করছিলেন। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল বৃহদাকার একটি স্তূপের ওপর—যার ব্যাস ৩০ মিটার এবং মাটি থেকে উচ্চতা ৩ মিটার। আগেকার দিনের শৌখিন প্রত্নতাত্ত্বিকরা এলোপাথাড়ি খননকার্য চালাতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মিসেস প্রেটি সাবধানী মহিলা— হঠকারিতার সঙ্গে তিনি কিছুই করতে চাইতেন না এবং সর্বদা তাঁর নজর যে, তাঁর প্রচেষ্টাকে কেউ যেন বড় মানুষের উদ্ভট খেয়াল বলে চালাতে না পারে। বড় স্তূপটি খুঁড়বার আগে তিনি তাই ইপসুইচ মিউজিয়ামের কিউরেটার মেনার্ডকে ডেকে পাঠালেন। ব্রাউন ও মেনার্ড উভয়ই বিশেষজ্ঞ। তাঁরা কিন্তু স্তূপটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, বহু বর্ষ পূর্বে কারা যেন সমাধি উন্মোচনের চেষ্টা করেছিল এবং সেইজন্যই হয়ত স্তূপটি থেকে আদৌ কোন রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। সম্ভবত কবর-চোররা বহু পূর্বেই এর অন্তর্নিহিত সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকদের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হল। তিন মাসের মধ্যে সাটন হু-তে যে প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হল, তুলনামূলক বিচারে ইংলন্ডে এ যাবৎ যা কিছু প্রত্নসম্পদ পাওয়া গিয়েছিল তা অপেক্ষা সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ। কেবল তাই নয়, সাটন হু-র আবিষ্কার অ্যাংলো-স্যাকশন যুগের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের উপর যথেষ্ট আলোক-সম্পাত করল।

এস্টেটের মাত্র দু'জন মালির সাহায্যে প্রথমে ব্রাউন কাজ শুরু করলেন। দু'মিটার চওড়া এক গর্ত করে স্তূপের ভিতরকার অবস্থা কি প্রকার, তার খোঁজ নিচ্ছিলেন তিনি। গর্ত একটু বড় হতেই একজন মালি এসে জানাল, সে এক টুকরো লোহার সন্ধান পেয়েছে। ব্রাউন হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে বুঝলেন, জিনিসটা কোন পুরাতন নৌকা বা জাহাজের পেরেক অথবা রিবেট যা একখণ্ড কাঠকে অন্য খণ্ডের সঙ্গে শক্ত করে ধরে রাখে। ধীরে-ধীরে ঐ ধরনের আরও পাঁচটি পেরেক উঠে এল—একটির সঙ্গে অন্যটির

ব্যবধান ১২ সেন্টিমিটার। ব্রাউনের ধারণা, এবারও গত বছরের মত ছোট কোন নৌকার সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর ভ্রম কেটে গেল। যতই খননকার্য অগ্রসর হ'তে থাকল ততই তিনি বুঝতে পারলেন, যাকে এতদিন ছোট নৌকা বলে মনে করে আসছেন, সেটি আসলে বেশ বড় একটি জাহাজ। দীর্ঘদিন মাটির নিচে থাকায় জাহাজের সব কাঠ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল—কেবল চোখে দেখা যাচ্ছিল মরচে-পড়া আধা-ক্ষয়প্রাপ্ত কতকগুলি পেরেক ও নাট-বল্টু। মাটির ওপর মরচের দাগ ধরে মাটি শক্ত ও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ স্তূপটি খোঁড়ার পর মনে হচ্ছিল, মাটির ওপর যেন একটি বিরাটাকার জাহাজের ছাঁচ পড়ে আছে।

বিস্ময়ে অভিভূত ব্রাউন এই আবিষ্কারের তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন। তিনি জানতেন, ইংলন্ডে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পূর্বে প্যাগানদের মধ্যে জাহাজ-সমাধি দেবার প্রথা চালু ছিল। কবি বেউলফের কাব্যে তার নজির আছে। দেশের কোন বিখ্যাত ব্যক্তি—রাজা মন্ত্রী বা সেনাপতি মারা গেলে তাঁকে যখন সমাধি দেওয়া হত, তখন একখানি জাহাজও তাঁর মরদেহের সঙ্গে সমাহিত হত। ভাবার্থ এই যে, ভবনদী পার হতে মৃত ব্যক্তির কাজে লাগবে জাহাজটি। কেবল জাহাজই নয়, মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত নানা মূল্যবান শৌখিন বস্তু একই সঙ্গে ভূ-প্রোথিত হত।

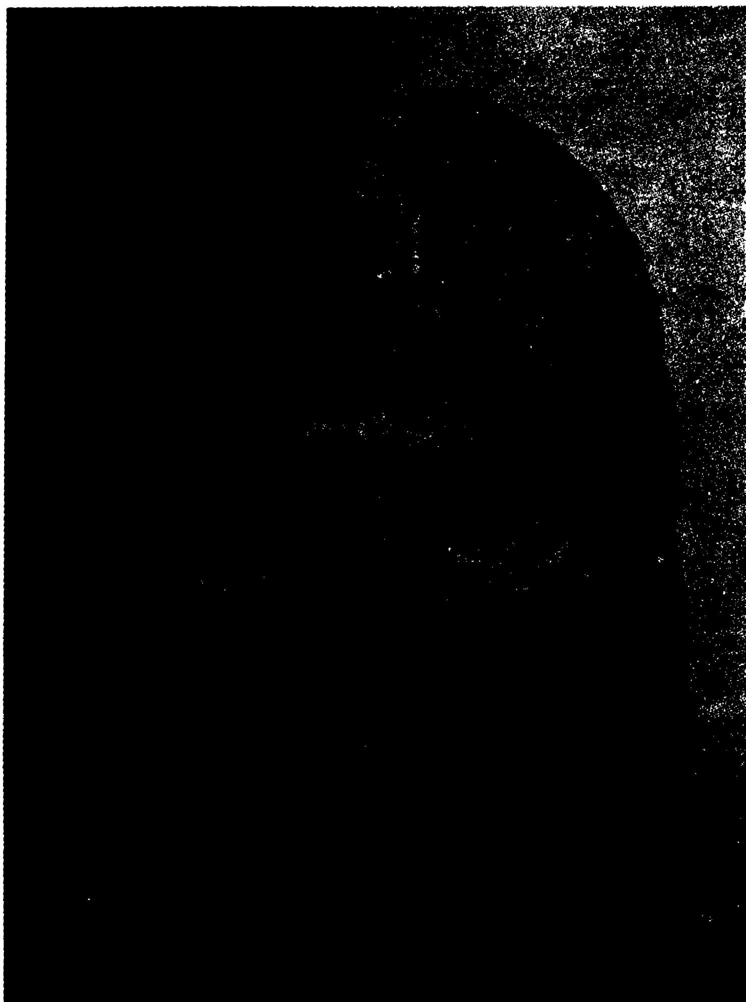
সাটন হু-র আবিষ্কার-কাহিনী ইংলন্ডে প্রচারিত হওয়া-মাত্র দলে-দলে লোক আসতে শুরু করল সফোকের এই গণ্ডগ্রামে। তাদের মধ্যে সাধারণ অজ্ঞ দর্শক যেমন ছিল, তেমনি ছিল বিদগ্ধ পণ্ডিত ও প্রত্নবিদেরা। যে-সব দর্শক মিসেস প্রেটির সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কেমব্রিজের বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক চার্লস ফিলিপস। তিনি এস্টেটের অধিকারিণী মিসেস প্রেটিকে এই বলে বোঝালেন যে, একক প্রচেষ্টায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য তাঁর পক্ষে চালানো সম্ভব নয়। তাঁর উচিত এই কাজে ইংলন্ডের পূর্ত বিভাগ ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সাহায্য প্রার্থনা করা। মিসেস প্রেটি যথার্থই বিদ্যানুরাগী মহিলা। পণ্ডিতপ্রবর ফিলিপস্-এর এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে তাঁর কোন আপত্তি হল না। মিসেস প্রেটির অনুরোধেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম কয়েকজন নামকরা প্রত্নবিদকে সাটন হু-তে পাঠিয়ে দিল এবং এই অনুসন্ধান-কাজের নেতৃত্ব অর্পণ করল চার্লস ফিলিপস-এর উপর। ১০ জুলাই ১৯৩৯ সনে একদল প্রত্নতাত্ত্বিক-সহ ফিলিপস স্তূপের আবরণ-উন্মোচন আরম্ভ করলেন। ৯ ফুট খোঁড়ার পরই বোঝা গেল, তাঁদের অনেক আগে কারা যেন ঠিক এই পর্যন্তই খুঁড়ে গেছে। তারা কিন্তু আর বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। হয়ত এই পর্যন্ত খুঁড়েই তাদের মনে হয়ে থাকবে যে, মূল্যবান কিছু এখানে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই—তাই কাজ বন্ধ করে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কাজ বন্ধ করার আগে তারা ৯ ফুট গভীর খাদে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেছিল। তাদের খানাপিনার নিদর্শন—দু-এক টুকরো মাংসের হাড়, খানিকটা ছাই এবং মৃৎপাত্রের একটি



*সার্টন হু জাহাজের দেহাস্তি*

মাত্র টুকরো—রয়ে গেছে ৯ ফুট গভীর সেই স্তরে। মৃৎপাত্রের টুকরোটি সমস্যার সৃষ্টি করল। পরীক্ষা করে বোঝা গেল, এটি ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতকের। ভাঙা মৃৎপাত্রের অন্যান্য অংশগুলি গেল কোথায়? একজন অবশ্য বেশ সন্তোষজনক এক ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন। তিনি বললেন, খানাপিনা হয়েছিল গর্তের ভিতর নয়, উন্মুক্ত আকাশের নিচে, বাইরে—যেখানে আলো-হাওয়া প্রচুর। খাওয়া-দাওয়ার পর উচ্ছিষ্ট ফেলা হল গর্তের ভিতর। একটি মাটির বাসন কারও হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়ে থাকবে। সেটি ছুঁড়ে ফেলা হল নিকটস্থ কোন ঝোপে। একটি মাত্র টুকরো হয়তো কোনমতে উচ্ছিষ্টের সঙ্গে গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে থাকবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এলিজাবেথের আমলে ডাঃ জন ডী নামক এক বিজ্ঞানী (তাঁর নাকি ভুতুড়ে-বিদ্যে জানা ছিল) খননকার্য চালাবার জন্য সরকারের অনুমতি নিয়েছিলেন। হয়তো আজ যাদের কবর-চোর মনে করা হচ্ছে—ডী সাহেবই ছিলেন তাদের পুরোভাগে।

প্রত্নবিদরা জুলাই-এর মাঝামাঝি জাহাজের ঠিক মধ্যভাগে বহু-ঈপ্সিত সমাধি কক্ষটির সন্ধান পেলেন। কক্ষটির একটি কাষ্ঠনির্মিত ছাদ ছিল—সেটি বহু শতাব্দী পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে যায়। তারপর সমস্ত জায়গাটিতে কয়েক প্রস্থ বালি ও মাটির পুরু আস্তরণ পড়ে গিয়েছিল। অতি সন্তর্পণে এই আস্তরণটি সরিয়ে প্রত্নবিদরা যা দেখলেন, তাতে তাঁদের নয়ন সার্থক হল। তাঁরা ধরে নিলেন, এত সব মূল্যবান গয়নাগাটি, বাসনপত্র যাঁর সমাধিতে নিহিত ছিল, তিনি নিশ্চয়ই দেশের রাজা ছাড়া অন্য কেউ নন। প্রথমে চোখে পড়ল ৬ ফুট লম্বা রাজদণ্ড—যার মাথায় ছিল দীর্ঘ শিংবিশিষ্ট হরিণের এক নয়নলোভন ব্রোঞ্জ-মূর্তি। পাশে ছিল রাজ-তরবারি; সেটি দীর্ঘদিন মরচে পড়ে খাপের সঙ্গে এমনভাবে আটকে গিয়েছিল যে, শত চেষ্টাতেও কোষমুক্ত হল না। রাজদণ্ড, তরবারি ও পরিশেষে রাজার শিরস্ত্রাণ। শিরস্ত্রাণটি একটি অপূর্ব নিদর্শন—লৌহনির্মিত হলেও এর নাকের কাছটা ব্রোঞ্জের তৈরি, মুখের কাছটা সোনার জল করা এবং চূড়া রৌপ্যনির্মিত। যত লম্বা চওড়া মানুষই হোক না কেন, এই শিরস্ত্রাণ সকলে নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে পারত না। এটির আকার বিরাট। নিচে প্যাড দিয়ে তবেই হয়তো রাজারা ব্যবহার করতেন এই শিরস্ত্রাণ। রাজার অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একটি কাষ্ঠনির্মিত ঢাল পাওয়া গেল—যাকে আগে ভুলক্রমে একটি গোলাকৃতি ট্রে বলে মনে করা হয়েছিল। যা সকলকেই বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল, তা হল অ্যাংলো-স্যাকশন যুগের অলঙ্কারাদির নিদর্শন। ঘোড়া চড়বার সরঞ্জাম, আংটি, বোতাম ইত্যাদি নিয়ে সবসুদ্ধ ১৭টি বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কার পাওয়া গেল—যেগুলি রাজা নিত্য ব্যবহার করতেন। তাছাড়া, রত্নখচিত বহুমূল্য একটি থলেতে পাওয়া গেল ৩৭টি মেরোভিনজিয়ান স্বর্ণমুদ্রা। মুদ্রাগুলিতে বৎসরের উল্লেখ থাকায় পণ্ডিতদের পক্ষে সাটন হু-র জাহাজ-সমাধির সঠিক সময় নিরূপণ করা সম্ভব হল। দর্শকদের ভিড়ে খননকার্যের ব্যাঘাত ঘটছিল। দর্শকদের মধ্যে অনেকেই আবার ভি আই পি—তাঁদের



*অ্যাংলো স্যাকশন রাজার শিরস্ত্রাণ*

কৌতূহল মেটাতে মিসেস প্রেটি ব্যতিব্যস্ত হলেন। তবু খননকার্য যথারীতি চলতে থাকল। অগাস্টের প্রথমে আরও কিছু পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল। এবারকার জিনিসগুলি সবই রাজার রন্ধনশালা সম্পর্কিত—যথা, ১০টি রুপোর বাটি, দুটি রুপোর চামচ, একটি ব্রোঞ্জের ডেকচি এবং পশুর শিঙ-এ তৈরি সুন্দর দু'টি পানপাত্র। এরই সঙ্গে ঈজিপ্টের তৈরি সুন্দর একটি বাটি এবং বাইজানটাইন সাম্রাজ্য থেকে আনা রুপোর থালা। শেষের দুটি জিনিস দেখে মনে হয়, 'ইমপোরটেড' জিনিসের কদর আজকের মত সে যুগেও ছিল। চামচ দুটিতে নাম খোদাই করা আছে—একটিতে 'সল', অপরটিতে 'পল'। প্রশ্ন এই যে, প্যাগান রাজার রান্নাঘরে খ্রিস্টান নাম লেখা চামচ এল কেমন করে? এর কোন সুদুত্তর দিতে পারেননি প্রত্নবিজ্ঞানীরা।

আবিষ্কৃত এই নিদর্শনগুলি যে অ্যাংলো-স্যাকশন রাজার বিষয়-বৈভবের পরিচয় বহন করছে, তিনি কে? তাঁর মরদেহটিই বা ঠিক কোথায় স্থাপন করা হয়েছিল? বাসনপত্র বা গয়নাগাটিতে এমন কিছু লিপি উৎকীর্ণ ছিল না, যার সাহায্যে রাজার নাম-ধাম জানা সম্ভব হবে। পণ্ডিতদের দৃঢ় ধারণা, রাজার মৃতদেহকে জাহাজের কোন অংশে স্থাপন করা হয়নি। মেরোভিনজিয়ান স্বর্ণমুদ্রায় যে তারিখ দেওয়া ছিল, তারই ভিত্তিতে সাটন হু-র রত্নভাণ্ডারকে খ্রিস্টীয় ৬৫০-৬৭০-এর মধ্যে ফেলা চলে। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সবসুদ্ধ তিনজন রাজা পর-পর ঈস্ট অ্যাঙ্গলিয়াতে রাজত্ব করেন—অ্যানা (মৃত্যু ৬৩৩ খ্রিঃ) এথেলহেয়ায় (মৃঃ ৬৫৪ খ্রিঃ) এবং এথেলওয়েলড (মৃঃ ৬৬২ খ্রিঃ)। এঁদের মধ্যে প্রথম রাজা অ্যানা খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বী—মৃত্যুর পর তাঁকে ব্রিথবার্গে সমাহিত করা হয়। প্যাগান প্রজারা হয়তো তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে সাটন হু-তে তাঁর জাহাজটি সমাধি দিয়ে থাকবে। কিন্তু পণ্ডিতদের অনুমান, সাটন হু-র অজ্ঞাত রাজা হচ্ছেন এথেলহেয়ার। এথেলহেয়ার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেননি। তিনি মার্সিয়ার প্যাগান রাজা পেণ্ডার হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে রিভার উইনঈডের যুদ্ধে নিহত হন। ঐতিহাসিক বীড লিখছেন, বহু সৈন্য জলে ডুবে মারা যায়। রাজা এথেলহেয়ারেরও হয়তো সলিল-সমাধি হয়ে থাকবে—কেননা তাঁর মৃতদেহটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি যুদ্ধের শেষে। প্রজারা যখন রাজার দেহটিকে খুঁজে পেল না, তখন প্রভুর সম্মান-রক্ষার্থে তারা তাঁর জাহাজটিকেই সমাধি দিল অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে।

সাটন হু-র টিলায় জাহাজের ছাঁচটি পড়ে রইল—তাকে কোন প্রকারে মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করা গেল না। লোকে যতটা গয়নাগাটির, থালাবাসনের তারিফ করল, আসল জাহাজকে ততটা নয়। বাস্তবে যে জাহাজের কোন অস্তিত্বই নেই, তার মর্ম পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া আর কে বুঝবে। এই শতাব্দীতে উত্তর-ইউরোপে নরওয়ে ও সুইডেনে মাটি খুঁড়ে কয়েকটি ভাইকিং জাহাজের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলিকে চোখে দেখে ভালমন্দ বিচার করা চলে। দু'টি এমন জাহাজ খুব প্রসিদ্ধ—ওসবার্গ শিপ (৮০০-৯০০ খ্রিঃ) এবং

গকস্ট্যাড শিপ (৯৫০ খ্রিঃ)। দ্বিতীয় জাহাজের অনুরূপ এক মডেল তৈরি করে ১৮৯৩ সালে কয়েকজন দুঃসাহসী ব্যক্তি ২৮ দিনে অ্যাটলান্টিক পার হয়েছিলেন। সাটন হু-র জাহাজটি ভাইকিং জাহাজ নয়। এটি অ্যাংলো-স্যাকশন যুগের। মাটির ওপর যে ছাপ পড়েছিল, তা থেকে প্রত্নবিদরা আসল জাহাজটির স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কোন খুঁটিনাটি বিবরণ তাঁরা বাদ দেননি। জাহাজটির আসল দৈর্ঘ্য ৮৯ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট। জাহাজটি বহুবার সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে এবং যে সময় তাকে সমাধিস্থ করা হয়, সে সময় সে বয়সের ভারে জীর্ণ। যৌবনকালেও যে তাকে দু-একবার সারাতে হয়েছে, তার প্রমাণ পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। জাহাজে কোন পাল বা মাস্তুল ছিল না। ৩৮ জন দাঁড়ি, দাঁড় টানত এবং জাহাজে তাদের বসবার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সমুদ্রের উপকূল থেকে সাত মাইল দেশের অভ্যন্তরে টেনে এনে এক বাত্যাবিক্ষুদ্ধ টিলার উপর একে সমাধি দেবার কি কারণ বোঝা গেল না। এমন হতে পারে যে, কাজের সুবিধার জন্য ডেবেন নদীতে জাহাজটিকে ভাসিয়ে দেশের ছয় মাইল ভিতরে নিয়ে আসা হয়। তারপর দড়ির সাহায্যে একে একশ ফুট উঁচু টিলার ওপর টেনে তোলা হয়। সেখানে আগে থেকেই সমাধি দেবার জন্য একটি খাদ কেটে রাখা হয়েছিল।

সাটন হু-র রত্নভাণ্ডারকে ভালমতো রক্ষা করতে হলে সরাসরি তাকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাঠানো দরকার। কিন্তু এই রত্নভাণ্ডারের উপর আইনসঙ্গত অধিকার কার, এই নিয়ে এক জটিল প্রশ্নের উদয় হল। ইংলন্ডের আইন অনুযায়ী প্রত্নবস্তু যার জমিতে পাওয়া যাবে, ন্যায়সঙ্গতভাবে তারই অধিকারভুক্ত হবে। কিন্তু নিদর্শনগুলির মধ্যে সোনা-রুপার কিছু থাকলে 'ট্রেজার ট্রোভ'-এর আইন অনুযায়ী সরকার নিজস্ব বলে দাবি জানাতে পারেন। গুপ্তধন হিসাবে কেউ যদি সোনা-রুপা মাটিতে পুঁতে রাখে, তবে তা তারই প্রাপ্য এবং তাকে না পেলে, তার বংশধরদের। একঘড়া মোহর বা এক বাক্স গিনি যদি কেউ আবিষ্কার করে, তবে তার সম্ভাব্য দাবিদারকে খুঁজে বার করার অর্থ আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নিদর্শনের দাবিদারকে খুঁজে বার করবে কে? আইনগত এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ১৪ অগাস্ট, ১৯৩৯-এ সাটন হু-র টাউন হলে ১২জন জুরি-সহ করোনার এক বিচার-সভা বসালেন। এখানে বিখ্যাত প্রত্নবিদরা সকলেই নিজ-নিজ বক্তব্য রাখেন। সমাধি-কক্ষের সোনা-রূপার নিদর্শনগুলির প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে যখন খুঁজে পাওয়া সম্ভব হল না, তখন করোনা রায় দিলেন, সাটন হু-র সম্পদের ওপর একমাত্র মিসেস প্রেটিরই ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, অন্য কারও নয়। এর পর মিসেস প্রেটি অনায়াসে নিদর্শনগুলি বাড়িতে এনে, এগুলি দিয়ে ড্রয়িংরুম সাজাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে সাটন হু-র অনুপম নিদর্শনগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের হাতে তুলে দিয়ে সমগ্র জাতির শ্রদ্ধাভাজন হলেন।

---

# কেনসিংটন স্টোনের রহস্য

১৮৯৮ সালে গ্রীষ্মকালের এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত পশ্চিম-মিনেসোটার ছোট শহর কেনসিংটনে, ওলাফ্ ওম্যান নামক এক অবস্থাপন্ন চাষী তার ক্ষেত-খামারে চাষবাস দেখছিল। খামারের এক ধারে বড়-বড় গাছ জন্মেছিল বলে চাষের জমি অনেকটা নষ্ট হচ্ছিল। জংলা জায়গাটা পরিষ্কার করতে হবে মনে করে সে গাছ উপড়াতে আরম্ভ করল। এক সময় হঠাৎ উপড়ে-ফেলা একটা গাছের গুঁড়ির নিচে চৌকো মত একটা বড় পাথর উঠে এল। গাছের শিকড়ে পাথরটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। প্রথমটা পাথরের দিকে ওলাফের নজর পড়েনি। কিন্তু তার দশ বছরের ছেলে যখন এর মসৃণ দিকটা রুমাল দিয়ে মুছে তার সামনে তুলে ধরল, তখন সে বেশ একটু অবাক হল। পাথরের ঐদিকে আঁকাবাঁকা রেখার আঁচড়—কেউ যেন কিছু লিখে রেখেছে। দাগগুলির কি অর্থ কিছুই বুঝল না ওলাফ। এরই মধ্যে দু-একজন পাড়া-পড়শি এসে জুটেছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক যে সে বলল, তার মতে কোন রেড ইনডিয়ান দস্যু এই জায়গায় গুপ্তধন পুঁতে রেখেছিল, পাথরটি হচ্ছে তারই নিশানা। এর পর অনেকে মিলে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করল, কিন্তু গুপ্তধনের কোন সন্ধান শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পাথরটি নিয়ে যথেষ্ট হৈ-চে পড়ে গেল ছোট শহর কেনসিংটনে। এটিকে দেখতে দলে-দলে লোক আসতে লাগল ওলাফের ফার্মে। দর্শকদের মধ্যে পড়াশুনা জানা এক প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বললেন, এ জাতীয় শিলালিপির চিত্র তিনি স্ক্যান্ডিনেভিয়া সংক্রান্ত কোন বই-এ দেখেছেন এবং হয়তো এটি রুনিক লিপিতে লিখিত—যা এক-সময় উত্তর-ইউরোপের টিউটনিক জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা ব্যবহার করত। এঁরই নির্দেশে কালবিলম্ব না করে শিলালিপির একটি কপি পাঠানো হল মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রেডার কাছে। প্রায় দু'মাস চেষ্টার পর ব্রেডা শিলালিপির পাঠোদ্ধার করলেন। সব কথার অর্থ তিনি ভালভাবে না বুঝলেও, মোটামুটি যা বুঝেছিলেন, তার ভাবার্থ এইরূপ—'সুইড ও নরওয়েজিয়ান আমরা ক'জন ভিনল্যান্ড থেকে পশ্চিম দিকে আবিষ্কারের অভিযানে বেরিয়েছিলাম। এই পাথরের নিকটে একটি হ্রদের ধারে আমাদের ক্যাম্প পড়েছিল। একদিন মৎস্য-শিকার সেরে আমরা যখন ক্যাম্পে ফিরি, তখন দেখি আমাদের দশজন সঙ্গী রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে আছে। আভে মারিয়া আমাদের অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করুন'।

মিনেসোটার সংবাদপত্রে শিলালিপির ভাবার্থ ছাপা হলে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চারিত হল। অনেকেই ব্রেডাকে এ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

শেষে একটি প্রেস কনফারেন্স ডেকে ব্রেডা এই শিলালিপির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে খোলাখুলি নিজস্ব মত ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, দু'টি কারণে কেনসিংটন স্টোনের সত্যতা সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান। প্রথমত, ভিনল্যান্ড থেকে পশ্চিমাভিমুখে যত অভিযান হয়েছে, তার মধ্যে সুইড ও নরওয়েজিয়ানরা একই সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে, এমন ঘটনা বিরল। দ্বিতীয়ত, শিলালিপির ভাষাটিও নর্থমেনদের ভাষা, 'ওলড নর্স' নয়। এটি ইংরেজি, সুইডিশ ও নরওয়েজিয়ান ভাষার এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। ১১ শতকের কোন ভিনল্যান্ডীয় অভিযান-কাহিনী এরূপ সংমিশ্রিত ভাষায় লিখিত হবে এটা প্রায় অবিশ্বাস্য।

কেনসিংটন স্টোনের রহস্য জানতে গেলে মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এই নর্থমেন কারা এবং কোথায় তাদের ভিনল্যান্ড। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর-ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে দুর্ধর্ষ নর্থমেনদের আবির্ভাব। নর্থমেন, নর্সমেন, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বা ভাইকিং— নানা নামে অভিহিত ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের একদল টিউটন অধিবাসী সমুদ্রপথে লুঠতরাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের হিংস্র স্বভাব ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী উত্তর ইউরোপের শান্তিপ্রিয় নরনারীর মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। এদের দৌরাত্ম্যে ইংলন্ডের জনজীবন কতদূর বিপর্যস্ত হয়েছিল, অ্যাংলো-স্যাকশন যুগের ইতিহাস পড়লে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আলফ্রেডের আমলে ইংলন্ডের একাংশ দখল করে এরা নাম দেয় 'ডেন্‌-ল' আর ফ্রান্সের উত্তরে গল প্রদেশ এদের দখলে এসে নিজের পরিচয় বিসর্জন দিয়ে হয়ে যায়, 'নরম্যান্ডি' বা নর্থমেনদের ঘাঁটি। কালক্রমে নর্থমেনরা সুদূর উত্তরে আইসল্যান্ড ও গ্রীনল্যান্ডে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১১ শতকে তারা আইসল্যান্ড থেকে উত্তর-আমেরিকার পূর্ব উপকূলে পৌঁছে যায়। নর্থমেনদের গাথা-উপগাথায় যে 'ভিনল্যান্ড' নামক দেশের উল্লেখ আছে, তা সম্ভবত আমেরিকার উত্তর-পূর্বে নিউ ইংলন্ড বা নিউফাউন্ডল্যান্ডের উপকূল ভাগের অংশবিশেষ। এখানে নর্থমেনরা স্থায়ী কোন উপনিবেশ স্থাপন করতে পেরেছিল কিনা, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোন উপনিবেশ থাকলেও, ১৪৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা আগমনের অনেক পূর্বেই তা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। নর্থমেনদের আমেরিকা-আবিষ্কারের কাহিনী প্রাচীন আইসল্যান্ডীয় গাথা-উপগাথায় বর্ণিত হয়েছে এবং কেউ-কেউ মনে করেন, কলম্বাস ১৪৭৭ সালে সুদূর উত্তরের এই দ্বীপে এসেই পশ্চিমে অবস্থিত একটি অজ্ঞাত মহাদেশের কথা শুনে থাকবেন। সাম্প্রতিককালে প্রত্নতাত্ত্বিকরা খননকার্য চালিয়ে উত্তর নিউফাউন্ডল্যান্ডে একটি ভাইকিং ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছেন।

কেনসিংটন স্টোন যদি সত্যি হয়, তবে ধরে নিতে হবে কলম্বাসের প্রায় একশ বছর আগে স্ক্যানডিনেভিয়ান অভিযাত্রী দল আমেরিকা মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। বেশির ভাগ আমেরিকান ঐতিহাসিক কিন্তু এই শিলালিপিকে এতটা গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অধ্যাপক ব্রেডার মতামত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর

সকলেই ধরে নিলেন, কেনসিংটন স্টোন সর্বৈব জালবস্তু। সবচেয়ে বেশি বিব্রত বোধ করল বেচারী ওলাফ্—যার ফার্মে প্রথম এটি আবিষ্কৃত হয়। গভীর আত্মগ্লানিতে এটি সে তার শস্যভাণ্ডারের দোরগোড়ায় ফেলে রাখল এবং পরবর্তী ন'বছর সিঁড়ির ধাপের মত, ওঠানামার কাছে এটি ব্যবহার হতে থাকল। তাছাড়া, সহিসরা বাঁকা পেরেক এর উপরে রেখে ঠুকে সোজা করত, ছেলেরা শানাত তাদের পেনসিল কাটার ছুরি। ভাগ্যক্রমে লিখিত অংশ নিচের দিকে থাকায়, আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলির কোন ক্ষতি হয়নি।

কেনসিংটন স্টোনের কথা লোকে ভুলেই যেত, যদি না হলমার হল্যান্ড নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি এর খোঁজে কেনসিংটনে আসতেন। নরওয়েজিয়ান ঔপনিবেশিকদের আমেরিকা আগমনের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন তিনি। তথ্য সংগ্রহের আশায় তিনি কেনসিংটনে উপস্থিত হয়ে পাথরটি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন। প্রথমেই তিনি আসেন ওলাফ ওম্যানের কাছে। ওলাফ মনে-মনে বিরক্ত হয়েছিল। পাথরটি যখন জালই প্রমাণিত হয়েছে, তখন তা নিয়ে এত হৈ-চৈ কেন? তবু একজন ঐতিহাসিক যখন আগ্রহ-সহকারে সব দেখতে-শুনতে এসেছেন, তখন ওলাফ তাঁকে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সব দেখাল। হল্যান্ড দেখলেন, পাথরটির তেমন কোন আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নেই। ৩১ × ১৬ ইঞ্চি মাপের কালো রঙের মামুলি পাথর—ছয় ইঞ্চি পুরু এবং ওজন ৯১ কেজি। পাথরের গায়ে একদিকে স্পষ্ট ২১০টি অক্ষর—যার মধ্যে মোট ৬২টি ফুটকি, যা দিয়ে যতিচিহ্ন বোঝানো হচ্ছে। ওলাফকে বলে এটি বাড়ি আনলেন হল্যান্ড এবং তারপর দীর্ঘদিন এটি পরীক্ষা করে দেখলেন। কয়েক বছর পরিশ্রমের পর তিনি এই শিলালিপির একটি অনুবাদ প্রস্তুত করেন। মূল বিষয়ে তাঁর অনুবাদের সঙ্গে ব্রেডার অনুবাদের কোন বিশেষ প্রভেদ না থাকলেও এক-বিষয়ে তিনি ব্রেডার চেয়েও ভাগ্যবান। পাথরের একপাশে কয়েকটি চিহ্ন ব্রেডার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। হল্যান্ড বললেন, চিহ্নগুলি সংখ্যাজ্ঞাপক এবং এগুলি ১৩৬২ সনকে বোঝাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এই শিলালিপির ভাষা ওলড নর্স ছিল না বলেই একে প্রাচীন দলিল বলে মেনে নিতে পণ্ডিতদের আপত্তি ছিল। কিন্তু হল্যান্ড তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় প্রমাণ করলেন যে, ১৩৬২-র অনেক আগেই স্ক্যানডিনেভিয়া থেকে ওলড নর্স ভাষা অন্তর্হিত হয়েছিল। তাই তাঁর মতে, ভিনল্যান্ডীয় কোন শিলালিপিতে ওলড নর্স ভাষা খোঁজার চেষ্টা পণ্ডশ্রম হতে বাধ্য। হল্যান্ডের গবেষণা পুনরায় কেনসিংটন স্টোন সম্পর্কে সুধীজনের কৌতূহল জাগ্রত করল। মিনিয়াপোলিস-এ অবস্থিত নরওয়েজিয়ান কালচারাল সোসাইটি এই শিলালিপির সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করল। এই কমিটি সমস্ত বিষয়টি ভাল করে বিচার-বিবেচনা করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। প্রথম সিদ্ধান্ত, হলমার হল্যান্ড-প্রদত্ত সব বিবরণ সত্য। ওলাফ ঠিক যে অবস্থায় শিলালিপির সন্ধান পেয়েছিল, হল্যান্ডের বিবরণে তার যথাযথ বর্ণনা আছে। ওলাফ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি এই পাথরটির আবিষ্কার-ব্যাপারে জড়িত ছিল না। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, কেনসিংটন

গ্রামে লোকবসতির বহু পূর্বে থেকেই যে পাথরটি ভূ-প্রোথিত ছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। তৃতীয় সিদ্ধান্ত, এটি বেশ প্রাচীন। শিলালিপির বহিরাবরণ মসৃণ-গাত্র, ক্ষয়ে-যাওয়া অক্ষর—সবই এর প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করছে।

কমিটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সকল বিষয় অনুসন্ধান করেছিল এবং সেইজন্য এই উপরি-উক্ত তিনটি সিদ্ধান্তে বিশেষ কোন ভুল ছিল না। কিন্তু সন্দেহ থেকে গেল একটি বিষয়ে। অধ্যাপক ব্রেডার মতে, এটি জাল করেছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি স্ক্যানডিনেভিয়ান ও ইংরেজি, উভয় ভাষাতেই বেশ পারদর্শী ছিলেন। কে এই জালিয়াত? ১৮৯৮ সালের মাত্র ৩০ বছর আগে কেনসিংটনে প্রথম জনবসতি শুরু হয়। তাই এখানকার প্রথম অধিবাসীদের মধ্যে মোটামুটি সকলকেই সনাক্ত করা কঠিন ছিল না। প্রথমে ওলাফ ওম্যানের উপরই সন্দেহ পড়ল। কিন্তু মিনেসোটার স্টেট আরকিওলজিস্ট বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানান যে, ওম্যান একজন সৎ নাগরিক—তার বিরুদ্ধে জাল-জুয়াচুরির কোন অভিযোগ টিকবে না। কেউ-কেউ জানালেন, সোয়েন ভোগেলবল্ড নামক এক প্রটেস্টানট পাদ্রী জীবনের শেষ ক'বছর কেনসিংটন গ্রামে কাটান। অবসর সময়ে তাঁর মাথায় দুষ্টবুদ্ধি গজায়, কি করে তিনি ভাবীকালের ঐতিহাসিকদের জন্য একটি গোলকধাঁধা রেখে যাবেন। কেনসিংটন স্টোন সেই দুষ্টবুদ্ধিরই নিদর্শন। কিন্তু প্রমাণের অভাবে ভোগেলবল্ড-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ টিকল না। নিছক ধোঁকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এমন ছলনার আশ্রয় নেবেন, অনেকের কাছে এ যেন অবিশ্বাস্য মনে হল।

কেনসিংটন স্টোনের রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে এবং পণ্ডিতদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ চলছে দেখে ১৯০৯ সনে আবার এক বিশেষজ্ঞের কমিটি আহ্বান করা হল। এতে বড় বড় পণ্ডিত-বিজ্ঞানীরা স্থান পেলেন। ভাষাবিদ, ভূতত্ত্ববিদ, নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নবিদ-প্রভৃতি সকলেই গভীর মনোযোগের সঙ্গে শিলালিপিটি পরীক্ষা করে দেখলেন। সম্ভাব্য সকল দৃষ্টিকোণ থেকে এর সত্যতা যাচাই-এর চেষ্টা চলল। পক্ষে বা বিপক্ষে সকল মতামতকেই এঁরা নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করে দেখলেন। আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁরা রায় দিলেন, কেনসিংটন স্টোন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল—এটি জাল এই অপবাদ কোনমতেই দেওয়া যাবে না। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে এটুকু বলা যায় যে, কেনসিংটন গ্রামে খননকার্য চালিয়ে আমেরিকান প্রত্নবিদ্‌রা পুরাকালের নানা অস্ত্রশস্ত্র-যন্ত্রপাতি-ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিলেন। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত এই পুরাবস্তুগুলি দেখবার সুযোগ পেয়ে হল্যান্ড যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা, মিনেসোটার মাটিতে, এ ধরনের প্রাচীন নিদর্শন খুঁজলে আরও অনেক পাওয়া যাবে। কেনসিংটন স্টোনের সত্যতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁর মতে, ১৮৫০ সনের পূর্বে মিনেসোটায় কোন শ্বেত-অধিবাসী বাস করেননি। প্রথমে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল কেনসিংটন। ১৮৮৬-তে প্রথম

রেললাইন আসে এখানে। তার পাঁচ বছর পর ওলাফ ওম্যান এখানে বসবাস করতে আসে। যদি প্রমাণ করা যায় যে, শ্বেত-অধিবাসীদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই এই পাথর কেনসিংটনের মাটিতে পোঁতা ছিল, তবে এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন হয়। পূর্ব উপকূলের কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি জীবনের মায়া ত্যাগ করে কেবলমাত্র খেয়ালের বশে, সর্প ও রেড ইনডিয়ান অধ্যুষিত মিনেসোটার জঙ্গলে এসে একটি ভুয়া শিলালিপি মাটিতে পুঁতে যাবেন—এমন কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। যে বৃক্ষমূলে শিলালিপিটি প্রথম পাওয়া গিয়েছিল, সেই বৃক্ষটি হল্যান্ড সাহেবের অনুসন্ধানের বিষয় হলে দাঁড়াল। গাছটি বহু পূর্বেই উৎপাটিত হয়েছিল বলে সেটি চাক্ষুষ দেখার কোন উপায় ছিল না। হল্যান্ডের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, ঐ গাছটির বয়স কত? মনে হয় গাছটি যতদিন বড় হতে সময় নিয়েছে ততদিনই প্রায় পাথরটি শিকড়ের নিচে ছিল। গাছটি ছিল সাধারণ অ্যাসপেন-বৃক্ষ, আমেরিকার উত্তর-পূর্বে যা প্রচুর জন্মায়। গাছের বয়স নির্ণয় করা যায় তার গাঁট গুণে-গুণে। প্রতিবছরই গাছের একটি করে গাঁট গজায়। এ জাতীয় গাছ, ফার, বীচ বা ম্যাপেল অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও বিশ-ত্রিশ বছর পর থেকে এদের দ্রুত বাড়বার প্রবণতা কমে আসে। ওলাফ তার ফার্মের একটি গাছ দেখিয়ে হল্যান্ডকে বলেছিল, আসলটির সঙ্গে তার নিকট-সাদৃশ্য আছে। হল্যান্ড এই গাছটিকে উৎপাটিত করে এর বয়স নির্ণয় করার চেষ্টা করলেন। এর গুঁড়ির মাপ ৫.৫ ইঞ্চি এবং গাঁটের গুণতিতে বয়স ৪৩ বছর। আসল বৃক্ষটি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা গেল, গুঁড়ির ব্যাস ৮ থেকে ১০ ইঞ্চির মধ্যে পড়ছে। বিভিন্ন হিসাবে গড় ধরে একটি মাপ পাওয়া গেল ৯.২। যদি ৫.৫ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত শিকড়ের বয়স হয় ৪৩, তবে ৯.২ ইঞ্চি মাপের কোন বৃক্ষের বয়স হবে ৭২ বছর। ১৮৯৮ সনে যে বৃক্ষটির বয়স ছিল ৭২, তার জন্মকাল তবে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে। যেহেতু এই বছরে কোন শ্বেত-অধিবাসী মিনোসোটায় বসবাস করতে আসেনি—তাই ধরে নিতে হবে, তাদের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই পাথরটি ভূ-প্রোথিত ছিল।

হল্যান্ডের লেখা 'ভিনল্যান্ড থেকে পশ্চিমে' বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় এইটিই। কিন্তু যত জোরালো গলায় তিনি নিজ মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন না কেন, কেনসিংটন স্টোন সম্পর্কে সন্দেহের নিরসন আজও হয়নি। খুব সম্প্রতি, ওয়ালগ্রেন নামক এক পণ্ডিত এই শিলালিপির ঐতিহাসিক দাবিকে নস্যাৎ করেছেন। তাঁর মতে, পাঁচশ বছরের জরাজীর্ণ কোন বৃক্ষের শিকড়ে যদি ১৯৫৭ সালের কোন টেলিফোন ডিরেক্টরি আটকে থাকতে দেখা যায়, তবে যে ব্যক্তি নিপুণ হাতে এটি বৃক্ষমূলে পুঁতে গেল তার দক্ষতাকেই প্রশংসা করা চলে—কিন্তু কেউ যদি বলে বসেন, বইটির বয়স পাঁচশ বছর, তবে বুঝতে হবে তিনি কাণ্ডজ্ঞানরহিত।

# মরুসাগরের পুঁথি ও ইসেনী সম্প্রদায়

১৯৪৭ সালে বাইবেলের দেশ—প্যালেস্টাইনে মরুসাগর লিপিমালা আবিষ্কৃত হওয়ামাত্র পণ্ডিতসমাজে এক আলোড়ন পড়ে গেল এবং সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করলেন, এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার বাইবেল-চর্চার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। মহম্মদ আধিব নামক এক বেদুইন যুবক, তার মেষপাল চরাতে গিয়ে পাহাড়ের এক নির্জন গুহায় বৃহৎ কয়েকটি মাটির জালার সন্ধান পায়। প্রথমটা সে খুব ভয় পেয়েছিল। তার ধারণা, সে দৈবাৎ জিনের আস্তানায় এসে পড়েছে—তাই লম্বা ছুট দিয়ে সে নিজের প্রাণ বাঁচাল। রাত্রে সে তার ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা কোন এক বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়কে গল্প করে শোনাল। আত্মীয়টি অনেক চালাক-চতুর। গল্প শুনেই সে বুঝেছিল, কোন জিনের আস্তানা নয়, আসলে আহম্মক ছেলেটা ঈশ্বরের প্রসাদে এক গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। পরের দিন মহম্মদ আধিব তাকে সেই দুর্গম পর্বতগুহায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো—অতি কষ্টে গুহার ভিতর প্রবেশ করে অস্পষ্ট আলোকে সামনে দেখা গেল ৬।৭টি মাটির জালা পর-পর দাঁড় করানো আছে। এগুলির মধ্যে হীরে-জহরৎ সোনা-দানা ছাড়া আর কি থাকবে? আনন্দে ও উত্তেজনায় অধীর হয়ে সে যখন ঢাকনা খুলে ভিতরের ধনরত্ন দেখতে গেল তখন হতাশ হল খুবই। বেশির ভাগ জালাই শূন্য—মাত্র তিনটির মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো বান্ডিল পাওয়া গেল। ন্যাকড়া এত সূক্ষ্ম ও ভঙ্গুর যে, হাত লাগতেই টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছিল। এরকম তিনটি বান্ডিল তারা সবসুদ্ধ সংগ্রহ করল। কোথায় তারা ভেবেছিল, গুপ্তধন পেয়ে রাতারাতি বড়লোক হবে—আর কি জিনিসই তারা শেষ পর্যন্ত পেল। তারা ব্যর্থমনোরথ হয়ে ঘরে নিয়ে চলল পুরানো ন্যাকড়ায় জড়ানো তিনটি বৃহৎ বান্ডিল—যা তাদের কোন কাজেই আসবে না। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভারী ও মোটা যেটি, সেটি খুলে তারা খুব অবাক। লম্বায় সাড়ে সাত গজের এক চামড়ার পাত—তাতে আবার হিজিবিজি কি সব লেখা। পরের দিন তারা বেথলেহেম শহরের এক চর্মব্যবসায়ী, কাত্তোর কাছে এগুলি বিক্রির জন্য নিয়ে এলো। কাত্তো বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সে বান্ডিল খুলেই বুঝে নিয়েছিল এগুলি নিশ্চয়ই কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। তাই বেদুইনদের কাছ থেকে ন্যায্য দামে এগুলি কিনে নিতে তার কোনই আপত্তি ছিল না। যথাসময়ে সে এগুলি পরীক্ষার জন্য নিয়ে এলো সিরীয়ান চার্চের পাদ্রী সাহেবের কাছে। পাদ্রী সাহেবেরা পণ্ডিত ব্যক্তি—তাঁরা হয়তো বিদঘুটে লেখাগুলির মর্মোদ্ধার করে দিতে পারবেন। ধূর্ত ব্যবসায়ী ঠিকই বুঝেছিল যে, বহুমূল্য ঐতিহাসিক নিদর্শন তার হাতে এসে পড়েছে এবং ঠিকমত এর খদ্দের জোটাতে পারলে সে প্রচুর

অর্থের মালিক হতে পারবে। কিন্তু সিরীয়ান চার্চের পাদ্রী সাহেবরা তাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারলেন না। যাতে পাণ্ডুলিপিগুলি ঠিকমত পড়া হয় সেই উদ্দেশ্যে তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে এগুলি পাঠিয়ে দেন হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক ডাঃ সুকেনিকের কাছে। অধ্যাপক সুকেনিক আবার আমেরিকান পণ্ডিত ড. জন ট্রেভরকে পাণ্ডুলিপি দেখান এবং তাঁর মতামত গ্রহণ করেন। একটি পাণ্ডুলিপি দেখামাত্র ট্রেভর সাহেব সেটিকে বুক অব ইশায়া সংক্রান্ত ওল্ড টেস্টামেন্টের খুব প্রাচীন এক পাণ্ডুলিপি বলে সনাক্ত করলেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন একটি প্যাপাইরাসের সঙ্গে তুলনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নবাবিষ্কৃত লিপিমালা এযাবৎ প্রাপ্ত ওল্ড টেস্টামেন্টের যে-কোন পাণ্ডুলিপির চেয়ে অন্তত হাজার বছরের বেশি পুরাতন।

এই আবিষ্কার পণ্ডিতসমাজে অভাবনীয় সাড়া জাগাল। অনেকেরই বিশ্বাস, যে গুহাটিতে বেদুইন যুবক পাণ্ডুলিপিগুলি পেয়েছিল, তার আশেপাশে অনুসন্ধান চালালে হয়তো আরও কিছু প্রত্নসম্পদ পাওয়া যেতে পারে। এই অনুসন্ধান-কাজে অগ্রণী হলেন ফরাসি পণ্ডিত পোর দ্যভো ও প্রত্নতাত্ত্বিক ল্যাংকেস্টার হার্ডিং। তাঁদের এই দুরূহ কাজে সহায়তা করেছিল মরুসাগর-উপকূলের বেদুইন বাসিন্দারা। এদের সুবিধা এই যে, সমস্ত উপকূল অঞ্চলটি এদের নখদর্পণে। কোথায় কোন পাহাড় আছে, কোথায় কোন্ গুহা—এরা যতটা জানে ততটা শহরবাসী শিক্ষিত কর্মীদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অর্থের প্রলোভনেই হোক আর যে কারণেই হোক বেদুইনরা এগিয়ে না এলে মরুসাগর-লিপিমালার অনেকগুলি আমাদের জ্ঞানগোচর হত না। বেদুইনরা তাদের এই চেষ্টা ও উদ্যমের জন্য যথেষ্ট পুরস্কৃত হয়েছে। তারা তাদের মুরুব্বি কান্তো মারফত আবিষ্কৃত লিপি পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়ে দিত। পণ্ডিতরা তা যথেষ্ট দাম দিয়ে কিনে নিতেন। এক বর্গ-ইঞ্চি লিপির জন্য ১৮ পাউন্ড—এই হিসাবে টাকা দেওয়া হত ; বড় ও অখণ্ড কোন লিপির জন্য আলাদা ইনামের ব্যবস্থা ছিল।

মহম্মদ আধিব-কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রথম গুহাটির কিছু দক্ষিণে খিরবাত কুমড়ানের ধ্বংসস্তূপ পণ্ডিতদের কৌতূহল জাগ্রত করেছিল। চারিপাশের ভূমি প্রস্তরাকীর্ণ ঊষর ও রৌদ্রদগ্ধ—মধ্যে-মধ্যে অনুচ্চ পাহাড়, তার মধ্যে মৌচাকের মত একাধিক গুহা। এখানে খননকার্য চালিয়ে প্রাচীন ইসেনী সম্প্রদায়ের উপনিবেশের সন্ধান পাওয়া গেল। প্রথমে তাদের গ্রন্থাগার ও পরে তাদের সংঘারামের সমগ্র গ্রাউন্ড-প্ল্যানটি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিপথে ফুটে উঠল। নবাবিষ্কৃত পুঁথিগুলি যে ইসেনী-সম্প্রদায়ের, পরিচালকরা তাঁদের সদস্যবর্গের শিক্ষা ও চিত্তোন্মেষের জন্য লিপিবদ্ধ করেন, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে বিশেষ আর সন্দেহ রইল না। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের ঐতিহাসিক যোশেফাসের লেখায় ইসেনী সম্প্রদায় সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কেন এই বাত্যাবিক্ষুব্ধ মরুসাগর-উপকূলের অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চলে ইসেনীদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল, তার সম্ভাব্য

কারণ জানিয়েছেন যোশেফাস্। জেরুজালেম শহরের বিলাসব্যসন তাদের নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করতে পারে, এই আশঙ্কায় গোষ্ঠী-পরিচালকরা নাকি মরুপ্রান্তরের এই দুর্গম অঞ্চলে এসে আত্মগোপন করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধন-ভজন ও ঈশ্বর-চিন্তায় যেন ব্যঘাত না ঘটে।

ইসেনীদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানা গেছে। প্রথম কথা, সম্প্রদায়গত-ভাবে এরা স্নান ও আচমনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করত। স্নান, গাত্র-মার্জন, হস্তপদাদি প্রক্ষালন, শান্তিবারি সিঞ্চন-ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শুচিশুদ্ধ হবার বিধি প্রচলিত ছিল। নিত্য স্নান-অবগাহনের মধ্য দিয়ে সবরকম কলুষ-কালিমা ধৌত হোক, এই তাদের অভিপ্রায় ছিল। এজন্য জলের প্রয়োজন ছিল প্রচুর এবং এই চাহিদা মেটাতে এই সংঘারামে একটি পয়ঃপ্রণালী খনন করা হয়। দ্বিতীয়ত, এই সম্প্রদায়ের লোকেরা একত্রে একই ঘরে আহার করতেন। ভোজনের নিমিত্ত প্রতি সন্ধ্যায় তাঁরা এক প্রশস্ত কক্ষে মিলিত হতেন—পাশেই ছিল রান্নাঘর। সেখান থেকে ভোজ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হত। এই রান্নাঘরে অনেক থালাবাসন একসঙ্গে সাজানো অবস্থায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে দেখতে পেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, একটি কক্ষে প্লাস্টার করা টেবিল-বেঞ্চের ভগ্নাবশেষ দেখে সহজেই অনুমান করা গেল, এটি ছিল লিপিকারদের লিখবার ঘর। এখানে বসে তাঁরা পাণ্ডুলিপির খসড়া প্রস্তুত করতেন—এমন কি সম্প্রদায়ের আচরণ-বিধিও তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন। চতুর্থত, গোষ্ঠী-পরিচালকের হাতে ছিল অসীম ক্ষমতা। তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করেছিলেন। কোন ব্যক্তি নিয়ম লঙঘন করলে তাঁকে কঠোর শাস্তি পেতে হত। সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে শুদ্ধাচারী হয়ে ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন থাকতে হত এবং নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে যা বোঝায়, সবই গোষ্ঠীপতির হাতে তুলে দিতে হত। সমস্ত সম্প্রদায়ের ভরণ-পোষণের ভার ছিল তাঁরই উপর। একদিকে তিনি যেমন অর্থের ঝক্কি সামলাতেন, অন্যদিকে তেমনি ভাঁড়ারের চাবিটিও তুলে নিয়েছিলেন স্বহস্তে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, ভক্তবৃন্দ কেউ কুমড়ান সংঘারামে রাত্রিবাস করতেন না। দিনের কাজকর্ম সাধন-ভজন ও ভোজনপর্ব সমাধা করে সন্ধ্যার পর বিশ্রামের জন্য তাঁরা নিকটবর্তী গুহাগুলিতে চলে যেতেন অথবা কোনো তাঁবু-পর্ণকুটিরে। এঁদের মধ্যে সকলেই যে সন্ন্যাসব্রত নিয়েছিলেন তা নয়। কেউ-কেউ গৃহীও ছিলেন। প্রত্নবিদরা সংঘারামের অভ্যন্তরে নারী ও শিশুর অবস্থিতির প্রমাণ পেয়েছেন। যদিও তাঁরা মনে করেন, সংঘারামের ভিতর কয়েকটি স্থানে, যথা—উপসনাগৃহ বা গ্রন্থশালায় তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

কেমন করে ইসেনী সম্প্রদায় পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হল, তার কোন সঠিক বিবরণ ঐতিহাসিক দিতে পারেননি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা রাষ্ট্রবিপ্লব—এই দুই সম্ভাব্য কারণে এরা বিনষ্ট হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে। ৩১ খ্রিঃ পূঃ যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাতেই বোধহয় এদের উপর দারুণ বিপর্যয় নেমে আসে। অপরদিকে এমন প্রমাণও

আছে যার দ্বারা মনে হতে পারে যে, শাসক শ্রেণীর অত্যাচারেই এই সম্প্রদায় নির্মূল হয়েছিল। রোমান সম্রাট হেরড্ এদের সুনজরে দেখতেন না। তাঁর কোপদৃষ্টিতে পড়ে ইসেনীদের নানা অসুবিধা ভোগ করতে হয়। হেরড্ গত হলে ইসেনীরা প্রকাশ্য-বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সেই বিদ্রোহ রোমান সৈন্যরা কঠোর হস্তে দমন করতে এগিয়ে আসে। দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়কারী সংগ্রামে কলুষিত হল পাষাণ বেদি, নিভে গেল মঙ্গলদীপ, স্তব্ধ হল স্তোত্রগীত। ৬৮ খ্রিঃ রোমান সৈনিকরা ইসেনী সংঘারাম দখল করে নেয়। সোমনাথ মন্দির রক্ষাকল্পে হিন্দু ভক্তরা যেভাবে সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে লড়েছিল, সেই ভাবেই ইসেনীরা তাদের সংঘারামকে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সবই বৃথা—একে-একে বীর ভক্তবৃন্দ সকলেই মৃত্যুবরণ করে নিল। এই আক্রমণের কিছুকাল আগে ইসেনীরা তাদের অমূল্য পুঁথিপত্রাদি কোন গোপন নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রেখেছিল। হয়তো তারা ভেবেছিল, তাদের প্রতিরোধ সফল হবে—তারা জয়ী হয়ে আবার ফিরে আসবে এবং পুঁথিগুলি স্বস্থানে নিয়ে যাবে। তাদের এই আশা কিন্তু পূর্ণ হয়নি। তারা পরাজিত হয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল। প্রায় দু'হাজার বছর পর্বত-কন্দরে বৃহৎ জালার মধ্যে বন্দি থাকল অমূল্য পুঁথিগুলি। অবশেষে বিংশ শতকের মাঝামাঝি এক বেদুইন যুবক তাদের কয়েকটির সন্ধান জানাল বিশ্ববাসীকে।

ইসেনী সম্প্রদায়ের এই কাহিনীর সঙ্গে একটি গুরুতর সমস্যা জড়িত আছে বলে কোন-কোন পণ্ডিত মনে করেন। পরিত্রাতা যীশুর জীবন সম্পর্কে এই লিপিমালা নতুন কোন আলোর সন্ধান দেয় কি? ইহুদীদের মধ্যে সুসংবদ্ধ সম্প্রদায় হিসাবে ইসেনী ও আদি খ্রিস্ট সমাজ প্রায় সমগোত্রীয়। প্রথম যুগে খ্রিস্টান চার্চের নেতৃবৃন্দ ইহুদী সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে মনে করতেন না। ইহুদী সমাজপতিরা অবশ্য ইসেনীদের আদৌ পছন্দ করতেন না, এবং খ্রিস্টানদের বিক্ষুব্ধ উপদল হিসাবে গণ্য করতেন। কাজেই উভয় সম্প্রদায় নিজেদের সংখ্যালঘু নির্যাতিত সম্প্রদায় বলে ভাবতে শুরু করে এবং তাদের মধ্যে গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। ইসেনীদের গোষ্ঠীপতির সঙ্গে যীশুর নিকট সাদৃশ্য আছে। লিপিমালায় জনৈক গোষ্ঠী-পরিচালককে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়—এমন নজির আছে। এই ব্যক্তিই কি যীশু? ঈশ্বর-পুত্র যীশু রক্ত-মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ ছিলেন এ কথা রক্ষণশীল খ্রিস্টান পণ্ডিতরা কোন কালেই মানবেন না। তার উপর ইসেনী দলপতির ধ্যান-ধারণা, মনন-চিন্তন যে যীশুর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল, সে কথাও ভুললে চলবে না। প্রথম কথা, যীশু বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে অবাধে মেলামেশা করতেন। অন্য-দিকে ইসেনীরা ছিল অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। তারা নিজেদের ঈশ্বরের বরপুত্র বলে ভাবত—আর তাদের চোখে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল অন্ধকারের শিশু। দ্বিতীয়ত, যীশু দেশের সর্বত্র শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সর্ব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিচরণ করতেন। শহরবাসীদের প্রতি তাঁর কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না,

শহরকে তিনি পাপ ও ব্যভিচারের আকর বলে মনে করতেন না। অন্য দিকে ইসেনীদের সঙ্ঘ পরিচালক ভাবতেন শহরের দূষিত আবহাওয়ায় নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটবেই—তাই তিনি অনুচরদের শহর থেকে বহু দূরে এমন এক নির্জন স্থানে নিয়ে এসেছিলেন, যেখান কোন পাপ তাদের স্পর্শ করবে না। এই দুই প্রধান পার্থক্য-হেতু, নিহত ইসেনী নায়ক ও যীশুকে একই ব্যক্তি বলে মনে করা হয়ত সঙ্গত হবে না।

ত্রিশ বছরের বেশি হতে চলল মরুসাগরের পুঁথিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি বছর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের প্রকাশ হচ্ছে এবং যদিও শেষ কথা কেউ এখনও কিছু বলতে পারছেন না। তবু মনে হচ্ছে, এঁরা রহস্যের অনেকটা কূলকিনারা পেয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে, আরও পাণ্ডুলিপি নাকি বেদুইনদের কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নতুন আবিষ্কারের ফলে আলোচনার ধারায় পরিবর্তন ঘটতে পারে—হয়তো নতুন আলোর সন্ধান পেলে বিশ্লেষণের কাজটা সহজতর হবে। খ্রিস্টান-সমাজের উৎপত্তি ও মধ্যপ্রাচের সুদূর অতীত—এই দুই বিষয়ে মরুসাগর-লিপিমালা আলোর সন্ধান দিয়েছে এবং আমাদের দৃঢ় ধারণা, ভবিষ্যতে গবেষকদের কাছ থেকে আরও আলো পাওয়া যাবে।

---

# প্রত্নতত্ত্বে কার্বন-১৪ পরীক্ষা

পুরাবস্তুর কাল-নির্ণয় প্রত্নতাত্ত্বিকের একটি প্রধান দায়িত্ব। কাজটি কিন্তু আদৌ সহজ নয়। নবাবিষ্কৃত কোন পৌরাণিক নিদর্শনের বয়সকাল সম্পর্কে যখনই কোন প্রশ্ন প্রত্নবিদের কাছে উত্থাপিত হয়, তখনই তিনি সবচেয়ে দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হন। কাল নিরূপণের জন্য এ যাবত তিনি নানা প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছেন। প্রথমে তিনি পুরাবস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে বিচার করে তার বয়স সম্বন্ধে একটি সম্ভাব্য হিসাবে পৌঁছতে চান। তার পর চলে প্রত্ননিদর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। স্তর বিন্যাস, সাগর-পৃষ্ঠের পরিবর্তন, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, শিলার গঠন-প্রভৃতি লক্ষ করে প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক সময়ে সঠিক সময় নিরূপণ করতে পারেন। অতীতে কেবলমাত্র স্তর-বিন্যাসের উপর নির্ভর করেই সন-তারিখ আরোপ করা হত। কিন্তু এ ধরনের কাল-নির্ণয়ে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। আধুনিক গবেষকরা তাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে আরও নির্ভুল হিসাবে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। এজন্য তাঁরা বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা—জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব-প্রভৃতির সাহায্য নেন। ১৯৩৭ সালে উদ্ভিদ ও পরাগ বিশ্লেষণ করে লেনার্ট কাল-নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, ১৯৫১ সালে বৈজ্ঞানিক ওকলে হাড়ের ফ্লুরিন-বস্তু পরীক্ষা করে সময়-নিরূপণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। কিন্তু এইসব বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকাণ্ডকে ম্লান করে দিয়েছে নবাবিষ্কৃত কার্বন-১৪ পরীক্ষা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে পরমাণু বিজ্ঞান নিয়ে যে বহুমুখী গবেষণা চলেছে, তারই ফলশ্রুতি-স্বরূপ এই অতীত অনুসন্ধানের পদ্ধতিটিকে আমরা লাভ করেছি। ফলে, পৃথিবীর নবীন-বিজ্ঞান-বিষয়, আণবিক শক্তির সঙ্গে মেল-বন্ধন রচিত হয়েছে পৃথিবীর প্রাচীনতম শাস্ত্র প্রত্নবিজ্ঞানের।

রেডিও-কার্বন-ডেটিং পদ্ধতির আবিষ্কর্তা উইলার্ড লিবি কালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরমাণু-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন সরকার তাঁকে অ্যাটম বোমা তৈরির ব্যাপারে মানহাটান্ প্রকল্পে নিযুক্ত করেন। এই কাজ করতে-করতে লিবি জৈববস্তুতে তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ নির্ণয় করার বিষয়টি সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। ১৯৫৫ সালে তিনি তাঁর গবেষণা-পত্রে জানান যে, জৈব-পদার্থে রেডিও-তরঙ্গ বিকিরণের পরিমাণ স্থির করে বস্তুর বয়সকাল নির্ণয় করা সম্ভব। যদিও তাঁর হিসাব একেবারে নির্ভুল নয় এবং যদিও এতে বেশ কিছু বছরের গরমিলের সম্ভাবনা এড়ানো যায় না—তবুও এই অভিনব পদ্ধতি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার এক নবদিগন্তের

সূচনা করল। লিবির কাজ পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত হল এবং ১৯৬০ সালে এই যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন।

বৈজ্ঞানিক বলেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মহাকাশ-রশ্মি ও নাইট্রোজেন পরমাণুর সংঘাতে তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ নিত্যই সৃষ্ট হচ্ছে। আবহমণ্ডলে সঞ্জাত এই কার্বন-১৪ প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ই আত্মসাৎ করে। উদ্ভিদ আবহাওয়া থেকে এই কার্বন সংগ্রহ করে এবং প্রাণীরা ঘাস-পাতা, ফল-মূল ভক্ষণ করে বলেই সেই কার্বন তাদের দেহেও প্রবেশ করে এবং সেখানে জমা হতে থাকে। যতদিন প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে জীবন থাকে ততদিন এই কার্বন-গ্রহণ প্রক্রিয়াও থাকে অব্যাহত। মৃত্যুতে এই প্রক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি। তারপর যত দিন যায় কার্বন-১৪ বস্তু ও প্রাণীর অবয়ব থেকে নিঃসৃত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালে উইলার্ড লিবি মৃত-জৈবপদার্থে কার্বন-১৪র পরিমাণ স্থির করে, কবে তার মৃত্যু ঘটেছিল বার করতে সচেষ্ট হন। গবেষণাগারে খুব সতর্ক পরিমাপের ফলে দেখা গেল, প্রতি ৫৫৬৮ (± ৩০) বছরে কার্বন-১৪র পরিমাণ ঠিক অর্ধেকে নেমে আসছে। গড়পড়তা হিসাবে প্রতি মিনিটে জৈবপদার্থের অন্তঃস্থ কার্বন থেকে ১৫.৩ + ০.১ বিভাজন পাওয়া যায়। কোন প্রত্নবস্তু (সেটি মিশরের ম্যমিই হোক আর মোহেঞ্জোদড়োর বৃক্ষ-মূলই হোক) যদি ১৫.৩-এর স্থলে ৭.৬৫ কার্বন-বিভাজন নিঃসরণ করে, তবে ধরে নিতে হবে প্রত্নবস্তুর বয়স ৫৫৬৮ (বা কম-বেশি ৩০) বছর। প্রত্নবস্তুতে যদি সিকি ভাগ কার্বন পাওয়া যেত তাহলে ঐ হিসাবে তার বয়স দাঁড়াত ১১,১৩৬ (বা কম-বেশি ৩০) বছর। কার্বন-১৪র ভাগ কমতে-কমতে এমন এক ভাগে নেমে যেতে পারে যা থেকে ৪০ হাজার বছরের হিসাব পাওয়া সম্ভব। তার নিচে নামলে, পরিষ্কার কোন হিসাব পাওয়াই শক্ত হবে। এক খণ্ড অঙ্গার বা দগ্ধ অস্থিকেই লিবি কাজে লাগাতে পেরেছেন, অজৈব কোন পদার্থকে নয়।

১৯৪৮ সালে চারজন প্রখ্যাত প্রত্নবিদ লিবির গবেষণা-কাজ দেখতে এলেন। প্রয়োজনমত সাহায্য করবেন সেই অভিপ্রায়ও তাঁদের ছিল। মোটামুটি বয়স-কাল জানা আছে এমন সব প্রত্ননিদর্শন তাঁরা লিবির পরীক্ষাগারে নিয়ে এলেন। সেগুলির মধ্যে ছিল মিশরের মন্দির, ব্যবিলনের শবাধার ও রোমান শিবির থেকে আনীত পুরাবস্তু। কার্বন-১৪ পরীক্ষাটি খুবই এক জটিল প্রক্রিয়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সহিষ্ণুভাবে দাঁড়িয়ে লিবি তাঁর পরীক্ষাগুলি সহকর্মীদের বিশদভাবে দেখালেন ও বোঝালেন। তাঁর পদ্ধতিতে যে বয়স নির্ধারিত হল তা প্রত্নতাত্ত্বিকদের আনা প্রত্নবস্তুর বয়সের সঙ্গে মোটামুটি মিলে গেল। লিবির এই আবিষ্কার প্রত্নতাত্ত্বিকদের মহলে সাড়া জাগাল। বিশ্বের দূরদূরান্ত থেকে পণ্ডিতরা পরীক্ষার জন্য লিবির কাছে নিদর্শনের নমুনা পাঠাতে শুরু করলেন। এই সময়ে তাঁদের মধ্যে পোড়া কাঠ বা কয়লার টুকরো সংগ্রহ করার যে নেশা দেখা দিয়েছিল তা লক্ষ্য করে এক সাংবাদিক রহস্য করে লেখেন যে, প্রত্নতাত্ত্বিকদের রকম দেখে মনে

হচ্ছে, তাঁর যেন রূপকথার রাণির সাতনরী হারের হারিয়ে যাওয়া মুক্তোটি উদ্ধার করতে আঁস্তাকুড় ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন। দেখতে-দেখতে লিবির গবেষণাক্ষেত্র শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আমেরিকার অন্যান্য প্রান্তেও কার্বন-১৪ পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার খোলা হল। কেম্ব্রিজ ও কোপেনহাগেনও পিছিয়ে থাকল না। বর্তমানে ভারতে টাটা ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার গবেষণায় কার্বন-১৪ নিরূপণের ব্যবস্থা হয়েছে।

কার্বন-১৪ পরীক্ষার সাহায্যে প্রত্নবিদ্ নানাবিধ জটিল প্রশ্নের সদুত্তর পেয়েছেন—অনক নূতন তথ্যও তাঁর জ্ঞানগোচর হয়েছে। কারও কি জানা ছিল যে, ৯ হাজার বছর পূর্বে উত্তর আমেরিকায় এমন এক শ্রেণীর লোক বাস করত, বেতের আসবাবপত্র তৈরির কাজে যাদের জুড়ি মেলা ভার ছিল? দ্বিতীয়ত, ১৯ হাজার বছর আগে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ ভূখণ্ডের অনেকটাই যে তুষারাবৃত ছিল একথা ভূতত্ত্ববিদ আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু সেই পুরাতন তথ্যেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল কার্বন-১৪ পরীক্ষাতে। তৃতীয়ত, কতকগুলি বিতর্কিত সময়-সীমা সম্পর্কে বিবাদের নিষ্পত্তি হল। প্রত্নবিদ নিঃসন্দেহে জানালেন যে, দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রস্তর-নির্মিত জিমবাবওয়ে প্রাসাদটির নির্মাণকাল কিছুতেই ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের আগে নয় এবং ব্যবিলনের রাজা হামুরাবি (পৃথিবীর প্রথম আইন-প্রণেতা হিসাবে যিনি সম্মানিত হন) সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৭৫০ খ্রিঃ পূর্বে। সর্বশেষে এই কার্বন-১৪ পরীক্ষার সাহায্যে প্রাচীন ব্যবিলন ও মায়া দিনপঞ্জির সঙ্গে অধুনা প্রচলিত খ্রিস্টান দিনপঞ্জির একটা সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

উনবিংশ শতকে প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস ও ক্লাসিক্সের অঙ্গীভূত ছিল—রোমান্সের গন্ধ ছিল তার সর্বাঙ্গে। বর্তমান শতকে প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে—কার্বন-১৪ পরীক্ষা ভালভাবেই প্রমাণ করেছে, পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা কিভাবে প্রত্নবিদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। এ যুগে প্রত্নতত্ত্ব আর স্লীম্যানের মত শৌখিন বড়লোকের খেয়াল-খুশির বিষয় নয়, বা সার্কাসের মল্লবীর বেলজোনীর মত শক্ত হাতের কাজও নয়—এই শাস্ত্রকে এখন বিজ্ঞান-বিষয়ক অন্যান্য শাস্ত্রের মত গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করতে হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ধাপে-ধাপে এগুতে হয়। কার্বন-১৪ পরীক্ষা প্রত্নতত্ত্বের এক নবদিগন্তের ইঙ্গিত দিলেও আমাদের মনে রাখতে হবে, এই পদ্ধতি যে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন সে কথা কেউ বলেন না। যে প্রত্নবস্তু ৪০ হাজার বছরের বেশি পুরাতন, তাকে এই পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, এর দ্বারা জৈব পদার্থ বিশ্লেষণেই সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাচ্ছে—অজৈব পদার্থ, যেমন গয়নাগাঁটি, পাথুরে অস্ত্র, ধাতুনির্মিত যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে নিয়ে আদৌ কোন পরীক্ষা চলছে না। কোন-কোন ক্ষেত্রে কয়েক শত বছরের গরমিলও দেখা দিচ্ছে—যাকে নগণ্য ত্রুটি বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

---

# প্রত্নতত্ত্বে অতিপ্রাকৃত

অতিপ্রাকৃত বা অপার্থিব শক্তি সময়-সময় প্রত্নতাত্ত্বিককে অনেক দুরূহ ও জটিল সমস্যার সমাধান বলে দিয়েছে—এমন ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, তার অস্তিত্বকে বিজ্ঞান-সেবী আধুনিক পণ্ডিত আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁদের ধারণা, দৈবশক্তি-স্বপ্নাদেশ-প্রভৃতিকে পুরাতত্ত্বের গবেষণায় আমল দিলে তা বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে অতীত-অনুসন্ধানের প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রত্নানুসন্ধানের ক্ষেত্রে এমন সব অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে যা শুনলে ঘোর অবিশ্বাসীর মনে চমক জাগবে, এবং আমাদেরও বলতে ইচ্ছা হবে—'দেয়ার আর মেনি থিংস ইন্ হেভেন অ্যান্ড আর্থ..ইত্যাদি!

নিম্নলিখিত ঘটনা-দুটির কথাই ধরা যাক। বর্ণনা দিচ্ছেন, হারমান হিলপ্রেকট-নামক এক খ্যাতনামা প্রত্নবিদ ও ভাষাবিশারদ। এই জার্মান পণ্ডিত পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিরীয় শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। কিউনির্ফম-লিপি সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি লিখেছেন যে, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের এক সন্ধ্যায় তিনি তাঁর পড়ার ঘরে বসে দুটি দামি পাথরের উপর অঙ্কিত বাণমুখলিপি নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছিলেন। সামান্য দু'ছত্রের লেখা—অথচ সঠিক পাঠ নির্ণয় করাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না—অর্থোদ্ধার দূরে থাকুক। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেরিত একটি খননকারী-দল সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের নানা স্থানে অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। তাদের কাছ থেকেই সম্প্রতি খোদাই করা দুটি দামি প্রস্তরখণ্ডের প্রতিলিপি হিলপ্রেকটের কাছে পৌঁছেছিল। খননকারীদের বিবরণ-পাঠে জানা গেল, মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত প্রাচীন নিপারে দেবতা বেল-এর মন্দিরের কাছে এই মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড-দুটি পাওয়া গিয়েছে—অনুমান হয় কোন ধনী ব্যাবিলনীয় অঙ্গুরীয় হিসাবে এ দুটিকে ব্যবহার করতেন। পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে হিলপ্রেকট যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হলেন। লেখা অস্পষ্ট, লাইনগুলি ভগ্ন ও অসমাপ্ত। এর থেকে কিছুই বোঝার উপায় ছিল না তাঁর। অথচ খননকারীদের আশা, প্রত্নতাত্ত্বিক শীঘ্র এগুলির অনুবাদ তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবেন।

অনেক চেষ্টার পর দুটি পাথরের মধ্যে একটির কিছুটা রহস্য ভেদ হল। পাথরের গঠনাকৃতি ও লিখন-পদ্ধতি পরীক্ষা করে হিলপ্রেকট বুঝলেন, এটি প্রাচীন ব্যাবিলনের ক্যাসাইট যুগের (১৭০০-১১৪০ খ্রিঃ পূঃ) একটি নিদর্শন। অধিকন্তু, এর তৃতীয় লাইনের প্রথম অক্ষরটি হচ্ছে 'কু'। এর থেকে তিনি অনুমান করলেন, শিলালিপিতে রাজা

কুরিগালজুর কথা লেখা আছে। দ্বিতীয় প্রস্তরলিপিটির কোনই অর্থ তিনি খুঁজে পেলেন না। অগত্যা এটিকে তিনি অপঠিত বলে চিহ্নিত করে খাতায় তুলে রাখলেন।

লিপির রহস্য প্রত্নবিদের মনকে খুবই চঞ্চল করে তুলেছিল। সারাদিন তিনি রহস্যোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। অথচ সব চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন প্রায় মধ্য রাত্রে তিনি যখন পড়ার টেবিল ছেড়ে শয়নকক্ষে শয্যা নিতে এলেন তখন তাঁর মনটা বিষাদে ভরেছিল। শরীর বড়ই পরিশ্রান্ত—তা না হলে আরও কিছুক্ষণ হয়তো তিনি চেষ্টা চালাতে পারতেন। শয্যা গ্রহণ করা-মাত্রই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলেন তিনি। ঘুমের ঘোরে তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিবরণ ছবির মত দীর্ঘকাল তাঁর মনে আঁকা ছিল। তাঁর মনে হল, তাঁর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘদেহী এক শীর্ণ সন্ন্যাসী—বয়স যাঁর চল্লিশ বা একচল্লিশের বেশি হবে না। চোখদুটি তাঁর অসাধারণ উজ্জ্বল। তাঁর পরিধানে ছিল জোব্বার মত এক ধরনের পোশাক—যা সে যুগে পুরোহিত সম্প্রদায় পরিধান করতেন। সন্ন্যাসী হাত ধরে তাঁকে বিছানা থেকে টেনে তুললেন—তারপর বহু যোজন পথ অতিক্রম করে নিয়ে এলেন এক মন্দিরের চত্বরে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছিল মন্দিরের রত্ন-ভাণ্ডার। সেখানে এসে তিনি এক অনুচ্চ কক্ষের খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালেন। এই কক্ষে কোন জানালা ছিল না। খোলা দরজা দিয়ে যে সামান্য আলো আসছিল তাতে দেখা গেল, ঘরের মধ্যে আছে ঢাকনা-খোলা এক কাঠের সিন্দুক এবং তার পাশেই মণিমুক্তা, লাপিজ-লাজুলি প্রভৃতি দামি পাথর ছড়ানো। এতক্ষণে সন্ন্যাসী মুখ খুললেন। হিলপ্রেকটকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন,

'আজ সারাদিনই পাথরদুটি তোমাকে হয়রান করেছে। অথচ তোমার ভুলটা ঠিক কোনখানে তা তুমি ধরতে পারছ না। যে পাথরদুটির প্রতিলিপি তুমি তোমার খাতায় ২৪ ও ২৭ পৃষ্ঠায় তুলেছ, তারা আলাদা-আলাদা জিনিস নয়, তারা একই জিনিসের দুটি অংশ। টুকরোদুটি জোড়া দিলে জিনিসটা এক হয়ে যাবে।

'নিপারের রাজা কুরিগালজু এক সময় বেল-এর মন্দিরে নানা প্রস্তরখণ্ড ও অলঙ্কারাদির সঙ্গে দেবতার নামে উৎসর্গ করা একটি শিলালিপি পাঠিয়েছিলেন। যে পাথরের উপর এটি অঙ্কিত হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। এরই সঙ্গে আমরা পুরোহিতেরা রাজার এক আদেশ পেলাম, ভগবান নিনিবের জন্য একজোড়া কর্ণাভরণ তৈরি কর। হঠাৎ এই আদেশ পেয়ে আমরা হতচকিত। এত অল্পসময়ের মধ্যে দামি পাথর সংগ্রহ করা যায় কেমন করে। শেষে আমাদেরই কে একজন বুদ্ধি বাতলে দিল। সে বলল, ঐ যে সদ্য দেবতাকে উৎসর্গ করা দামি প্রস্তরখণ্ডটি এসেছে তাকে কাটলে অনায়াসে তিনটি কুণ্ডল হয়ে যাবে। করাও হল তাই। ওস্তাদ কারিগর ডাকিয়ে পাথর কেটে তিনটি কুণ্ডল তৈরি হল। দুটি দেবতার কর্ণভূষণে পরিণত হল। যে দুটি পাথর তোমাকে এতটা ভাবিয়ে তুলেছে আসলে সে দুটি একদা দেবতার কর্ণাভরণ হিসাবে ব্যবহৃত হত। আসলে ও দুটি

একটি বড় পাথরের দুটি অংশ। পাশাপাশি রাখলেই আমার কথা কতদূর সত্যি টের পাবে। তবে তৃতীয় খণ্ডটি তোমরা এখনও পাওনি—কোনদিন পাবেও না।'

এই কথা বলে বেল-এর মন্দিরের সেই পূজারী অদৃশ্য হলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরও ঘুম ভাঙল। ঘুম থেকে উঠে আশ্চর্য স্বপ্নের কথা তিনি স্ত্রীকে প্রথম বললেন। সেদিন ছিল রবিবার। কালবিলম্ব না করে পড়ার ঘরে গিয়ে তিনি শিলালিপি নিয়ে বসলেন। স্বপ্নাদেশ-মত পাথরদুটিকে পাশাপাশি বসিয়ে দেখলেন—পুরোহিত ঠিকই বলেছেন। এখন অনায়াসে তিনি পড়তে পারলেন—'ভগবান নিনিবকে রাজা কুরিগালজু একটি উপহার দিচ্ছেন।'

নিপারে-প্রাপ্ত প্রত্নিদর্শনগুলি কনস্টান্টিনোপল শহরের সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়েছিল। ১৮৯৩ সালের অগস্ট মাসে হিলপ্রেকটকে সেখানে পাঠানো হল, স্বচক্ষে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্য। ইতিমধ্যে তাঁর স্বপ্নাদেশের কথা সকলেই অবগত হয়েছিল। সংগ্রহশালার পরিচালক হালিল বে এই কাহিনী শুনে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। সবকটি পেটি খুলে তাঁকে দেখানো হয়। যে দুটি বিশেষ প্রস্তরখণ্ড হিলপ্রেকট দেখতে চাইছিলেন, তাদের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে রাখা হয়েছিল। এতদিন পরে তাদের পাশাপাশি রাখা হলে ঘুচে গেল তাদের অজ্ঞাতবাস—অর্থবহ হয়ে উঠল গোটা পাথরটি। স্বপ্নের সত্যতার প্রমাণ মিলল এক নিমেষেই।

একটা-বিষয়ে কিন্তু খটকা থেকে গেল। পাথরদুটি ভিন্ন রং-এর। একটি সাদা, অন্যটি ঈষৎ হরিদ্রাভ। এরা একই বস্তুর অংশ-বিশেষ হবে কেমন করে? সংশয় দূর করলেন হিলপ্রেকট। তাঁর মতে, রাজা-কর্তৃক দেবতাকে উৎসর্গীকৃত এই পাথরটি সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা বিশিষ্ট ছিল। কারিগর যখন একে কেটে দু'টুকরো বা তিন টুকরো করে, তখন সাদার অংশটি থেকে যায় উপরে, আর ফিকে হলদে অংশটি নিচে। আসলে এটা যে কারিগরের ইচ্ছাকৃত কাজ, তা মনে করার কোন কারণ নেই। ব্যাপারটি নেহাৎ আকস্মিক ও অপূর্ব-কল্পিত।

নিপারে অবস্থিত বেল-এর মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সত্যি কি কোন রত্নভাণ্ডার ছিল? ১৮৯১ সালে ড. জন পিটারস্ এখানে খননকার্য চালান। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি জানান যে, একটি কাঠের সিন্দুকের ভগ্নাবশেষ অবশ্যই পাওয়া গিয়েছিল—যার পাশে লাপিজ-লাজুলি প্রভৃতি দামি পাথরের ভাঙা টুকরো ইতস্তত ছড়ানো ছিল। তবে কক্ষ বলতে কিছুই ছিল না—কেননা দেয়ালগুলি অনেক আগেই বিনষ্ট হয়েছিল।

মন্দিরের সেই শীর্ণ সন্ন্যাসী স্বপ্নের মধ্যে হিলপ্রেকটকে যা যা বলেছিলেন তা মূলত যে অলীক নয়, তার প্রমাণ হাতে-হাতেই পাওয়া গেল। এরপরও কি বিজ্ঞান-অহঙ্কারীর অবিশ্বাসী মন একটুও টলবে না?

· দ্বিতীয় ঘটনাটিও হিলপ্রেকট সাহেবকে কেন্দ্র করে। একসময়ে ব্যবিলনের বিখ্যাত রাজা নেবুচাদনেজারের কয়েকটি শিলালিপির অনুবাদ ও সম্পাদনা-কাজে তিনি খুব ব্যস্ত

ছিলেন। তাঁকে সাহায্য করছিলেন অপর এক পণ্ডিত—ফ্রেডরিক ডেলিট্‌শ্‌। এক রাত্রে কাজ শেষ করে শুতে শুতে প্রায় রাত দুটো বেজে গেল। মনে মনে সেদিনও তাঁর অশান্তি। সহকর্মী ডেলিট্‌শ্‌ নেবুচাদনেজার নামটির আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন—নেবো, স্থপতি হিসাবে আমার কাজকে রক্ষা করুন। অথচ এই অনুবাদ তাঁর পছন্দ হচ্ছে না—কোথায় যেন ভুল থেকে যাচ্ছে। ঘুমের ঘোরে তাঁর মনে হতে লাগল, তিনি আবার যেন তাঁর পড়ার ঘরে এসে বসেছেন। অনুবাদের কাজে যে সব খটকা দেখা দিয়েছিল, এবার তা জলের মত পরিষ্কার মনে হতে লাগল। যে খুদুরু-কথাটি নিয়ে বিপত্তি দেখা দিয়েছিল তা ঘিরে ফেলা (টু এনক্লোজ) এই ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভুত, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হলেন। সকালে ঘুম ভাঙল, রাত্রের এই স্বপ্নের কথা অস্পষ্টভাবে তাঁর মনে ছিল।

তিনি পড়ার ঘরে সোজা চলে এলেন। রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে যে সংজ্ঞাটি তার মনে এসেছিল তার সাহায্যে নেবুচাদনেজারের অর্থ করলেন—নেবো, আমার রাজ্যসীমাকে নিরাপদ করুন, (প্রটেকট মাই বাউন্ডারি)। অদ্যাবধি হিলপ্রেকটের এই সংজ্ঞাটিই পণ্ডিত-সমাজে গৃহীত হয়ে আসছে।

---